অগ্রসর কর্মী / রোকন সহায়িকা

(দরসে কুরআন, ইসলামী বই নোট, বিষয়ভিত্তিক আয়াত-হাদিস, মাসআলা-মাসায়েল)

সংকলনে

ডা. মোঃ ইবনে আসাদ আল মামুন

BBA (Mkt-NU), DHMS (FHMCH), BHMEC Reg- No. 36663

চিকিৎসক ও পরিচালক

এস এম হোমিওপ্যাথি মেডিকেল সেন্টার,পটল বাজার ও এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, কালিহাতি, টাংগাইল

আজীবন সদস্য-বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী: ডা. এ আর খান ফাউন্ডেশন

সাংগঠনিক সম্পাদক: ন্যাশনাল হোমিও ডক্টর্স ফোরাম (NHDF), টাংগাইল জেলা

শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য:

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, কালিহাতি উপজেলা শাখা

[নোট: আলহামদুলিল্লাহ, মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ দয়ায় প্রায় ২ বছর প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী টাংগাইল জেলা শাখার মান উন্নয়ন সিলেবাস ২০২৬ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সহায়িকা সংকলন করতে পারায় মহান মনিবের দরবারে সিজদাবনত চিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি। সহায়িকা কখনো মুল হতে পারে না, বরং মুলের সাহায্যকারী। এই সহায়িকা বিভিন্ন সুত্র থেকে সংকলন করা হয়েছে, এতে অনেক কিছুই ভুল, অসম্পুর্ণ বা প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে হতে পারে, সে জন্য মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং এটি সুন্দর করে পাঠযোগ্য করতে সকল দ্বীনি ভাই-বোনদের পরামার্শ কামনা করছি। পরামর্শ পাঠানোর ই মেইল: msumon2009@gmail.com]

ওয়েব লিংক: https://www.smhmcp.com/selfdvlp.html

প্রিন্ট কপি মুল্য -৪০০/- টাকা মাত্র।

সুচী | পৃষ্ঠা

অনুশীলনী- ০১ঃ জানুয়ারী-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা বাকারা (২৫৫), ৮
বইঃ গঠনতন্ত্র ১০
তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াতুল কুরসি ও ৮
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ১৯
মাসয়ালাঃ বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত। ২০

অনুশীলনী- ০২ঃ জানুয়ারী-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা যিলযাল ৩৮
বইঃ সংগঠন পদ্ধতি ৫৩
তাওহিদ সংক্রান্ত সূরা হাশরের শেষ রুকু মুখস্ত, ৬২
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ১৯
মাসয়ালাঃ বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত ২০

অনুশীলনী- ০৩ঃ ফেব্রুয়ারী-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা তাকাসুর ৬৪
বইঃ সাফল্যের শর্তাবলী, ৮৮
তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত আয়াতুল কুরসি ০৮
সূরা হাশরের শেষ রুকু মুখস্ত ও ৬২
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ১৯
মাসয়ালাঃ বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত। ২০

অনুশীলনী- ০৪ঃ ফেব্রুয়ারী-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা যিলযাল ৩৮
বইঃ তাফহিমুল কুরআনের ভূমিকা ৯২
দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত, আল ইমরান-১০৪, ১১২
ইউসূফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-
৩৩, মায়েদা-৬৭ ও দাওয়াত সংক্রান্ত হাদীস ১ টি ১১৪
মাসয়ালাঃ বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত। ২০

অনুশীলনী- ০৫ঃ মার্চ- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী- সূরা আসর, ১১৫

বইঃ চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, ১২০

দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত আল ইমরান-১০৪, ইউসূফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-৩৩, মায়েদা-৬৭ ও ১১২

দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ১১৪

মাসয়ালাঃ সিয়াম সংক্রান্ত। ১২৩

অনুশীলনী- ০৬ঃ মার্চ- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা আলাক (১-৫ নং আয়াত), ১৩০

বইঃ ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৪২

দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত ১১২

আল ইমরান-১০৪, ইউসূফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-৩৩, মায়েদা-৬৭ ও

দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ১১৪

মাসয়ালাঃ সিয়াম সংক্রান্ত। ১২৩

অনুশীলনী- ০৭ঃ এপ্রিল- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত) ১৪৯

বইঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্পর্ক, ১৬৫

আন্দোলন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ১৭৬

সূরা নিসা-৭৪ ও ৭৬, তওবা-২৪ ও ৩৮-৪১, আস-সাফ-৯,১০,১১,১২, আশ-শুরা-১৩, হজ্জ-৭৮ ও

আন্দোলন সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ১৮১

মাসয়ালাঃ যাকাত সংক্রান্ত। ১৮৪

অনুশীলনী- ০৮ঃ এপ্রিল- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা ইখলাস, ১৯৩

বইঃ ইসলামী সংগঠন, ২০৫

আন্দোলন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ১৭৬

সূরা নিসা-৭৪ ও ৭৬, তওবা-২৪ ও ৩৮-৪১, আস-সাফ-
৯,১০,১১,১২, আশশুরা- ১৩, হজ্জ-৭৮
১টি হাদীস মুখস্ত, ১৮১
মাসয়ালাঃ সিয়াম সংক্রান্ত। ১২৩

অনুশীলনী- ০৯ঃ মে- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা লাহাব, ২১৫
বইঃ গঠনতন্ত্র, ১০
সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল- ইমরান-১০৩,১০৪, ২৩১
আস সফ- ৪, ১টি হাদীস মুখস্ত,
মাসয়ালাঃ ঈদের নামাজ সংক্রান্ত। ২৩৩

অনুশীলনী- ১০ঃ মে- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা মু'মেনুন (১-১১ নং আয়াত), ২৪১
বইঃ রুকনিয়াতের আসল চেতনা, ২৫৮
সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-ইমরান-১০৩,১০৪, ২৩১
আস সফ- ৪, ও ১টি হাদীস মুখস্ত
মাসয়ালাঃ তাহারাত সংক্রান্ত। ২৬৭

অনুশীলনী- ১১ঃ জুন- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা আলে ইমরান (১৯-২২ নং আয়াত), ২৯০
বইঃ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, ৩০২
তাকওয়া সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩০৬
আল-বাকারাহ:১৭৭ ও ২৫৫, আল ইমরানঃ ১০২,
তাকওয়া সংক্রান্ত একটি হাদীস মুখস্ত। ৩০৮
মাসয়ালাঃ তাহারাত সংক্রান্ত। ২৬৭

অনুশীলনী- ১২ঃ জুন- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা বাকারা (১৫৩-১৫৬ নং আয়াত), ৩০৮
বইঃ ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ৩১৮
তাকওয়া সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩০৬

আল- বাকারাহ:১৭৭ ও ২৫৫, আল ইমরান: ১০২ ও
একটি হাদীস মুখস্ত। ৩০৮
মাসয়ালা: ঈদের নামাজ সংক্রান্ত। ২৩৩

অনুশীলনী- ১৩ঃ জুলাই- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা ইনফিতার, ৩২১
বই: সত্যের সাক্ষ্য, ৩২৯
বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩৩২
আত-তওবা: ১১১, আন'আম: ১৬২, আল-ফাতহ: ১০ ও
১৮, মুমতাহিনা: ১২ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৩৪
মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত। ২০

অনুশীলনী- ১৪ঃ জুলাই- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা ইনফিতার, ৩২২
বই: জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, ৩৩৫
বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩৩২
আত-তওবা: ১১১, আন'আম: ১৬২, আল-ফাতহ: ১০
১৮, মুমতাহিনা: ১২ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৩৪
মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত। ২০

অনুশীলনী- ১৫ঃ আগষ্ট-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত), ৩৪৬
বিষয়: হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ৩৫৬
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩৬০
আল-বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১
১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৬১
মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্ত। ২৬৭

অনুশীলনী- ১৬ঃ আগষ্ট-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা নাস, ৩৬১
বই: ইকামাতে দ্বীন, ৩৬৯

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩৬০
আল-বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১
১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৬১
মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্ত। ২৬৭

অনুশীলনী- ১৭ঃ সেপ্টেম্বর-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা মুদ্দাসির(১-৭নংআয়াত) ৩৮২
বই: রাসূলুল্লাহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপ্লবী জীবন, ৩৯৬
ঈমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত ৩৯৬
আল বাকারা: ২১৪, আনকাবুত: ১,২,৩
ঈমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৯৭
মাসয়ালা: হাজ্ব ও নামাজ (পৃষ্ঠা-২০) সংক্রান্ত। ৩৯৭

অনুশীলনী- ১৮ঃ সেপ্টেম্বর-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা ফীল, ৪২৯
বই: ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, ৪৩৪
ঈমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত - আল বাকারা: ৩৯৬
২১৪, আনকাবুত: ১,২,৩ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৯৭
মাসয়ালা: হাজ্ব ও নামাজ (পৃষ্ঠা-২০) সংক্রান্ত। ৩৯৭

অনুশীলনী- ১৯ঃ অক্টোবর-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা হুজুরাত ২য় রুকু, ৪৫২
বই: ইসলাম পরিচিতি, ৪৭৯
আনুগত্য সংক্রান্ত ১টি আয়াত মুখস্ত আন নিসা ৫৯ ৪৯১
১টি হাদীস মুখস্ত, ৪৯২
মাসয়ালা: আক্বিকা সংক্রান্ত। ৪৯৩

অনুশীলনী- ২০ঃ অক্টোবর-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা আহযাব (৩৫ নং আয়াত), ৫১২
বই: ইসলামী সংগঠন, ২০৫

বিভিন্ন দোয়া মুখস্ত, ০
মাসয়ালা: আকিৃকা সংক্রান্ত। ৪৯৩

অনুশীলনী- ২১ঃ নভেম্বর-২য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী -সূরা ইখলাস, ১৯৩
বই: পলাশী থেকে বাংলাদেশ, ৫৩১
পরামর্শ সংক্রান্ত ১টি আয়াত ও ১টি হাদীস মুখস্ত, ৫৩৮
মাসয়ালা: সাদাকা সংক্রান্ত। ৫৪০

অনুশীলনী- ২২ঃ নভেম্বর-৪র্থ সপ্তাহঃ
দারস তৈরী -সূরা কাউসার, ৫৪৫
বই: ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ, ৫৫১
ত্যাগ কুরবানী সংক্রান্ত ১টি আয়াত মুখস্ত, ৫৫৬
ত্যাগ কুরবানী সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত
মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত। ২০

অনুশীলনী- ২৩ঃ ডিসেম্বর-২য় সপ্তাহঃ
দারস তৈরী -সূরা হজ্ব (১ ও ২ নং আয়াত), ৫৫৮
বই: ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ৫৬৭
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল- ৩৬০
বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১ ১টি
হাদীস মুখস্ত, ৩৬১
মাসয়ালা: দাফন-কাফন সংক্রান্ত। ৫৭৬

অনুশীলনী- ২৪ঃ ডিসেম্বর-৪র্থ সপ্তাহঃ
দারস তৈরী -সূরা হাশর শেষ রুকু, ৫৭৯
বই: সত্যের সাক্ষ্য ৩২৯
তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত সূরা বাকারা: ২৮৫ ১টি ৫৮৯
হাদীস মুখস্ত, ৫৮৯
মাসয়ালা: দাফন-কাফন সংক্রান্ত। ৫৭৬
পরিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ ২০২৬-২৮ ৫৯০

বি:দ্র: সহী কোরআন তেলাওয়াত, নামাজে পঠিত আমপারার সূরাগুলোর সহী তেলাওয়াত ও অর্থ যত্ন সহকারে প্রতি মাসে মশক করতে হবে। মাসের পড়া মাসেই শেষ করতে হবে, এ পড়ার পাশাপাশি সিলেবাসের বই অধ্যয়ন করে শেষ করতে হবে। ব্যক্তিগত রিপোর্টের মান প্রতিদিন বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বাবস্থায় সবর, সাহস, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর তাহলেই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রাশি আমাদের উপর বর্ষিত হবে। মাসিক ব্যক্তিগত আয়ের কমপক্ষে ৫% এয়ানত দেয়া শুরু করতে হবে। দৃষ্টি আকর্ষণ: এই সিলেবাসের আলোকে উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে বাইয়াতের জন্য তৈরী করতে হবে।

অনুশীলনী -০১

জানুয়ারী-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা বাকারা (২৫৫),

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

(২৫৫) আল্লাহ ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম।

নামকরনঃ সূরা আল বাকারার নামকরণ করা হয়েছে 'বাকারাহ' শব্দটি থেকে, যার অর্থ গাভী। এই নামকরণ করা হয়েছে কারণ এই সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াতে হযরত মুসা (আ.)-এর সময়ের বনী ইসরাঈলের একটি গাভী জবাই করার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

সূরা আল বাকারার নামকরণের প্রেক্ষাপট:

সূরা আল বাকারার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল, এবং হত্যার রহস্য উন্মোচনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়ার কারণে, সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে "আল বাকারাহ" (***অর্থ: গাভী***)।

কুরআনের অন্যান্য সূরার মতো, আল বাকারার নামকরণও একটি বিশেষ ঘটনার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা এই সূরার বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে। সুতরাং, সূরা আল বাকারার নামকরণ "আল বাকারাহ" মূলত বনী ইসরাঈলের সেই গাভী জবাই করার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

সূরা বাকারার শানে নুযুল (নাযিলের প্রেক্ষাপট) বেশ বিস্তৃত এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত। এটি ***মদিনায় অবতীর্ণ*** হয়েছে এবং এতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, বিধি-বিধান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ, পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী, এবং ইহুদি ও মুনাফিকদের কার্যকলাপ সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরা বাকারার বৈশিষ্ট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

মদিনায় অবতীর্ণ: সূরা আল-বাকারার অধিকাংশ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা: এই সূরায় তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদত, হালাল-হারাম, পারস্পরিক সম্পর্ক, ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

বিধি-বিধান: এতে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী: হযরত মুসা (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.) সহ বিভিন্ন নবীর কাহিনী ও তাদের উম্ম তের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন নির্দেশনার বর্ণনা রয়েছে।

মুনাফিক ও ইহুদিদের কার্যকলাপ: মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াতও এই সূরায় অন্তর্ভুক্ত।

গাভীর ঘটনা: সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'বাকারাহ' (অর্থ গাভী), যা হযরত মুসা (আ.) এর সময়ের বনী ইসরাঈলের একটি গাভী জবাই করার ঘটনার সাথে সম্মপর্কিত।

দীর্ঘতম সূরা: এটি কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা এবং এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও বিধি-বিধান রয়েছে।

সূরা বাকারার আয়াতগুলো নাজিলের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

বই: গঠনতন্ত্রঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

- ভূমিকাঃ
- **যেহেতু**
  - মহান আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত কোন ইলাহ নাই এবং নিখিল বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ তা'য়ালার প্রবর্তিত প্রাকৃতিক আইনসমুহ একমাত্র তাহারই বিচক্ষণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছেঃ
  - আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

- আল্লাহ তা’য়ালা সত্যের নির্দেশনাসহ যুগে যুগে নবী-রাসুলগনকে প্রেরণ করিয়াছেন।
- বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা’য়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসুল এবং আল্লাহ তা’য়ালার প্রেরিত আল কুরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহই হইতেছে বিশ্বমানবতার অনুসরণীয় আদর্শ।
- মানুষকে তাহার পার্থিব জীবনকে ভাল-মন্দ কাজের পুঙ্খানো পুঙ্খ হিসাব দিতে হইবে এবং বিচারের পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম রুপে ইহার যথাযথ ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।
- আল্লাহ তা’য়ালার সন্তুটি অর্জন করিয়া জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত।

❖ সেহেতু

- এই সকল মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষণমুক্ত, ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এই গঠনতন্ত্র প্রণীত ও প্রবর্তিত হইল।

❖ ধারাঃ০১ - নামকরণ

- এই সংগঠনের নাম হইবে- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

❖ ধারাঃ০২ - ঈমান ও আক্বীদা

- কুরআন ও সহীহ হাদীসে নির্দেশিত ঈমান ও আক্বীদাই জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীগণ পোষণ করিয়া থাকেন। তাহার মুল কথা হইলোঃ **“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর**

রাসুলুল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতিত কোন ইলাহ নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা’য়ালার রাসুল।

❖ ঈমান ও আক্বীদার প্রথমাংশ হলোঃ আল্লাহ তা’য়ালার একমাত্র ইলাহ হওয়া। অর্থাৎ-

- আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতিত আর কাহাকেও সাহায্যকারী মনে না করা।
- আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতিত আর কাহাকেও কল্যাণকামী মনে না করা।
- আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতিত আর কাহারও নিকট প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতিত আর কাহারও নিকট মাথানত না করা।
- আল্লাহ তা’য়ালা ব্যতিত আর কাহাকেও ক্ষমতার মালিক মনে না করা।

❖ ঈমান ও আক্বীদার দ্বিতিয়াংশ হলো- “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা’য়ালার রাসুল। অর্থাৎ

- আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত ও আইন বিধানকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহন করা।
- যে কোন কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ ও নিষেধকে যথেষ্ট মনে করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত আর কাউকে নেতা না মানা ।
- আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহই একমাত্র উৎস মনে করা।
- সকল কিছুর উর্দ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসা।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্যের মাপকাঠি মনে করা।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত আর কারো আনুগত্য না করা ।

❖ ধারাঃ০৩ - **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ** "বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন"।

❖ ধারাঃ০৪ - স্থায়ী কর্মনীতি

- কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহনের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।
- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ***এমন কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবে না*** যাহা সততা ও বিশ্বাস পরায়নতার পরিপন্থি কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ তৈরি হয়।
- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাঞ্চিত ***সংশোধন ও সংস্কার*** কার্যকর করিবার জন্য ***নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক*** পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের ***দাওয়াত সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে*** পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকুলে জনমত গঠন করিবে।

❖ ধারাঃ০৫ - তিন দফা দাওয়াত

- সাধারনভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করিবার আহবান।
- ইসলাম গ্রহনকারী ও ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের মিল গরমিল পরিহার করিয়া খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহবান।
- সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে **নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিচারপূর্ণ শাসন** ক্বায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার **জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের** অবসান ঘটানোর আহবান।

❖ ধারাঃ০৬ - স্থায়ী কর্মসূচী

- দাওয়াত ও দাবলীগ (চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পূনর্গঠন)
- তানযিম ও তারবিয়াত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ)
- ইসলাহে মু'য়াসারা (সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবা)
- ইসলাহে হুকুমত(রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন)

❖ ধারাঃ ০৭ - রুকন হইবার শর্তাবলী

- ব্যক্তিগত জীবনে **ফরজ ওয়াজীবসমূহ** যথাযথভাবে আদায় করেন এবং কবীরা গুনাহ হইত বিরত থাকেন।
- উপার্জনের এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করেন যাহা **আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানির** পর্যায়ে পড়ে।
- হারাম পথে অর্জিত কিংবা **হকদারের হক** নষ্ট করা কোন সম্পদ বা সম্পত্তি তাঁহার দখলে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করেন বা হক্বদারকে ফেরত দেন।

- মৌলিক মানবীয় গুনাবলী অর্জনের বিচারে আশাব্যাঞ্জক অবস্থানে রয়েছেন।
- **এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক** না রাখেন যাহার মুলনীতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইসলামের ঈমান ও আক্বীদা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থি।
- জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলগনের দৃষ্টিতে রুকন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

❖ **ধারাঃ০৯ - রুকনদের দায়িত্ব`ও কর্তব্য**

(ক) জামায়াতে শামিল হওয়ার পর প্রত্যেক রুকন নিজের জীবনে পরিবর্তনের জন্য যেসব বিষয়ে সর্বদা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন-

- দ্বীন সম্পর্কে অন্তত এতটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে যাহাতে তিনি **ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য** বুঝতে পারিবেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার নির্ধারিত শরীয়তের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইবেন।
- নিজের ঈমান-আক্বীদা, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি-কাজ-কর্মকে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক গড়িয়া লইবেন। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্যমান, পছন্দ-অপছন্দ, এবং আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু সবকিছুকে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তোষের অনুকুলে আনয়ন করিবেন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মপূজা পরিহার করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরুপে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের একান্ত অনুসারী ও অধীন বানাইয়া লইবেন।
- আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের বিপরীত সকল প্রকার জাহিলি নিয়ম-প্রথা ও রসম-রেওয়াজ এবং কুসংস্কার হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র করিবেন এবং ভিতর ও বাহিরকে

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে অধিকতর প্রচেষ্টা চালাইবেন।

- **আত্মম্ভরিতা ও পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে যেসব হিংসা-বিদ্বেষ, ঝোক-প্রবণতা, ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং দ্বীন ইসলামে যেসব বিষয়ের কোন গুরুত্ব নাই তাহা হইতে নিজের অন্তর ও জীবনকে পবিত্র রাখিবেন।**
- ফাসিক ও আল্লাহ বিমূখ লোকদের সহিত দ্বীনের প্রয়োজন ব্যতিত সকল বন্ধুত্ব-ভালবাসা পরিহার করিয়া চলিবেন এবং নেক লোকদের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।
- নিজের সকল কাজ আল্লাহভীতি, আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য, সততা ও ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করিবেন।
- নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকদের মধ্যে দ্বীনি ভাবধারা প্রচার ও প্রসার এবং দ্বীনের স্বাক্ষ্যদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।
- দ্বীন ক্বায়েমের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং ***জীবন ধারনের প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতিত এই উদ্দেশ্যর দিকে পরিচালিত করে না*** এমন সকল প্রকার তৎপরতা হতে নিজেকে বিরত রাখিবেন।
- দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকিবেন।

(খ) প্রত্যেক রুকন পরিচিতদের মধ্যে এবং উহার বাইরে যেখানে পৌঁছিতে পারেন ইসলামের ঈমান ও আক্বীদা এবং জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য লক্ষ্য

সবিস্তারে বর্ণনা করিবেন। যাহারা এই প্রচেষ্টা চালাইবার প্রস্তুত হইবেন, তাহাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর রুকন হওয়ার আহ্বান জানাইবেন।

❖ ধারাঃ১০ - মহিলা রুকনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জামায়াতে ইসলামীর মহিলা রুকনগন তাহাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের **০৯ ধারায়** উল্লেখিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হইবে। অবশ্য তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কর্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেঃ

- নিজের স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এবং পরিচিত ও অপরিচিত অন্যান্য মহিলাদের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত পেশ করিবেন।
- নিজের সন্তান-সন্ততির অন্তরে ঈমানের আলো সৃষ্টি করিতে এবং তাহাদিগকে ইসলামের অনুসারী বানাইতে চেষ্টা করিবেন।
- তাঁহার স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাই-বোন যদি জামায়াতে শামিল হইয়া থাকেন, আন্তরিকতার সহিত তাহাদিগকে সাহসী ও আশাবাদী করিয়া তুলিবেন। জামায়াতের কাজে যথাসম্ভব তাহাদিগকে সহযোগীতা করিবেন এবং এই পথে কোন বিপদ আসিয়া পড়িলে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিবেন।
- তাঁহার স্বামী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং পরিবারের কোন সদস্য যদি ইসলাম পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকেন তবে ধৈর্য সহকারে তাঁহাদের সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।

❖ ধারাঃ১৩ - জামায়াতের সাংগঠনিক স্তরঃ

- কেন্দ্রীয় সংগঠন
- জেলা/মহানগরী সংগঠন

- উপজেলা/থানা সংগঠন
- ইউনিয়ন/পৌরসভা সংগঠন
- ওয়ার্ড সংগঠন
- ইউনিট সংগঠন

❖ **ধারাঃ১৪ - কেন্দ্রীয় সংগঠন**

১. আমীরে জামায়াত
২. কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন
৩. জাতীয় কাউন্সিল
৪. কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা
৫. কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ
৬. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

❖ **ধারাঃ৬৭ - বায়তুল মালের আয়ের উৎস**

জামায়াতের বায়তুল মালের আয়ের উৎস হইবেঃ

- রুকন, কর্মী, সহযোগী ও সুধীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত।
  - ক. মাসিক এয়ানত।
  - খ. যাকাত-উশর।
  - গ. এককালীন দান।
- অধস্তন সংগঠন হইতে প্রাপ্ত নির্ধারিত মাসিক আয় ।
- জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা।

❖ **ধারাঃ৭২ - নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়**

- জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন করা কালে কিংবা নিযুক্তকালে ব্যক্তির **দ্বীনি ইলম, আল্লাহভীতি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আনুগত্য, আমানতদারীতা, দেশপ্রেম, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা,**

দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবনি শক্তি, প্রশস্তচিন্তা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে **কোন পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত** হওয়া বা চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

❖ গঠনতন্ত্র রচনা সম্পর্কিত তথ্যঃ

- গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় ১৯৭৯ সনের ২৬ মে কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে।
- গঠনতন্ত্র কার্যকর করা হয় ১৯৭৯ সনের ২৮ মে।
- গঠনতন্ত্র প্রথম প্রকাশঃ মে ১৯৮০ ইং
- সর্বশেষ সংশোধনীঃ ২২তম সেপ্টেম্বর ২০১৯
- সর্বশেষ প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০২০ ইং ৮০তম মুদ্রণ।
- মোট ধারাঃ ৭৭
- মোট পরিশিষ্টঃ ১১

মুখস্থঃ তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত- আয়াতুল কুরসি (পৃষ্ঠা-৮)
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

৭৩৭৬. জারীর ইবনু ’আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেন না,

যে মানুষের প্রতি রহম করে না। [৬০১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৮৭২)

মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্তঃ

নামাজের মাসয়ালাগুলো মূলত **ফরয** (বাধ্যতামূলক), **ওয়াজিব** (অপরিহার্য), **সুন্নাত** (সুন্নত) এবং **নফল** (ঐচ্ছিক) এই চার প্রকারের নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে ফরয ও ওয়াজিব নামাজ আবশ্যকীয়, আর সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায় করলে সওয়াব পাওয়া যায়, না করলে গুনাহ হয় না। প্রত্যেক প্রকার নামাজের নির্দিষ্ট নিয়ম, শর্ত ও পদ্ধতি রয়েছে যা মেনে নামাজ আদায় করতে হয়।

❖ নামাজের প্রকারভেদ ও মাসয়ালা

ফরয নামাজঃ

ইসলামের পাঁচটি দৈনিক ফরয নামাজ **(ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা)** আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। এই নামাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয় এবং এগুলো বাদ দেওয়া জায়েজ নয়।

ওয়াজিব নামাজঃ

ফরযের কাছাকাছি কিছু নামাজ, যেমন বিতর নামাজ, ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হয়। এগুলোকেও নিয়মিত আদায় করতে হয়।

সুন্নাত নামাজঃফরয নামাজের আগে-পরে আদায় করা হয়। এটি দুই প্রকারঃ সুন্নতে মুয়াক্কাদা (আদায় করা উচিত) এবং সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা (আদায়ে উৎসাহিত করা হয়েছে, তবে বাধ্যতামূলক নয়)।

নফল নামাজঃ *ঐচ্ছিক নামাজ* যা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সময়ে আদায় করা হয়। যেমনঃ তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল ও আউওয়াবিন নামাজ।

সাধারণ মাসয়ালা

পবিত্রতা: নামাজ আদায়ের জন্য শরীর ও কাপড় পবিত্র হওয়া এবং নামাজের স্থান পবিত্র থাকা আবশ্যক। এছাড়াও ওযু ও গোসলের মাধ্যমে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া জরুরি।

শর্ত: নামাজ শুরুর আগে কেবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা, নামাজের সময় হওয়া ও নিয়ত করা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

ফরজঃ নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য ১৩টি ফরজ রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি নামাজের বাইরে এবং ৭টি নামাজের ভিতরে।

ওয়াজিবঃ নামাজের ১৪টি ওয়াজিব রয়েছে যা আদায় করা উচিত, না করলে সাজদা সাহু (সহজ ভুল সংশোধনের জন্য) দিতে হয়।

১। সূরা ফাতিহা পুরা পড়া।

২। সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলানো।

৩। রুকু-সিজদায় দেরী করা।

৪। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৬। প্রথমে বৈঠক করা।

৭। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

৮। ইমামের জন্য ক্বিরা‘আত আস্তে এবং জোরে পড়া।

৯। বিতরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়া।

১০। দুই ঈদের নামাযে ছয়টি করে তাকবীর বলা।

১১। ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা‘আতকে কিরাআতের জন্য নির্ধারিত করা।

১২। প্রত্যেক রাকা‘আতের ফরযগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

১৩। প্রত্যেক রাকা‘আতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

১৪। ‘সালাম’ বলে নামায শেষ করা।

কিরাত: নফল নামাজে সাধারণত আস্তে কেরাত পড়া হয়, তবে তারাবীহ ও খুসুফ (সূর্যগ্রহণের নামাজ) এর ব্যতিক্রম।

গুরুত্বপূর্ণ দিক

জামাতের নামাজঃ নফল নামাজ সাধারণত একা আদায় করা হয়, তবে জামাতে পড়ার কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন তারাবীহ ও বেতরের নামাজ।

নামাজের ভুলঃ ইমামের ভুল হলে মুক্তাদী লোকমা দিয়ে তা সংশোধন করতে পারেন। তবে তা কখন করা হলো, তার ওপর নির্ভর করে নামাজ সহীহ হবে কি না।

নামায সংক্রান্ত মাসআলাঃ

নামাজের মাসআলা বা নামাজের নিয়মকানুন ইসলামিক শরিয়তে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নামাজের **মৌলিক** বিষয়, যেমন - ওযু, কিবলামুখী হওয়া, নামাজের নিয়ত, রুকু, সিজদা, শেষ বৈঠক এবং সালাম ফেরানো সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

নামাজের মাসআলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকঃ

ওযুঃ নামাজের পূর্বে অবশ্যই ওযু করা ফরজ। ওযুর নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

কিবলামুখী হওয়াঃ নামাজের জন্য কিবলামুখী হওয়া ফরজ। কিবলা হলো মক্কার মসজিদুল হারামের কাবার দিক।

নিয়তঃ প্রত্যেক নামাজের জন্য মনে মনে অথবা মনে মনে সংকল্প করে মুখে নিয়ত করা সুন্নত।

রুকুঃ রুকুতে গিয়ে সোজা হয়ে পিঠ ও মাথা সোজা করে দাঁড়ানো এবং "সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম" তিনবার পড়া সুন্নত।

সিজদাঃ সিজদার সময় কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের মাথা জমিনে রাখা ফরজ। সিজদাতে "**সুবহানা রাব্বিয়াল আলা**" তিনবার পড়া সুন্নত।

শেষ বৈঠকঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ এবং দোয়ায়ে মাসুরা পড়ার পর সালাম ফেরানো হয়।

সালাম ফেরানো: নামাজের শেষে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে "আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম ফেরানো হয়।

অন্যান্য বিষয়:নামাজের মধ্যে মনোযোগ ধরে রাখা এবং দুনিয়াবী চিন্তা পরিহার করা উচিত। পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ভ্রমণ বা অসুস্থতার কারণে নামাজের কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ের বিধান রয়েছে। ফরজ নামাজের সাথে সাথে সুন্নত ও নফল নামাজ পড়ারও বিধান রয়েছে।

সালাতের ফরয সালাতের ফরজ হল ১৩ টিঃ

নামাজের আহকাম (বাইরের ফরজ - ৭টি): ১. শরীর পাক বা পবিত্র হওয়া। ২. পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া। ৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়া। ৪. সতর ঢাকা (পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু এবং নারীদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা ছাড়া পুরো শরীর). ৫. কিবলামুখী হওয়া। ৬. ওয়াক্ত বা সময়মতো নামাজ পড়া। ৭. নিয়ত করা।

নামাজের আরকান (ভিতরের ফরজ - ৬টি): ১. তাকবিরে তাহরিমা বলা (শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা)। ২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া (অক্ষম হলে বসে)। ৩. কিরাত পড়া (কুরআন তিলাওয়াত করা)। ৪. রুকু করা। ৫. সেজদা করা (দুইবার) ৬. কায়দায়ে আখিরাহ বা শেষ বৈঠক (তাশাহহুদ পড়ার সময় পরিমাণ বসা)।

যেগুলোর কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে সালাত / নামাজ আদায় শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ সালাত শুরুর পূর্বে ৭টি আহকাম (أحكام) আর সালাতের মধ্যে ৬টি আরকান (اركان) রয়েছে সেগুলোকে সালাত বা নামাজের ফরজ বলা হয়।

সালাতের আহকাম ও আরকান কী?

সালাত শুরুর পূর্বের ফরজসমূহকে আহকাম অন্যদিকে যে ফরজ কাজগুলো সালাতের মধ্যে আদায় করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। প্রথমে আমরা সালাত / নামাজের আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করা হল: ক)

সালাতের আহকামসমূহ (أحكام): আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচনে হুকুম। যে ফরজ কাজগুলো নামাজ শুরু করার আগেই করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আহকাম বলা হয়। সালাতের আহকাম মোট সাতটি। নিম্নে সালাত / নামাজের আহকামসূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল:

১) শরীর পবিত্র হওয়া: সালাত নামাজ আদায় করার জন্য শরীর পাক-পবিত্র হতে হবে। গোসল, অযু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। শরীর পবিত্র হওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, সালাত / নামাজ আদায়কারীর শরীর পবিত্র হওয়া। (বুখারি, হাদিস নং ২৯৬)। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সালাত / নামাজ শুদ্ধ বা সহিহ হবে না। (বুখারি, হাদিস নং ৬৪৪০)।

২) কাপড় পবিত্র হওয়া: সালাত/ নামাজ আদায়কারীর কাপড় পবিত্র হতে হবে, অর্থাৎ কাপড় বা পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (সূরা মুদ্দাসসির, সূরা নম্বরঃ ৭৪, আয়াত নম্বরঃ ৪)।

৩) জায়গা পবিত্র হওয়া: যে স্থানে সালাত / নামাজ পড়া হবে ওই স্থানটি পবিত্র হতে হবে। জায়গার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দুই পা, দুই হাত, হাঁটু এবং কপাল রাখার স্থান। ন্যূনতম এটুকু স্থান পবিত্র হতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম। (সূরা আল বাকারাহ, সূরা নম্বরঃ ২, আয়াত নম্বরঃ ১২৫)।

৪) সতর ঢেকে রাখা: অবশ্যই সতর ঢাকা থাকতে হবে। নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই সতর ঢাকা থাকতে হবে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু, অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ, সূরা নম্বরঃ ৭, আয়াত নম্বরঃ ৩১)। পুরুষের সতর হল নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ (টাখনুর উপরে) পর্যন্ত, আর নারীর সতর হল মুখমণ্ডল, দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সারা শরীর। নামাজের শুরু থেকেই যদি সতরের এক-চতুর্থাংশ উন্মুক্ত থাকে তখনো নামাজ হবে না। নামাজ পড়াকালীন এক রুকন আদায় করার সময় পর্যন্ত যদি সতর খোলা থাকে তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৫১, বাদায়ে ১/৪৭৭)

৫) কিবলা মুখী / কাবামুখী হয়ে দাঁড়ানো: কিবলামুখী হওয়া (কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা)। তবে অসুস্থ এবং অপারগ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে সালাত / নামাজ আদায় করার এই শর্ত শিথিলযোগ্য। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কিবলামুখী হয়ে নামাজ না পড়ে, তার নামাজ হবে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন

মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন। তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে জালিমদের ব্যতীত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর। যাহাতে আমি আমার নিয়ামত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার। (সূরা আল বাকারাহ, সূরা নম্বরঃ ২, আয়াত নম্বরঃ ১৪৯ ১৫০)। কিবলা হলো সরাসরি কাবাঘর। সেদিক হয়েই সালাত / নামাজ পড়তে হবে। এটি মক্কার বাসিন্দাদের জন্য, যারা সরাসরি কাবা শরিফ দেখে দেখে সালাত / নামাজ পড়তে সক্ষম। (বুখারি, হাদীস নং ৩৮৩)। অথবা কাবার দিকে ফিরে সালাত / নামাজ পড়বে। এটি সেসব লোকের জন্য, যারা কাবাঘর সরাসরি দেখতে পারছেন না। যারা মক্কা মুকাররামা থেকে দূরে অবস্থান করে তাদের জন্যও কাবার দিক হয়ে সালাত / নামাজ পড়া আবশ্যক। যদি কেউ রোগের কারণে বা শত্রুর ভয়ে কাবার দিক হয়ে সালাত / নামাজ পড়তে অক্ষম হয়, তাহলে সে যেদিকে সালাত / নামাজ পড়তে সক্ষম সেদিক হয়ে সালাত / নামাজ পড়তে পারবে। (বুখারি ৩৮৮, হাদীস নং ৪১৭১)। আবার কিবলার দিক কোনটি তা যদি জানা না থাকে, সে যদি কোনো বিল্ডিং এর ভিতরে থাকে অথবা নিকটে কোনো মানুষ পায়, তবে তার উচিত হবে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করা। অথবা মসজিদের মেহরাব, কম্পাস, চাঁদ সূর্যের অবস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে কিবলা নির্ণয়ের চেষ্টা করা। পরিশেষে ব্যর্থ হলে যান্নে গালেব তথা প্রাধান্যপ্রাপ্ত ধারণার ওপর নির্ভর করে নামাজ আদায় করে নেয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা আত-তাগাবুন, সূরা নাম্বারঃ ৬৪, আয়াত নাম্বারঃ ১৬ [অংশ])

৬) ওয়াক্ত অনুযায়ী সালাত আদায় করাঃ সালাত / নামাজের ওয়াক্ত হওয়া ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। তাই সালাত / নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে নিশ্চিত

হতে হবে। অনিশ্চিত হলে সালাত / নামাজ হবে না, যদি তা ঠিক ওয়াক্তেও হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআন আল কারীমে বলেন, فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে, যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আন নিসা, সূরা নম্বরঃ ৪, আয়াত নম্বরঃ ১০৩)।

সালাতের সময়

১. ফজরের নামাজের সময় : সুবেহ সাদেক- অর্থাৎ পূর্বদিগন্তে যে শুভ্রতা দেখা যায়- থেকে সূর্যোদয় র্পযন্ত।

২. যোহরের সময় : সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

৩. আসরের সময় : যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৪. মাগরিবের সময় : সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শফকে আহমার শেষ হওয়া পর্যন্ত। শফকে আহমার হলো সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা থাকে তা।

৫. এশার সময়ঃ মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সুবেহ সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত। ইমামদের কারো কারো কাছে মধ্য রাতে এশার সময় শেষ হয়ে যায়। তাদের দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, এশার নামাজের সময় মধ্যরাত পর্যন্ত।-(বর্ণনায় মুসলিম) বর্তমানযুগে ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে নামাজের সময় খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। সালাত/ নামাজের ওয়াক্ত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন- “যে ব্যক্তি নামাজের ওয়াক্ত চলে

যাওয়ার পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামাজ পেল সে ওই নামাজ পেয়ে গেল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের এক রাকাত পেল সে ওই নামাজ পেয়ে গেল।" -বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম। "যদি কারও ঘুমের কারণে নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে অথবা মনে না থাকার কারণে নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে, তবে জাগ্রত হওয়া ও মনে পড়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নামাজ ভুলে গেল, স্মরণ হলে সে যেন তা আদায় করে নেয়।" আর এটাই হলো তার কাফ্‌ফারা। -বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।

সালাতের মাকরূহ সময়ঃ সালাত / নামাজের মাকরূহ সময় তিনটি অর্থাৎ এই সময়গুলোতে নামাজ পড়া নিষেধ। সেগুলো হল:

১) সূর্যোদয়ের পর থেকে এশরাকের আগ পর্যন্তঃ সূর্য উঠার শুরু থেকে হলুদ আলো পুরোপুরি দূর না হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। ফকিহরা গবেষণা করে দেখেছেন সূর্য উঠার পর হলুদ আলো দূর হতে ২০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ আবহাওয়া অফিস যদি বলে, সকাল ছয়টায় সূর্য উঠবে, তার মানে ৬টা ২০ পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২) সূর্য যখন মাথার ওপরেঃ সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে তখনও সব ধরনের নামাজ এবং সেজদা করা নিষেধ। আরবি ভাষায় এ সময়কে 'জাওয়াল' বলে। যখন সূর্য একটু হেলে পড়বে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এ সময় সব ধরনের নামাজ এবং সেজদা করা জায়েজ। সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়তে বেশি সময় লাগে না। ফকিহরা সতর্কতাবশত সূর্য মাথার ওপরে উঠার পাঁচ মিনিট আগে এবং পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

৩) সূর্য ডোবার সময়ঃ সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে ডুবতে শুরু করে তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। সাহাবি উকবা বিন আমের আল জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাদের তিন সময় নামাজ এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। **১.** সূর্য উঠার সময়,

যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। ২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু। ৩. এবং সূর্য ডোবার সময়, সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে অন্ধকার হবার আগ পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ।

সাহাবি উকবা বিন আমের আল জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, - রাসূলুল্লাহ্ আমাদের তিন সময়ে নামাজ এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। ১. সূর্য উঠার সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। ২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু। ৩. এবং সূর্য হলুদবর্ণ হওয়ার পর থেকে ডোবার আগ পর্যন্ত।' (বুখারি, হাদীস নং ৫৫১ এবং মুসলিম, হাদীস নং ১১৮৫)।

এ তিন সময় নামাজ পড়া নিষেধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জ্ঞানীরা বলেন, সূর্য যখন ওঠে, যখন মাথার ওপর ওঠে এবং যখন ডুবে যায়- এ তিন সময় সূর্য পূজারিরা সূর্যকে সেজদাহ করে। তখন কেউ যদি নামাজ পড়ে তাহলে তাকেও সূর্য পূজারি মনে হতে পারে। এ জন্য এ সময় সব ধরনের নামাজ পড়া এবং সেজদাহ করা ইসলামী শরিয়ত মাকরুহে তাহরিমি তথা নিষেধ মনে করে।
মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানাভী (রহ.) বলেন, **এ তিন সময়ে নামাজ তো দূরের কথা এমনকি তিলাওয়াতে সেজদাহ করাও নিষেধ।** জানাজার নামাজ এবং মৃতকে দাফন করাও নিষেধ। তবে মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার প্রয়োজন হলে জানাজা পড়িয়ে দাফন করার অনুমতি আছে।

৭) নিয়ত করাঃ

নিয়ত ছাড়া সালাত / নামাজ সহিহ হবে না। ফরজ সালাত / নামাজ হলে কোন সময়ের সালাত / নামাজ, তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। যেমন -যুহর অথবা আসরের সালাত / নামাজ। সেরূপ ওয়াজিব নামাজ হলে তাও নির্দিষ্ট করা জরুরি। যেমন সালাতুল বিতর নামাজ বা সালাতুল ঈদ ইত্যাদি। কিন্তু নফল সালাত / নামাজে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। তখন শুধু সালাত /নামাজের নিয়ত করলেই হবে। কেননা ফরজ ও ওয়াজিব সালাত সালাতের

সময় বা প্রকার হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন। সে কারণে তা নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে। (বুখারি, হাদিস নং ১, আল আশবাহ : ১/৪৩)। জামাতে সালাত / নামাজ হলে মুক্তাদিদের ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা আবশ্যক। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআন আল কারীমে বলেন, তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া একনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন। (সূরা আল বাইয়্যিনাহ, সূরা নম্বরঃ ৯৮, আয়াত নম্বরঃ ৫)

খ) সালাতের আরকানসমূহ (اركان)ঃ

যে ফরজ কাজগুলো সালামের মধ্যে আদায় করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। সালাত / নামাজের আরকান ৬ টি। সেগুলো হল:

১) তাকবিরে তাহরিমা বা আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করা:

তাহরীমা অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর জিকির দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা। যেমন আল্লাহু আকবার। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/২৩৮)। নিয়ত আর তাকবিরে তাহরীমার মাঝে কোনো অন্য কাজ না করা। যেমন খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি। (আল আশবাহ ১/৫৮)। তাহরিমার ব্যাপারে শর্ত হলো, তা রুকুর জন্য ঝুঁকে পড়ার আগে দাঁড়ানো অবস্থায় করা। (বুখারি, হাদিস নং ৭১৫)। আর নিয়ত তাকবিরে তাহরিমার পরে না করা। (বুখারি, হাদিস নং ৭১৫) তাকবির আল্লাহু আকবার’ এমনভাবে বলা, যাতে নিজে শুনতে পায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন আল কারীমে বলেন, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসির, সূরা নাম্বারঃ ৭৪, আয়াত নাম্বারঃ ৩)।

মূলতঃ তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) নামাযের শর্তসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু নামাযের আভ্যন্তরিন কার্যাবলীর সাথে সম্মপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত, তাই সেটিকে নামাযের ফরয সমূহের মধ্যেও গণ্য করা হয়েছে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

(ক) মুক্তাদী -তাকবীরে তাহরীমা" এর শব্দ أَللّٰه ইমামের সাথে বললো, কিন্তু اَكْبَر ইমামের পূর্বে শেষ করে নিলো তবে তার নামায হবে না। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

(খ) ইমামকে রুকূতে পেল, আর সে তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে রুকূতে গেলো অর্থাৎ তাকবীর এমন সময় শেষ হলো যে, হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এমতাবস্থায় তার নামায হবে না। (খুলাসাতুল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা) (অর্থাৎ এ সময় ইমামকে রুকূতে পাওয়া অবস্থায় নিয়মানুযায়ী প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিন এরপর أَللّٰهُ اَكْبَر বলে রুকূ করুন। ইমামের সাথে যদি সামান্যতম মুহুর্তের জন্যও রুকূতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে আপনার রাকাত মিলে গেলো আর যদি আপনি রুকূতে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যান তবে রাকাত পাওয়া হলো না।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নয় যেমন- বোবা বা অন্য যে কোন কারণে যার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়, তার অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। (তাবঈনুল হাকাইক, ২য় খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) اَللّٰه শব্দকে اٰللّٰه অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা اَكْبَر কে اٰكْبَر অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা اَكْبَر কে اَكْبَار অর্থাৎ ب কে টেনে পড়লো তবে নামায হবে না বরং যদি এগুলোর ভুল অর্থ জেনে বুঝে বলে তবে সে **কাফির** হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া অবস্থায় পিছনে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য যেসব মুকাব্বিরগণ তাকবীর বলে থাকেন, সেসব মুকাব্বিরদের অধিকাংশই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজকাল اَكْبَرْ কে اَكْبَار অর্থাৎ কে দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে শুনা যায়। এর ফলে তাদের নিজের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আওয়াজে সে সব লোক নামাযের রুকন আদায় করে (অর্থাৎ

কিয়াম থেকে রুকূতে যায়, রুকূ থেকে সিজদাতে যায় ইত্যাদি) তাদের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্য না শিখে কখনো মুকাব্বির হওয়া উচিত নয়।

(ঙ) প্রথম রাকাতের রুকূ পাওয়া গেলো, তাহলে 'তাকবীরে ঊলা' বা প্রথম তাকবীরের সাওয়াব পেয়ে গেলো। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

২) কিয়াম বা দাঁড়িয়ে সালাত নামাজ আদায় করাঃ

নারী এবং পুরুষ উভয়কে দাঁড়িয়ে সালাত / নামাজ আদায় করতে হবে। তবে অসুস্থ হলে বসে এবং বসতে অক্ষম হলে শুয়ে ইশারায় সালাত পড়তে হবে। কিয়ামের বিষয়ে বিস্তারিত বলা যায়

(ক) কিয়ামের নিম্নতম সীমা হচ্ছে যে, হাত বাড়ালে হাত যেন হাঁটু পর্যন্ত না পৌঁছে আর পূর্ণাঙ্গ কিয়াম হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়ান। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

(খ) ততটুকু সময় পর্যন্ত কিয়াম করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কিরাত পাঠ করা হবে। যতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া ফরয ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ানোও ফরয। যতটুকু পরিমাণ ওয়াজীব ততটুকু পরিমাণ কিরাত ওয়াজীব এবং যতটুকু পরিমাণ কিরাত সুন্নাত ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ান সুন্নাত। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয, বিতর, দুই ঈদ এবং ফযরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরয। যদি সঠিক কারণ (ওজর) ব্যতীত কেউ এসব নামায বসে বসে আদায় করে, তবে তার নামায হবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

(ঘ) দাঁড়াতে শুধু একটু কষ্টবোধ হওয়া কোন ওযরের মধ্যে পড়ে না বরং কিয়াম ঐ সময় রহিত হবে যখন মোটেই দাঁড়াতে পারে না অথবা সিজদা করতে পারে না অথবা দাঁড়ানোর ফলে বা সিজদা করার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা দাঁড়ানোর ফলে প্রস্রাবের ফোটা চলে আসে অথবা এক চর্তুথাংশ সতর খুলে যায় কিংবা কিরাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম হয়। এমনি দাঁড়াতে পারে কিন্তু তাতে রোগ

বৃদ্ধি পায় বা দেরীতে সুস্থ হয় বা অসহ্য কষ্ট অনুভব হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

(ঙ) যদি লাঠি দ্বারা খাদিমের সাহায্যে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে এ অবস্থায়ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

(চ) যদি শুধুমাত্র এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, কোন মতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে তবে তার জন্য ফরয হচ্ছে দাঁড়িয়ে "أَللهُ اَكْبَر" বলা। এরপর যদি দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বসে বসে নামায আদায় করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

(ছ) সাবধান! কিছু লোক সামান্য কষ্টের (আঘাতের) কারণে ফরয নামায বসে আদায় করে, তারা যেন শরীয়াতের এ আদেশের প্রতি মনোযোগ দেয় যে, **দাঁড়িয়ে আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যত ওয়াক্ত নামায বসে বসে আদায় করা হয়েছে সবগুলো পুনরায় আদায় করে দেওয়া ফরয।** অনুরূপভাবে এমনি দাঁড়াতে পারে না, তবে লাঠি বা দেয়াল কিংবা মানুষের সাহায্যে দাঁড়ানো সম্ভব ছিলো কিন্তু বসে বসে পড়েছে তাহলে তাদের নামাযও হয়নি। তা পুনরায় পড়ে নেয়া ফরয। (***বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৬৪ পৃষ্ঠা***) ইসলামী বোনদের জন্যও একই আদেশ। তারাও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে বসে নামায আদায় করতে পারবে না। অনেক মসজিদে বসে নামায আদায় করার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক বৃদ্ধলোক দেখা গেছে এতে বসে ফরয নামায আদায় করে থাকে, অথচ তারা পায়ে হেঁটে মসজিদে এসেছে, নামাযের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তাও বলে, এমন সব বৃদ্ধ লোক যদি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে নামায আদায় করে থাকে তবে তাদের নামায হবে না।

(জ) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে আদায় করতে পারবে, তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضى الله عنه থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: বসে নামায আদায়কারী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক (অর্থাৎ অর্ধেক সাওয়াব পাবে)। (সহীহ মুসলিম,

২য় খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা) অবশ্য অসুবিধার (অক্ষমতার) কারণে বসে পড়লে সাওয়াবে কম হবে না। বর্তমানে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে,

৩. কিরাত পড়াঃ

কুরআন আল কারীমের কিছু অংশ পাঠ করা। কিরাত পড়া বিষয়ে বিস্তারিত বলা যায়

(ক) কিরাত হলো, সমস্ত অক্ষরসমূহ তার মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান থেকে) আদায় করার নাম, যেন প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে পৃথকভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(খ) নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজে পড়া আবশ্যক যে, যেন নিজে শুনতে পায়। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৭১ পৃষ্ঠা)

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর যদি অক্ষরগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু এত নিম্নস্বরে পড়েছে যে, নিজের কানেও শুনেনি অথচ এ সময় কোন অন্তরায় যেমন হৈ চৈও ছিলো না, আবার কান ভারী (অর্থাৎ বধির)ও নয় তবে তার সালাত / নামায হলো না। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) যদিও নিজে শুনাটা জরুরী তবে এটার প্রতিও এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, নীরবে কিরাত পড়ার নামাযগুলোতে যেন কিরাতের আওয়াজ অন্যজনের কানে না পৌঁছে, অনুরূপভাবে তাসবীহ সমূহ আদায় কালেও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

(ঙ) নামায ব্যতীত যেসব স্থানে কিছু বলা বা পড়াটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানেও এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কমপক্ষে এমন আওয়াজ হয় যেন নিজে শুনতে পায়। যেমন- তালাক দেয়া, গোলাম আযাদ করা অথবা জন্তু যাবেহ করার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা্আলার নাম নেয়া। এসব ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজ আবশ্যক যেন নিজের কানে শুনতে পায়। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) দরূদ শরীফ ইত্যাদি ওযীফা সমূহ পড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে

এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত যেন নিজে শুনতে পায়, তবেই পাঠ করা হিসেবে গণ্য হবে।

(চ) শুধুমাত্র বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ফরয, আর বিতর, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী সকলের উপর ফরয। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

(ছ) মুক্তাদির জন্য নামাযে কিরাত পড়া জায়েয নেই। না সূরায়ে ফাতিহা, না অন্য আয়াত, না নীরবে কিরাতের নামাযে, না উঁচু আওয়াজের কিরাতের নামাযে। ইমামের কিরাতই মুক্ততাদীর জন্য যথেষ্ট। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২২৭ পৃষ্ঠা)

(জ) ফরয নামাযের কোন রাকাতে কিরাত পড়লো না বা শুধু এক রাকাতে পড়লো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(ঝ) ফরয নামাযগুলোতে ধীরে ধীরে, তারাবীতে মধ্যম গতিতে ও রাতের নফল নামাযে তাড়াতাড়ি কিরাত পড়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এমনভাবে পড়তে হবে যেন কিরাতের শব্দ সমূহ বুঝে আসে অর্থাৎ কমপক্ষে মদের (দীর্ঘ করে পড়ার) যতটুকু সীমা কারীগণ নির্ধারণ করেছেন ততটুকু যেন আদায় হয়, নতুবা হারাম হবে। কেননা তারতীল (অর্থাৎ থেমে থেমে) সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ রয়েছে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা) বর্তমানে অধিকাংশ হাফিয সাহেবগণ এভাবে পড়ে থাকেন যে, মদ সমূহের আদায়তো দূরের কথা আয়াতের শেষের দু'একটি শব্দ যেমন- يَعْلَمُوْنَ/ تَعْلَمُوْنَ ছাড়া বাকী কোন শব্দই বুঝা যায় না। এক্ষেত্রে অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না বরং দ্রুত পড়ার কারণে অক্ষরগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে যায় আর এভাবে দ্রুত পড়ার কারণে গর্ববোধ করা হয় যে, অমূখ হাফিয সাহেব খুব তাড়াতাড়ি পড়ে থাকেন! অথচ এভাবে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হারাম ও শক্ত হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৮৬, ৮৭ পৃষ্ঠা)

৪. রুকূ করাঃ

এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাত উভয় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকূর নিম্নতম পর্যায়। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) আর পূর্ণাঙ্গ রুকূ হচ্ছে পিঠকে সমান করে সোজাসুজি বিছিয়ে দেয়া। (তাহতাবীর পাদটিকা, ২২৯ পৃষ্ঠা), রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার ঐ নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকূ ও সিজদা সমূহের মাঝখানে পিঠ সোজা করা হয় না।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ১০৮০৩)

৫. সিজদা করাঃ

(ক) নবী করীম ﷺ বলেন, আমাকে হুকুম করা হয়েছে সাতটি হাঁড় দ্বারা সিজদা করার জন্য। ঐ সাতটি হাড় হলো মুখ (কপাল) ও উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতা আরও হুকুম হয়েছে যে, কাপড় ও চুল যেন সংকুচিত না করি।" (সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

(খ) প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা ফরয। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদাতে কপাল জমিনের উপর ভালভাবে স্থাপন করা আবশ্যক। ভালভাবে স্থাপনের অর্থ হচ্ছে; জমিনের কাঠিন্যতা ভালভাবে অনুভূত হওয়া। যদি কেউ এভাবে সিজদা করে যে, কপাল ভালভাবে জমিনে স্থাপিত হয়নি তাহলে তার সিজদা হয়নি। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

(ঘ) কেউ কোন নরম বস্তু যেমন ঘাস (বাগানের সতেজ ঘাস), তুলা অথবা কার্পেট ইত্যাদির উপর সিজদা করলো, যদি এমতাবস্থায় কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয় অর্থাৎ কপালকে এতটুকু চাপ দিলো যে, এরপর আর চাপা যায় না, তাহলে তার সিজদা হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। (তাবঈনুল হাকাইক, ২য় খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)।

৬. শেষ বৈঠকে বসা

শেয বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাছুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয় তাকেই বলে শেষ বৈঠক। ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

একে কা'দায়ে আখিরা বলা হয়। শেষ বৈঠকে বসা (যে বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাছুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত / নামাজ শেষ করা হয় তাকেই বলে শেষ বৈঠক) ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত / নামাজ শেষ করা। অর্থাৎ নামাযের রাকাত সমূহ পূর্ণ করার পর সম্মপূর্ণ তাশাহহুদ অর্থাৎ (আততাহিয়াত) পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। (ফাতওয়া ই আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে চতুর্থ রাকআতের পর কেউ ভুলে কা'দা করলো না, তাহলে পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে যখনই মনে পড়বে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে অথবা ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো কিংবা মাগরিবে তৃতীয় রাকাতে না বসে চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিলো, তবে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবেন। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

৭. খুরুজে বিসুনইহী (সালামের মাধ্যমে সালাত / নামাজ শেষ করা)ঃ অর্থাৎ কা'দায়ে আখিরাহ্ এরপর সালাম বা কথাবার্তা ইত্যাদি এমন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা যা নামায ভঙ্গ করে দেয়। তবে সালাম ব্যতীত অন্য কোন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে নামায শেষ করলে ঐ নামায পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজীব। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ ধরণের কোন কাজ করা হয় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)।

পরিশেষে বলা যায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল কে যেভাবে সালাত / নামাজ আদায় করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

যেভাবে সালাত / নামাজ আদায় করেছেন তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের সালাত / নামাজ আদায় করা শিখিয়েছেন আমরা সকলেই যেন সেভাবে খুশু খুযুর সাথে সালাত / নামাজ আদায় করতে পারি, আমীন।

সুত্রঃ https://site.proshikkhon.net/ahkam-and-arkan-of-salah/

অনুশীলনী -০২ (জানুয়ারী-৪র্থ সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী - সূরা যিলযালঃ

(১) যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে,

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

(ইজা ঝুলঝিলাতিল আরদু ঝিলঝালাহা)

(২) যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে,

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (ওয়া আখরাযাতিল আরদু আছক্বলাহা)

(৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হ'ল?

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (ও ক্বলাল ইংছানু মাা লাহা)

(৪) সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (ইয়ওমা ইজিন তুহাদ্দিছু আখবারাহা)

(৫) কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন।

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (বিআন্না রব্বাকা আওহালাহা)

(৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়।

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (ইয়মাইজি ইয়াছদুরুন্নাছু আশতাাতাল লিয়ূরাও আ'মালাহুম)

(৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (ফামাই ইয়া’মাল মিছক্বলা জাররাতিং খইরাই ইয়ারা)

(৮) আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (ওমাই ইয়া’মাল মিছক্বলা জাররাতিং শাররাই ইয়ারা)

বিষয়বস্তু :

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হ’ল ক্বিয়ামত অনুষ্ঠান। যা দু’টি ভাগে আলোচিত হয়েছে। **প্রথমভাগে** ক্বিয়ামত অনুষ্ঠানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে (১-৫ আয়াত)। **দ্বিতীয়ভাগে** বলা হয়েছে যে, মানুষকে ঐদিন স্ব স্ব আমলনামা দেখানো হবে। অতঃপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে তার যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে (৬-৮ আয়াত)।

গুরুত্ব :

(১) সূরাটিতে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের চূড়ান্ত ভূকম্পনের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এবং মানুষকে অণু পরিমান সৎকর্ম হ’লেও তা করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(২) কবি ফারাযদাক্ব-এর চাচা (বরং দাদা) ছা‘ছা‘আহ বিন মু‘আবিয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সূরা যিলযাল পুরাটা শুনিয়ে দিলেন। শেষে পৌঁছে গেলে তিনি বলে উঠলেন, حَسْبِى لاَ أُبَالِى أَنْ لاَ أَسْمَعَ غَيْرَهَا ‘যথেষ্ট! এটা ব্যতীত কুরআনের আর কিছু না শুনলেও চলবে’।[১]

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এল। অতঃপর বলল, أَقْرِئْنِى يَا رَسُولَ اللهِ ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন’। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি ‘আলিফ লাম রা’ বিশিষ্ট সূরা সমূহের তিনটি পাঠ কর। লোকটি বলল, আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে, হৃদয়

শক্ত হয়ে গেছে, জিহবা মোটা হয়ে গেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হা-মীম' বিশিষ্ট সূরা পড়। লোকটি আগের মতই বলল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহ'লে 'মুসাব্বিহাত' থেকে তিনটি পড়। লোকটি আগের মতই বলল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ সূরা (سُوْرَةٌ جَامِعَةٌ) শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সূরা যিলযাল পাঠ করে শুনালেন। ক্বিরাআত শেষ হ'লে লোকটি বলল, وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَداً 'যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর উপরে মোটেই বৃদ্ধি করব না'। অতঃপর লোকটি পিঠ ফিরে চলে যেতে থাকল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'বার বললেন, أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ 'লোকটি সফলকাম হ'ল'।[২] অতঃপর বললেন, عَلَىَّ بِهِ 'ওকে আমার কাছে ডেকে আনো'। লোকটিকে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى جَعَلَهُ اللهُ عِيداً لِهَذِهِ الأُمَّةِ 'আমি ঈদুল আযহা সম্পর্কে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ এদিনকে এ উম্মতের জন্য ঈদ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন'। লোকটি বলল, হে রাসূল! আমি যদি ছোট একটি মাদী বকরীছানা ব্যতীত কিছুই না পাই, তাহ'লে আমি কি সেটাকে কুরবানী করব? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। বরং তুমি وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমার চুল-নখ কাটো, গোফ ছাটো, গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ কর, এটাই তোমার জন্য আল্লাহর নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হবে'।[৩]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, সূরা যিলযাল নাযিল হ'লে আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, لَوْلا أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ 'যদি তোমরা পাপ' না হ'তে, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ আরেকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন, যারা পাপী হ'ত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করতেন'।[৪]

(৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্র সূরার শেষ দু'টি আয়াতকে একত্রে الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন।[৫]

তাফসীর :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (১) ' যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্মপনে প্রকম্পিত হবে'।

زَلْزَلَ يُزَلْزِلُ زَلْزَلَةً زِلْزَالاً وَزَلزالاً 'ভূমিকম্প হওয়া'। অর্থাৎ حرَّكت الأرض من أصلها পুরা পৃথিবী প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠবে (কুরতুবী)। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ- **'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর বিষয়'। 'যেদিন তোমরা তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। যেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা তার দুগ্ধপানকারী সন্তান থেকে উদাসীন হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ খালাস করে ফেলবে। আর মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল সদৃশ। যদিও সে মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি অতীব কঠিন' (হজ্জ ১-২)**। এটি ইস্রাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকদানের পরের ঘটনা। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ **'যেদিন কম্পিত করবে কম্পিতকারী'। 'যার পিছে পিছে আসবে আরেকটি নিনাদ' (নাযে'আত ৬-৭)**। প্রথম নিনাদকে **نفخة صعق** 'কম্পনের নিনাদ' এবং দ্বিতীয় নিনাদকে **نفخة بعث** বা 'পুনরুত্থানের নিনাদ' বলা হয়। প্রথম নিনাদে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে নতুন পৃথিবী হবে। অতঃপর দ্বিতীয় নিনাদের পরেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাতে মৃতরা সব জীবিত হয়ে উঠে যাবে। দুই নিনাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান হবে চল্লিশ। সেটি দিন, মাস না বছর, সে বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বলতে অস্বীকার করেন’।[৬] পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের আলোকে অত্র আয়াতের অর্থ দ্বিতীয় কম্পনের বলে অনুমিত হয়।

(২) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ‘যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে’।

অর্থাৎ কবরবাসীরা সবাই জীবিত হয়ে বের হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ **‘অতঃপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যাবে ও দেখতে থাকবে’ (যুমার ৬৮)**। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ **‘যেদিন মানুষ বিশ্বপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে’ (মুত্বাফফেফীন ৬)**। আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ **‘যেদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে’। ‘এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে’ (ইনশিক্বাক্ব ৩-৪)**। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভূগর্ভে বহু সোনা-দানা খনি আকারে মানুষের জন্য সঞ্চিত রাখা হয়েছে যা উত্তোলন করে জনকল্যাণে ব্যয় করা মানুষের যরূরী কর্তব্য। যেমন হাদীছেও এ বিষয়ে বক্তব্য এসেছে যে, ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ‘পৃথিবী উগরে দিবে ভূগর্ভে সঞ্চিত মূল্যবান স্বর্ণ-রৌপ্যসমূহ, যা বড় বড় স্তম্ভের মত’।[৭] অর্থাৎ কবর সমূহ থেকে মানুষ এবং ভূগর্ভ থেকে অন্যান্য সবকিছু বের করে দেওয়া হবে।

(৩) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ‘এবং মানুষ বলবে, এর কি হ’ল’?

অর্থাৎ পৃথিবীর এই ভয়ংকর পরিবর্তিত অবস্থা দেখে বিশেষ করে কাফেররা ভীতবিহবল হয়ে বলবে, ما الذي حدث لها وما شأنها ‘এর কি হ’ল? এর কি অবস্থা’? কেননা তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না। মুমিনরা ভীতচকিত হ’লেও বিস্মিত হবে না। কেননা আগে থেকেই তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল।

(৪) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে'।

কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বলেন, এর অর্থ হ'ল أى تخبر الأرض يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر -'পৃথিবী সেদিন তার উপরে যে সব ভাল ও মন্দ কর্ম সংঘটিত হয়েছে, সব বলে দেবে'। يَوْمَئِذٍ 'বদল' হয়েছে إِذَا زُلْزِلَتِ থেকে। সেকারণ يَوْمَ -এর উপরে 'যবর' হয়েছে। في ذلك الوقت تحدث أخبارها 'সেই সময় পৃথিবী তার সব খবর বলে দেবে' (ক্বাসেমী)।অথবা এটি جواب شرط হয়েছে إِذَا زُلْزِلَتِ থেকে। অর্থাৎ যেদিন ক্বিয়ামত হবে, সেদিন পৃথিবী সবকিছু বলে দেবে'। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মুওয়াযযিনের আযানের ধ্বনি জিন, ইনসান, গাছ, পাথর, মাটি সহ যেই-ই শুনবে, সকল বস্তুই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে'।[৮] আর এটা হবে আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসাবে এবং পাপীদের অস্বীকারের জওয়াব হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ- **'স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমরা সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছিল তাদেরকে আমরা বলব, কোথায় তোমাদের শরীকগণ যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করতে'? 'তখন তাদের শিরকের ফল এছাড়া আর কিছুই হবে না যে তারা বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না' (আন'আম ২২-২৩; মুমিন ৭৪)**। তবে পৃথিবী সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে তাদের আর কিছুই বলার থাকবে না।

(৫) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا 'কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন'।

أَوْحَى لَهَا অর্থ أوحى إليها 'তার প্রতি নির্দেশ দিবেন'। অর্থাৎ أَذِنَ لَهَا فِي أَنْ تُحَدِّثَ أَخْبَارَهَا 'আল্লাহ তাকে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করার

অনুমতি দিবেন’। কেবল পৃথিবীকে নয়, বরং মানুষের চোখ, কান ও দেহচর্ম সবাইকে আল্লাহ কথা বলার অনুমতি দিবেন এবং তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ **‘যেদিন আল্লাহর শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে’। ‘অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে’। ‘জাহান্নামীরা তখন তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন’ (হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ১৯-২১)**। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ **‘আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে তাদের পা’ (ইয়াসীন ৬৫)**।

(৬) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ‘সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়’।

অর্থাৎ সেদিন মানুষ তাদের কবর হ’তে হিসাবস্থলের দিকে দলে দলে সমবেত হবে। অতঃপর হিসাব শেষে সেখান থেকে কেউ জান্নাতীদের ডান সারিতে কেউ জাহান্নামীদের বাম সারিতে প্রকাশ পাবে (ওয়াক্বি‘আহ ৭-৯; বালাদ ১৭-১৯)। এভাবে মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا **‘সেদিন আমরা দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত**

মেহমানরূপে সমবেত করব'। 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেব' (মারিয়াম ৮৫-৮৬)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ- **'যে দিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে হাযির করা হবে' (রূম ১৪-১৬)।**

أَشْتَاتًا অর্থ فِرَقًا فِرَقًا 'দলে দলে'। একবচনে شَتٌّ (কুরতুবী)। لِيُرَوْا অর্থ ليريهم الله جزاء ماعملوه فى الدينا من خير وشر أَعْمَالَهُمْ 'দুনিয়ায় তাদের ভাল-মন্দ কর্মের ফলাফল আল্লাহর পক্ষ হ'তে দেখানোর জন্য'। সেদিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিয়ে বলা হবে,

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا **'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' (ইসরা ১৪)।** অতএব মানুষের কর্তব্য প্রতিদিন শুতে যাবার আগে নিজের কর্মের হিসাব নিজে নেওয়া। কেননা তার সব কর্মই লিখিত হচ্ছে।

(৭) **فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ** 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'।

(৮) **وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ** 'এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে'।

ذَرَّةٍ অর্থ বিন্দু, ছোট্ট ফোটন কণা (ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এর চেয়েও ছোট ফোটন কণা)। এর দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছোট্ট বস্তুর উপমা বুঝানো

হয়েছে। অর্থাৎ পাপ বা পূণ্য যত ছোটই হৌক না কেন ক্বিয়ামতে বিচারের দিন তা দেখা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এক ফোটন কণা পরিমান যুলুম করবেন না। যদি কেউ ফোটন কণা পরিমান সৎকর্ম করে, তবে তিনি তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে মহা পুরস্কার দান করে থাকেন' (নিসা ৪/৪০)। সেদিন সব আমল ওজন করা হবে। যার ওজন ভারী হবে, সে জান্নাতী হবে। আর যার ওজন হালকা হবে, সে জাহান্নামী হবে' (ক্বারে'আহ ১০১/৬-৯)। ঐ ওজন কিভাবে করা হবে, সেটি কেবল আল্লাহ জানেন।

অর্থাৎ সৎ বা অসৎকর্ম, তা যত ছোটই হৌক না কেন, সবকিছু ঐদিন হিসাবে চলে আসবে এবং তার যথাযথ প্রতিদান ও প্রতিফল পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ، '**সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও..., (আলে ইমরান ৩০)।** তবে যে ব্যক্তি অন্যায় কর্ম থেকে খালেছ অন্তরে তওবা করে, সে ব্যক্তির উক্ত মন্দকর্ম হিসাব থেকে বাদ যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار، '**হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা কর খালেছ তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়' (তাহরীম ৮)।** বিচারের দিন কিছু মুমিনের গোপন পাপ সম্পর্কে আল্লাহ একাকী তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন। তখন সে সব কথা স্বীকার করবে। যখন আল্লাহ দেখবেন যে, এতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনি তাকে বলবেন, إِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ 'আমি এগুলি তোমার উপর

দুনিয়ায় গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তোমার জন্য ঐগুলি ক্ষমা করে দিলাম’।[৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের শেষ দিকে অত্র আয়াতটি (যিলযাল ৭-৮) সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, اَلْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ‘এটি অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত’।[১০] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অত্র আয়াতটিকে أحكم آية فى القرآن ‘কুরআনের সবচেয়ে বড় বিধান দানকারী আয়াত’ বলে অভিহিত করেছেন এবং সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত’ (কুরতুবী)।

শিক্ষাঃ

কিয়ামত ও পৃথিবীর কম্পন:

সূরাটির প্রথম অংশে কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর ওপর প্রবল ভূমিকম্প হবে এবং ভূমি তার অভ্যন্তরে থাকা সব ভার বা মৃতদের বের করে দেবে।

মানুষের জিজ্ঞাসা ও পৃথিবীর সাক্ষ্য: এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'পৃথিবীর কী হলো?' তখন আল্লাহ পৃথিবীকে তার গোপন কথা জানানোর আদেশ দেবেন, যার ফলে পৃথিবী তার ভেতরের সকল রহস্য প্রকাশ করবে।

মানুষের কর্মের বিচার: এরপর মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কর্মের ফল দেখতে আসবে। আল্লাহ বলেন, "সুতরাং যে কেউ ফোটন কণা পরিমাণও ভালো কাজ করেছে, সে তা দেখবে। আর যে কেউ ফোটন কণা পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে, সেও তা দেখবে।"

কাজের হিসাব ও পরকালীন জীবন: এই সূরার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে করা প্রত্যেকটি ভালো বা খারাপ কাজের হিসাব কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে উপস্থিত হবে। এটি মৃত্যুর পরের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

কর্মের গুরুত্ব: সূরা যিলযাল গুরুত্ব দেয় প্রতিটি কাজের উপর, তা যতই সামান্য হোক না কেন। এই শিক্ষা মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে।

পরকালের প্রস্তুতি: এই সূরা পরকালের বাস্তবতাকে তুলে ধরে এবং মানুষকে দুনিয়ার জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে, কারণ প্রত্যেকের কাজের হিসাব দিতে হবে।

সতর্ক বার্তা: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্ক বার্তা, যা মানুষকে তাদের কর্ম সম্মপর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাদের ভালো ও মন্দ কাজের পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে।

জাহান্নাম থেকে বাঁচুন :

(১) হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো একটা খেজুরের টুকরা দিয়ে হ'লেও কিংবা একটু মিষ্ট কথা দিয়ে হ'লেও'।[১১]

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 'সামান্য নেকীর কাজকেও তুমি ছোট মনে করো না। এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হ'লেও'।[১২]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ 'হে মুমিন নারীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে বকরীর পায়ের দুই ক্ষুরের মধ্যেকার সামান্য গোশত দিয়ে সাহায্য করাকেও তুচ্ছ মনে করো না'।[১৩] উম্মে বুজাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ 'পোড়ানো ক্ষুর হ'লেও সায়েলকে দাও'।[১৪]

(৪) আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يَّسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা খেজুরের টুকরা দিয়েও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে, তবে সে যেন তা করে’।[১৫] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً ‘হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ’তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহর পক্ষ হ’তে কৈফিয়ত তলব করা হবে’।[১৬]

(৫) হযরত জাবের ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ ‘প্রত্যেক নেকীর কাজই ছাদাক্বা’।[১৭]

কাফিরের সৎকর্ম : প্রশ্ন হ’ল, ক্বিয়ামতের দিন কাফিররা তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাবে কি?

এর জবাব এই যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে বা তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আখেরাতে কিভাবে পুরস্কার পেতে পারে? আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ- **‘যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের সেখানে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবেনা যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও হালকা করা হবেনা। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি’ (ফাত্বির ৩৬)**। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ- قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ-

‘জাহান্নামের অধিবাসীরা তাদের প্রহরীদের বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের শাস্তি হালকা করেন’। জবাবে ‘তারা বলবে, তোমাদের নিকটে কি নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের

রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, নিশ্চয়ই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তাহ'লে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়ে থাকে' (গাফের/মুমিন ৪৯-৫০)।

বস্তুত কাফিরদের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহ দুনিয়াতেই দিবেন তাদের নাম-যশ বৃদ্ধি, সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানাদি ও রূযী বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। যেমন তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ **'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমরা তার ফসল বর্ধিত করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। তবে তার জন্য আখেরাতে কিছুই থাকবে না' (শূরা ২০)**। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا **'আর আমরা তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' (ফুরক্বান ২৩)**। কেননা কুফরী তাদের সকল সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দিবে এবং তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমল ওযন করার জন্য দাড়িপাল্লাও খাড়া করা হবেনা। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا **'(ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী হ'ল তারাই) যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের সমস্ত আমল নিস্ফল হয়ে যায়। অতএব ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাড়িপাল্লা খাড়া করব না' (কাহফ ১০৫)।**

কেননা তা নেকী হ'তে খালি থাকবে। তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তবে তাদের পাপের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য হ'তে পারে। যেমন আবু ত্বালিবের শাস্তি সবচেয়ে কম হবে। তাকে আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটবে। তবে এটি ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাছ। যেমন তিনি বলেন, 'আমি তাকে আগুনে ডুবন্ত পেয়েছিলাম। অতঃপর (সুপারিশের মাধ্যমে) আমি তাকে হালকা আগুনে উঠিয়ে আনি। অর্থাৎ টাখনু পর্যন্ত আগুনে পুড়বে'। তিনি

বলেন, 'যদি আমি না হ'তাম, তাহ'লে তিনি থাকতেন জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে'।[১৮] শাস্তির এই তারতম্য আখেরাতে সকল কাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি-না, সেটি সম্মপূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারে। তবে এটা নিশ্চিত যে, কাফেররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ- خَالِدِينَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত এবং ফেরেশতামন্ডলী ও সকল মানুষের লা'নত'। 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা করা হবেনা এবং তাদের কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবেনা' (বাক্বারাহ ১৬১-৬২)।

সারকথা :

কর্ম যত ছোটই হৌক তা ধ্বংস হয় না। অতএব সৎকর্ম যত ছোটই হৌক তা করতে হবে এবং পাপ যত ছোটই হৌক তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সুত্রঃ

[১]. নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৯৪; আহমাদ হা/২০৬১২, হাদীছ ছহীহ; ফারাযদাক্ব-এর দাদা হওয়াটাই সঠিক। তাঁর বংশ পরিচয় হ'ল : ফারাযদাক্ব আল-হাম্মাম বিন গালিব বিন ছা'ছা'আহ বিন নাজিয়াহ (আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৭০২৯)।

[২]. الرُّوَيْجِلُ শব্দটি الراجل থেকে تصغير হয়েছে। অর্থ الماشى ضد الراكب 'পায়ে চলা ব্যক্তি, যা আরোহীর বিপরীত'।

[৩]. আহমাদ হা/৬৫৭৫, আরনাঊত্ব; সনদ হাসান; হাকেম হা/৩৯৬৪, সনদ ছহীহ; তাফসীর ইবনু কাছীর।

[৪]. ত্বাবারাণী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৫১২; হায়ছামী বলেন, এর সকল রাবী ছহীহ-এর রাবী এবং এর দুর্বলতাটুকুর জন্য শাওয়াহেদ রয়েছে, যা তাকে

শক্তিশালী করে। কুরতুবী হা/৬৪৩৬; হাদীছের শেষের অংশটি (لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ الخ) মুসলিম হা/২৭৪৮ ও তিরমিযী হা/৩৫৩৯-য়ে বর্ণিত হয়েছে।

[৫]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৩।

[৬]. বুখারী হা/৪৯৩৫, মুসলিম হা/২৯৫৫, মিশকাত হা/৫৫২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'শিঙ্গায় ফুঁক দান' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী হা/৬৫১৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[৭]. মুসলিম হা/১০১৩; তিরমিযী হা/২২০৮; মিশকাত হা/৫৪৪৪ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।

[৮]. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৯; বুখারী হা/৬০৯; নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৫৬, ৬৬৭।

[৯]. বুখারী হা/২৪৪১; মুসলিম হা/২৭৬৮।

[১০]. বুখারী হা/৪৯৬২; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।

[১১]. বুখারী হা/৮৪১৭' যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৮৫৭ 'নবুঅতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ।

[১২]. মুসলিম হা/২৬২৬, তিরমিযী হা/১৮৩৩, মিশকাত হা/১৮৯৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

[১৩]. বুখারী হা/২৫৬৬; মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯২।

[১৪]. আহমাদ হা/১৬৬৯৯; নাসাঈ হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/১৯৪২ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ।

[১৫]. মুসলিম হা/১০১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ।

[১৬]. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩, মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।

[১৭]. বুখারী হা/৬০২১, মুসলিম হা/১০০৫, মিশকাত হা/১৮৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৬।

[১৮]. বুখারী হা/৫১৭; মুসলিম হা/৩৬১, ৩৫৮; মিশকাত হা/৫৬৬৮ 'জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

বইঃ সংগঠন পদ্ধতি

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মাদ মা'ছুম চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বরঃ ১৯৮৩
৫২ তম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০২১

প্রকাশকের কথা ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সুন্দর, সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদন করার জন্য জামায়াতে ইসলামী যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ০৪ (চার) দফা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সংগঠন পদ্ধতি বইটি মূলত জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমষ্টি।

ভূমিকা ঃ সংগঠন পদ্ধতির ২টি দিক গুরূত্বপূর্ণঃ- **১**। কর্মনীতি বা কর্ম কৌশল; ২। কর্মসূচি বা আন্দোলনের বহুমুখী কাজের নির্ঘণ্ট।

(খ) জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধন করে তদানীন্তন বিশ্বে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন, সে বিপ্লবী কর্মসূচিকেই জামায়াতে ইসলামী তার কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ ঃ

১। চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন ঃ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২। সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পনড়ব হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।

৩। সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা ঃ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন ঃ গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

প্রথম দফা কর্মসূচি ঃ

দাওয়াত ও তাবলীগ দাওয়াতের মাধ্যমে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠনের কাজ গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের প্রথম দফা কর্মসূচি হলো ঃ "বাংলাদেশের সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের প্রকৃতরূপ বিশেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।" **প্রথম দফার তিনটি দিক ঃ**

১। সকল নাগরিকের নিকট ইসলামের সঠিক ধারণা তুলে ধরা।

২। ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান।

৩। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান।

এ দফার কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যক্তিগত যোগাযোগ (টার্গেট ভিত্তিক ও সাধারণ)। ২। গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ ৩। ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ৪। বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন ৫। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ৬। বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয় ৭। পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং ৮। মাসিক সাধারণ সভা ৯। দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল ১০। দাওয়াতী ইউনিট গঠন ১১। আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ ১২। সিরাতুন্নবী মাহফিল ১৩। আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল ১৪। ইসলামী দিবস পালন ১৫। মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ ও মসজিদ সংগঠিতকরণ ১৬। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ ১৭। দাওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ পালন ও দাওয়াতী অভিযান/গণসংযোগ অভিযান ১৮। জুম'আ বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা ১৯। দাওয়াতী চিঠি/ফোন আলাপ ও ইন্টারনেট ব্যবহার ২০। দাওয়াতী বই উপহার প্রদান ২১। ইফতার মাহফিল ২২। সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ২৩। চা-চক্র ও বনভোজন ২৪। হামদ-না'ত ইত্যাদির চর্চা ২৫। দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার ।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি হলো ঃ "ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং

তাহাদিগকে ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্নব হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।”

দ্বিতীয় দফার প্রধানত দুটো দিক রয়েছে ঃ (ক) সংগঠন ও (খ) প্রশিক্ষণ

(ক) সংগঠন

জামায়াতের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ

১। জামায়াতের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

২। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উন্নত রাখার জন্য পারস্পরিক সংশোধনের সম্মানজনক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৩। সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার নিরিখে গ্রহণ করা হয়।

জামায়াতের স্তর বিন্যাসের দু'টি দিক ঃ

(ক) সাংগঠনিক জনশক্তির স্তর বিন্যাস (খ) সাংগঠনিক কাঠামোর স্তর বিন্যাস

(ক) সাংগঠনিক জনশক্তির স্তর বিন্যাস ঃ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে জনশক্তিকে সদস্য (রুকন) ও সহযোগী সদস্য ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা থাকলেও কার্যত জনশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত। সহযোগী সদস্য, কর্মী ও সদস্য (রুকন)।

ক। সহযোগী সদস্য

খ। কর্মী ঃ কর্মীর ৫ টি কাজঃ ১) নিয়মিতভাবে বৈঠকে যোগদান করেন, ২) ইয়ানত দেন, ৩) রিপোর্ট রাখেন ও বৈঠকে পেশ করেন ৪) দাওয়াতী কাজ করেন ও ৫) সামাজিক কাজ করেন তাদেরকে জামায়াতের কর্মী বলা হয়।

গ। সদস্য বা রুকন।

খ) সাংগঠনিক কাঠামোর স্তর বিন্যাসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

❖কেন্দ্র ❖জেলা/মহানগরী ❖উপজেলা/থানা ❖পৌরসভা/ইউনিয়ন ❖ওয়ার্ড ❖ইউনিট

ক) কেন্দ্রঃ ১। আমীরে জামায়াত ২। মজলিশে শুরা ৩। কর্ম পরিষদ ৪। নির্বাহি পরিষদ ৫। কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন ৬। জেলা/মহানগরী আমীর সম্মেলন

খ) জেলা/মহানগরীঃ ১। জেলা/মহানগরী আমীর ২। জেলা/মহানগরী মজলিশে শুরা ৩। জেলা/মহানগরী কর্ম পরিষদ ৪। জেলা/মহানগরী সদস্য (রুকন) সম্মেলন

ও মাসিক সদস্য (রুকন) বৈঠক ৫। জেলা/মহানগরী বৈঠক ৬। জেলা/মহানগরী পর্যায়ে বিভাগ বন্টন

গ) উপজেলা/থানাঃ ১। উপজেলা/থানা আমীর বা সভাপতি ২। উপজেলা/থানা মজলিশে শুরা ৩। উপজেলা/থানা কর্ম পরিষদ ৪। উপজেলা/থানা সদস্য (রুকন) বৈঠক ৫। উপজেলা/থানা বৈঠক ৬। সংগঠিত উপজেলা/থানা

ঘ) পৌরসভা/ইউনিয়নঃ ১। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে আমীর বা সভাপতি ২। পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সদস্য (রুকন) বৈঠক ৩।পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড বৈঠক ৪। সংগঠিত ইউনিয়ন

ঙ) ওয়ার্ডঃ

১। দাওয়াতী ইউনিট

২। ইউনিট, শর্তসমুহঃ ঃ (ক) কমপক্ষে চারজন কর্মী থাকা (খ) নিয়মিত বৈঠকাদি হওয়া; (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসে কমপক্ষে একবার দাওয়াতী গ্রুপ বের করা; (ঘ) ও একজন সক্রিয় সভাপতি কর্তৃক কাজ পরিচালিত হওয়া; (ঙ) মাসিক রিপোর্ট ও নিছাব যথারীতি আদায় করা;

৩। ইউনিট প্রোগ্রামঃ ইউনিটে প্রতিমাসে কমপক্ষে নিম্নোক্ত ৪টি প্রোগ্রাম করতে হবে।

i) কর্মী বৈঠক। ইউনিট সভাপতি কর্মী বৈঠক পরিচালনা করবেন।

ii) সাধারণ সভা বা দাওয়াতী সভা

iii) প্রশিক্ষণ (তারবিয়াতী) বৈঠক

iv) দাওয়াতী অভিযান

৪। কর্মী বৈঠক

দ্বিতীয় দফার অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ নিম্মরূপ

১। টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ক) দাওয়াতি টার্গেট,

খ) কর্মী টার্গেট ঃ টার্গেট নেয়ার সময় যে সকল গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি বাছাই করা দরকার।

❖ কর্মঠ; ❖ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ; ❖ সামাজিক; ❖ সৎ ও সত্যপ্রিয়।

❖ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন।

গ) রুকন (সদস্য) টার্গেট

২। কর্মী যোগাযোগাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ক) কর্মী যোগাযোগের উদ্দেশ্যঃ মান উন্নয়ন, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, দুর্বলতা দূর করা, কাজে আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, সম্পর্ক আরো মধুর করা, সমস্যা অবগত হওয়া এবং সমাধান বের করা ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে দায়িত্বশীলদের কর্মী যোগাযোগ করতে হবে।

খ) কর্মী যোগাযোগের পদ্ধতি i) পূর্বেই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ। ii) সাক্ষাতের শুরুতে সালাম বিনিময়ের পর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জানার চেষ্টা। iii) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার খোঁজ-খবর নেওয়া ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। iv) সাংগঠনিক বিষয়াদী নিয়ে আলোচনা করা। v) আন্দোলন সংগঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবহিতকরণ। vi) কর্মীর দুর্বলতাগুলো দরদ ভরা মন দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া। vii) মান উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা। viii) সময় ও অর্থ ব্যয়ের ফজিলতগুলো কোরআন ও হাদীস থেকে বর্ণনা করা। ix) কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ব্যক্তিগত গুণাবলী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা। [সূরা মুমিনুন এর ১-১১, ফুরকান শেষ রুকু, মুজাম্মিল ১-৭ আয়াত] x) পারস্পরিক দোয়া কামনা করে শেষ করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধঃস্তন সংগঠনের ব্যক্তিদের সাথে কর্মী যোগাযোগ করতে হবে।

৩। সফর;

৪। পরিকল্পনাঃ

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হবেঃ ◆ জনশক্তি (সংগঠনের জনশক্তি) ◆ নেতৃত্বের মান ◆ কাজের পরিধি বা এলাকা ◆ বিভিন্ন দিকের পরিসংখ্যানমূলক জ্ঞান (জনসংখ্যা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদি)। ◆ কর্মীদের মান ◆ অর্থনৈতিক অবস্থা ◆ পরিবেশ ◆ বিরোধী মহলের শক্তি ও তৎপরতা।

খ) পরিকল্পনা পর্যালোচনা বৈঠক।

৫। সাংগঠনিক সপ্তাহ/পক্ষ পালন।

৬। নেতৃত্ব নির্বাচন।

৭। **বায়তুল মালঃ** ক) কর্মীদের আর্থিক কুরবাণী; খ) শুভাকাঙ্খীদের থেকে প্রাপ্ত।

৮। **রেকর্ডিংঃ** বিশেষ করে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো সংরক্ষণ করতে হয় ঃ

১. কর্মী ও সদস্যদের (রুকনদের) তালিকা (ঠিকানাসহ)
২. দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
৩. রিপোর্ট (সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত)
৪. বই-এর তালিকা
৫. সহযোগী সদস্যদের ফরম ও ফরমের মুড়ি
৬. সদস্যপ্রার্থী (রুকন প্রার্থী) আবেদনপত্র
৭. রশিদ বই-এর মুড়ি
৮. ক্যাশ বই
৯. লেজার
১০. বিভিন্ন পরামর্শ ফাইল
১১. বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী (শূরা/কর্মপরিষদ/ টীম, ষান্মাসিক সদস্য (রূকন) সম্মেলন, মাসিক সদস্য (রূকন) বৈঠক, কর্মী সম্মেলন, সভাপতি সম্মেলন, জনসভা, শিক্ষা শিবির, কেন্দ্রীয় সফর ইত্যাদি)।
১২. ছাপানো পোস্টার ও লিফেলেটের নমুনা কপি।
১৩. প্রকাশিত সংবাদ কাটিং, প্রেরিত সংবাদ কপি।
১৪. প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের তৎপরতা (নেতৃবৃন্দের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার)।
১৫. সার্কুলার ঃ (ক) ঊর্ধ্বতন থেকে প্রাপ্ত, (খ) অধঃস্তনে প্রেরিত।
১৬. বিশিষ্ট লোকদের তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত যোগাযোগ। যেমন রাজনৈতিক, উলামা-মাশায়েখ, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জনপ্রতিনিধি ব্যক্তিবৃন্দ।

উপরিউক্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য কমপক্ষে নিম্নলিখিত রেজিস্টার ও ফাইলের প্রয়োজন ঃ

রেজিস্টার ঃ i) কর্মী তালিকা (উপজেলা/থানায়) ii) বই তালিকা ও ইস্যু রেজিস্টার iii) সদস্য (রুকন) তালিকা iv) বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী v) ক্যাশবুক ও লেজার বুক vi) হাজিরা রেজিস্টার (বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিতি) vii) সদস্য (রুকন) টার্গেট তালিকা ও প্রার্থী রেজিস্টার viii) সাংগঠনিক রিপোর্ট রেকর্ড রেজিস্টার ix) সদস্যদের (রুকনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট রেজিস্টার x) দায়িত্বশীলদের ঠিকানা ও

ফোন নাম্বার xi) বিশিষ্ট লোকদের তালিকা xii) রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নাম ও ঠিকানা।

ফাইল ঃ i) সহযোগী সদস্য ফাইল (মুড়ি) ii) ভাউচার ফাইল iii) রিপোর্ট ফাইল (উপরে পাঠানো, অধঃস্তনের কপি) iv) সার্কুলার ফাইল (উপর থেকে প্রাপ্ত, নিচে প্রেরিত) v) চিঠির ফাইল (ঐ) vi) পরিকল্পনা ফাইল (কেন্দ্রীয়, জেলা/মহানগরী, উপজেলা/থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড) vii) সদস্যদের (রুকনদের) ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফাইল viii) সদস্য প্রার্থী (রুকন প্রার্থী) আবেদনপত্র ফাইল ix) রশিদ বই-এর মুড়ি x) পরামর্শ ফাইল।

৯। রিপোর্ট সংরক্ষণ

১০। অফিস।

(খ) প্রশিক্ষণ

১। পাঠ্যসূচি ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন।

২। প্রশিক্ষণ বৈঠক

৩। সামষ্টিক পাঠ।

৪। **পাঠচক্রঃ** পাঠচক্রের অধিবেশন মাসে কমপক্ষে ১টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতি অধিবেশন ২ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হবে না। পাঠচক্রকে ফলপ্রসূ করতে হলে নিম্নোক্ত দিকগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকারঃ

i) পাঠচক্রেরর সদস্যগণ সমমানের হবে। ii) পরিচালককে অবশ্যই অভিজ্ঞ ও যোগ্য হতে হবে। iii) পরিচালক পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনার জন্য প্রথম অধিবেশনেই প্রয়োজনীয় গাইড লাইন দেবেন। iv) সকল সদস্যই বিষয়বস্তুর উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নোট সাথে রাখবেন। v) অধিবেশনে সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে। vi) যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে। vii) যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। পূর্ণ আন্তরিকতা ও একাগ্রতা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে হবে। viii) পরিচালক আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করবেন এবং প্রতিটি পয়েন্টের উপসংহার পেশ করবেন। ix) প্রতিটি পয়েন্টের মূল কথাগুলোকে সকলে নোট করবেন।

৫। আলোচনা চক্র।

৬। শিক্ষা বৈঠক।

৭। শিক্ষা শিবির।

৮। গণশিক্ষা বৈঠক।

৯। গণ নৈশ ইবাদত

১০। ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ।

১১। মুহাসাবা।

১২। বক্তৃতা অনুশীলন।

১৩। দোয়া, যিকর ও নফল ইবাদত।

১৪। সামষ্টিক খাওয়া।

১৫। আত্মসমালোচনা।

তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঃ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের তৃতীয় দফা কর্মসূচি হলো ঃ **"ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন,** নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন ও দুস্থ মানবতার সেবা করা।" কেবলমাত্র কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন বা কিছু দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কাজ করলেই পুরাপুরি ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালনের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। সাথে সাথে সামাজিক সংস্কার ও সমাজ সেবামূলক প্রয়োজনীয় কিছু কাজেও হাত দেয়া দরকার।

এর আলোকে এ দফায় তিনটি প্রধান কাজ রয়েছে ঃ ক) সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কার খ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ গ) দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে সমাজ সেবা

ক) সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কার

১। প্রচলিত কুসংস্কার সম্মপর্কে সতর্কীকরণ।

২। ইসলামী আচার অনুষ্ঠান চালুকরণ।

৩। পেশাভিত্তিক কাজ।

৪। গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন।

৫। মসজিদ সংস্কারঃ এতে ২টি সমস্যা প্রধানত দেখা যায়, যেমন- ক) অব্যবস্থাপনা ও খ) অযোগ্য ও দুর্বল লোকদের পরিচালনা।

৬। হাট-বাজার সংস্কার।

৭। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৯। ক্লাব, সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা।

১০। সমাজবিরেধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

খ) অপসংস্কৃতি রোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

এ দফায় ২টি কাজ–

ক) অপসংস্কৃতি রোধ ও

খ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশঃ ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যম-

১) পত্র-পত্রিকা প্রকাশ; ২) ইসলামী গান রচনা ও প্রচলন; ৩) কিরাআত, ইসলামী গানের রেকর্ড; ৪) প্রদর্শনী; ৫) জ্ঞান চর্চার অভ্যাস।

গ) দুস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে সমাজ সেবা

১) দাতব্য চিকিৎসালয়; ২) রোগীর পরিচর্যা; ৩) পরিচ্ছন্নতা অভিযান; ৪) রাস্তাঘাট মেরামত; ৫) অফিস আদালতে কাজের সহযোগিতা; ৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে দাড়ানো; ৭) দুর্দশাগ্রস্ত, বিত্তহীন ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা; ৮) গরীব ছাত্রদের সহযোগিতা দান; ৯) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান; ১০) কর্জে হাসানা; ১১) ভ্রাম্যমান দাতব্য চিকিৎসালয়; ১২) বিয়ে-সাদী; ১৩) পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রেরণ; ১৪) মাইয়েতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণ; ১৫) প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ; ১৬) সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সৃষ্টি।

চতুর্থ দফা কর্মসূচি ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধন

গঠনতন্ত্রের ভাষায় জামায়াতের চতুর্থ দফা কর্মসূচি হলো ঃ "গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও চরিত্রবান লোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সংস্কার বা সরকারের সংশোধনই হচ্ছে এ দফার মূল কাজ। এসব কাজের মাধ্যমেই আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম হবে। নিম্নোক্ত কাজগুলো এ দফার অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। সমাজ বিশ্লেষণ। ২) রাজনৈতিক বিশ্লেষন; ৩) বিবৃতি প্রদান; ৪) স্মারকলিপি পেশ; ৫) দাওয়াতী জনসভা; ৬) পথসভা, গণজমায়েত, মিছিল, জনসভা ও বিক্ষোভ; ৭) প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ; ৮) রাজনৈতিক যোগাযোগ; ৯) সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ ও সাংবাদিক সম্মেলন; ১০) বার লাইব্রেরীতে যোগাযোগ; ১১) ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ; ১২) পত্র-পত্রিকা প্রকাশ; ১৩)

জনমত গঠন; ১৪) নির্বাচন; ১৫) রাজনৈতিক বিভাগ সৃষ্টি; ১৬) যাকাত আদায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি; ১৭) সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের প্রতিবাদ ও সমাধান পেশ।

তাওহিদ সংক্রান্ত সূরা হাশরের শেষ রুকু মুখস্ত (১৮-২৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۹﴾

(১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে করেছেন আত্মভোলা (আল্লাহ কে স্মরন করার কথা মনেই আসে না) । আর তারাই হল ফাসিক।

لَا يَسْتَوِيْۤ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

(২০) জাহান্নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না, জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

(২১) আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহর ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ (গলে গেছে) দেখতে। এ সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা (নিজেদের ব্যাপারে) চিন্তা-ভাবনা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿٢٢﴾

(২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

(২৩) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান।

هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰیؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۲۴﴾

(২৪) তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান।

তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত- (পৃষ্ঠা-১৯),

মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত- **(পৃষ্ঠা-১৯)**।

অনুশীলনী -০৩ ফেব্রুয়ারী-২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - **সূরা তাকাসুর**

দারসুল কোরআন সূরা আত-তাকাসূর:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ : (আল হাকু মুত্তাকাছুর) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে,

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : (হাত্তা ঝুরতুমুল মাক্বাবির) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ : (কাল্লা ছাওফাতা’লামুন) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ : (ছুম্মা কাল্লা ছাওফাতা’লামুন) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ : (কাল্লা লাওতা’লামুনা ই’লমাল ইয়াক্বীন) কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ : (লাতারা উন্নাল যাহীম) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে,

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ : (ছুম্মা লাতারা উন্নাহা আ'ইনাল ইয়াক্বীন) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (ছুম্মা লাতুছ আলুন্না ইউমাইযিন আ'নিন নাই'ম) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

নামকরণ:- নামকরণ বিষয়বস্তু অনুসারে হয়ে থাকে, আবার আয়াতের অংশবিশেষ থেকে ও নেওয়া হয়ে থাকে।

দু'পদ্ধতির মধ্যে এ সুরায় প্রথম আয়াত থেকে সরাসরি নেওয়া হয়েছে।

তাকাসুর শব্দটি আরবি: كثرة থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) তফসীর করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (রহঃ) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।

নাযিল হওয়ার সময় ও স্থান বা শানে নুযূলঃ-

ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার (রাঃ) রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দুটি গোত্রের ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরবগাঁধা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্থানে গিয়ে মৃত লোকদের গৌরবগাঁধা বর্ণনা করে। তাদের এই আচরণের ফলে আল্লাহ এই বাণী নাযিল হয়। কিন্তু শানে নূযুলের জন্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাকে এই সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রাঃ) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ তাতে তিনি বলেছেনঃ "আমরা রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত্‌তাকাসুর সূরাটি নাযিল হয়।"

রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ হাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে। তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।

তথ্যসূত্র

১. কুরতবী
২. তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন (১১ খন্ডের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)।
৩. তাফহীমুল কোরআন।
৪. মাযহারী

- ❖ কুরআন শরীফের ১০২ তম সূরা
- ❖ তাকাসুর
- ❖ পরিসংখ্যান
- ❖ সূরার ক্রম ১০২
- ❖ আয়াতের সংখ্যা ৮
- ❖ পারার ক্রম ৩০
- ❖ রুকুর সংখ্যা ১
- ❖ পূর্ববর্তী সূরা সূরা ক্বারিয়াহ
- ❖ পরবর্তী সূরা সূরা আছর

বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকার আকাংক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না। (আল হাদিস)

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রখ্যাত সাহাবী ইবন আব্বাস (রা) এর মতানুযায়ী সূরা আত তাকাসুর মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষের জীবনের যে সাধারণ লক্ষ্য অর্থাৎ সম্পদ আহরণ তা থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে মুমিনদের জন্য জীবনের যথার্থ লক্ষ্য যা হওয়া উচিৎ যা কিনা আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদত সেদিকে মনোনিবেশ করার। এ সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস রয়েছে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীস অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল (সা) ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলিমদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: *আল্লাহর শপথ! আমি এ ভয় করি না যে তোমরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। (উল্লেখযোগ্য সে সময় আল্লাহর রাসূলের (সা) অধিকাংশ সাহাবীই দরিদ্র ছিলেন) আমি ভয় করি যে তোমাদেরকে দুনিয়াবী সম্পদ দেয়া হবে প্রচুর পরিমাণে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, এবং তোমরা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেমনটি তারা করেছিল, অতঃপর তাদের মত তোমাদেরকেও তা (সঠিক পথ থেকে) দূরে সরিয়ে দেবে।*

তাই মুসলিমদের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) ভয় ছিল এ ব্যাপারে যে, মুসলিমরা পার্থিব ধনসম্পদ লাভ করবে এবং তা তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় বিপথে নিয়ে যাবে।

অপর একটি হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁর সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করলেন

" তোমাদের মধ্যে কেউ কি দৈনিক কুরআনের এক হাজারটি আয়াত তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়?" এবং সাহাবীদের মাঝে একজন বলে উঠলেন: "আমাদের মাঝে কে আছে যে দৈনিক কুরআনের হাজারটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি 'আলহাকুমুত তাকাসুর' তিলাওয়াত করতে সক্ষম নয়?"

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে গভীর চিন্তাভাবনা সহকারে সূরা আত তাকাসুর একবার তিলাওয়াতের (শুধু না বুঝে মুখস্থ বলে

যাওয়া নয়) সওয়াব কুরআনের হাজারটি আয়াত তিলাওয়াতের সওয়াবের সমতুল্য। এ থেকে বোঝা যায় যে কুরআনের প্রায় এক হাজার আয়াতে বিভিন্নভাবে সেই সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো সূরা আত তাকাসুরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে তিনি একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) এর নিকট আসলেন যখন তিনি সূরা আত তাকাসুর তিলাওয়াত করছিলেন, এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: "মানুষ বলেঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিন্তু হে আদম সন্তান, কোন সম্পদই কি তোমার সেটুকু ছাড়া, যতটুকু তুমি খেয়েছ, ব্যবহার করেছ, পরিধান করে নষ্ট করে ফেলেছ, আর যা তুমি সাদকা করেছ এবং এর দ্বারা একে স্থায়িত্ব দিয়েছ?"

মানুষের সব সম্পদ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত, যা মানুষ খরচ করে ফেলে, আর এরপর তা তার আর কোন কাজে আসে না, কিংবা যা সে সাদকা করে, ফলে তা (তার প্রতিদান, অনেকগুণ বর্ধিত আকারে) তার জন্য রয়ে যায় এমনকি মৃত্যুর পরেও।

ব্যখ্যাঃ

আয়াত ১: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ " ভাবার্থ: "সম্পদ আহরণ তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত (গাফিল) করে রাখে।"

- মানুষ তার জীবনের জাগ্রত সময়ের অধিকাংশই ব্যয় করে সম্পদ আহরণে, এই বাস্তবতার মাঝেই আমরা বাস করছি। আমরা যতই আত্মিক উন্নতি লাভ করতে চাই না কেন আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় সম্পদাহরণে। এখানে সম্পদ বলতে শুধু টাকা-পয়সা বোঝানো হয় নি, বরং তা অন্য প্রকারও হতে পারে, যেমন: সন্তান-সন্ততি। কেননা অধিক সন্তান-সন্ততি থাকা মানে সমাজে অধিকতর শক্তিশালী অবস্থান, সমাজে অনেকেই তাদের সন্তান-সন্ততির বড়াই করে থাকে। যদিও বর্তমান যুগে এই ধারণাটি বদলে গেছে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে, যেখানে পশ্চিমে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবার ছোট রাখার পক্ষপাতি, এবং তারা মুসলিমদেরকেও এই ধোঁকায় ফেলছে যে অধিক সন্তান-সন্ততি হলে তাদের ভরণ-পোষণ করা সম্ভব হবে না, ফলে মুসলিমরাও

তাদের বংশবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) উপদেশ দিয়েছেন: “তোমরা বিয়ে কর এবং অধিক সন্তান লাভ কর।” যাহোক সাধারণভাবে ধন-সম্মপদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, এবং মানুষ যথাসম্ভব সম্পদাহরণে সচেষ্ট হয় কেননা তা বিভিন্নভাবে তাদের জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। বর্তমান সমাজের সাধারণ চিত্র হচ্ছে এই যে পরিবারের কর্তা সারাদিন ঘরের বাইরে অবস্থান করবেন, তার কর্মক্ষেত্র থেকে সম্মপদ আহরণের জন্য, আর কর্ত্রী ঘরে অবস্থান করে সেই সম্মপদকে ব্যয় করবেন এবং তিনিও তা জমা করবেন ঘরে সঞ্চিত বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুর আকারে নতুন এটা, নতুন ওটা, বছর বছর ঘরে নতুন পর্দা, নতুন সোফা ইত্যাদি কখনও পরিতৃপ্ত না হয়ে আরও বেশী করে সম্মপদ জমা করতে থাকা। উভয়পক্ষেই চলে এই সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া, পুরুষ ঘরের বাইরে থেকে সম্মপদাহরণে ব্যস্ত, আর নারী ঘরের ভেতর বিভিন্ন ভোগ্য পণ্যের আকারে সেই সম্মপদকে জমা করতে সক্রিয়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে আমাদেরকে সাবধান করছেন:

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“আর জেনে রাখ, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা বৈ নয়, আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার (যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য)।” (সূরা আল আনফাল, ২৮)

আল্লাহ এখানে আমাদের সামনে সম্মপদ এবং সন্তানের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন, এ সবই আমাদের জন্য পরীক্ষা, এগুলোর সাহায্যে আমাদেরকে শুধুই পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা পৃথিবীতে এসেছি এগুলো না নিয়ে, আবার পৃথিবী থেকে বিদায়ও নেব এগুলো না নিয়েই। সুতরাং ধন-সম্মপদ এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি আমাদের বাসনা যেন আমাদেরকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারে ‍ এ কথা জানা যে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব ‍হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ইবাদত, এবং এর দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। আল্লাহ পাক পুনরায় সূরা আল মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

" হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না করে, এবং যারা এমনটি করবে (সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দ্বারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হবে), তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল মুনাফিকুন : ৯)

যারা সম্পদাহরণ ও সন্তানের প্রতি তাদের বাসনার কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হল, তারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলল।

আল্লাহ পাক বলেন:

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...।" (সূরা আল আসর, ১-৩)

অর্থাৎ তারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না যারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আমরা যদি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধারাকে হারিয়ে ফেলি এবং আল্লাহকে স্মরণ না করি, তার অর্থ হচ্ছে শয়তান আমাদেরকে কব্জা করে ফেলেছে এবং আমরা শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছি, আমাদের নিজেদের কামনা-বাসনার দাসে পরিণত হয়েছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا **"তুমি কি তাকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার দেবতা বানিয়েছে?" (সূরা আল ফুরকান ৪৩)**

এটা এমন অবস্থা যখন একজন মানুষ তার বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, প্রাচুর্যের বাসনা তার ইলাহতে পরিণত হয়। আর সম্পদের প্রতি এই বাসনা অনির্বাণ, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণের একটি উপত্যকা দেয়া হয়, সে আরেকটি চাইবে। শুধুমাত্র যে জিনিসটি তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে, তা হল তার কবরের মাটি।" এই কবরের মাটিই কেবল তাকে নিরস্ত করতে পারে, এর পূর্ব পর্যন্ত সে যতই পাবে, ততই সে চাইতে থাকবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন "দীনার এবং দিরহামের দাস সবর্দাই দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে।" তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন, আমরা যেন এমনটি হতে না দেই। যদিও আমাদের চারপাশে আমরা তাদেরকে দেখতে পারব যারা ঐশ্বর্যে আমাদের থেকে সমৃদ্ধশালী। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টত: জানিয়ে দিচ্ছেন:

وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ

আল্লাহ তা'আলা জীবনোপকরণে "আল্লাহ তোমাদের মাঝে কতককে রিযিকের ব্যাপারে কতকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।" (সূরা আন নাহল ৭১)

এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন কোন মানুষ অন্যদের থেকে অধিক লাভ করবে। এবং তিনি আমাদেরকে আরও বলেছেন:

ও " তোমরা সে জিনিসের কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা আন নিসা, ৩২)

কেন নয়? কারণ এই প্রাধান্য দেয়া একটি পরীক্ষা। তিনি কাউকে তোমার চেয়ে বেশী দিয়েছেন, তিনি যদি তোমাকে তা দেন যা অন্যকে দিয়েছেন, তবে তা তোমার জন্য মাত্রাতিরিক্ত হবে (তুমি সীমা লংঘন করবে), তিনি ততটুকুই তোমাকে দিয়েছেন যতটুকু তোমার জন্য ভাল। তিনি সবাইকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক বন্টন করেছেন, এবং আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ **"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার যোগ্যতার অতিরিক্ত দায়িত্ব`দেন না।"** (সূরা বাক্বারাহ, ২৮৬)

সুতরাং প্রত্যেকেই ততটুকু পাবে যতটুকু তার জন্য যথার্থ। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "যারা তোমার ওপরে অবস্থান করছে, তাদের দিকে তাকিও না, তাদের দিকে তাকাও যারা তোমার নীচে রয়েছে।" কেননা কেউ যদি তার চেয়ে হতভাগ্যদের দিকে তাকায়, তখন সে তার নিজের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ দেখতে পাবে এবং কৃতজ্ঞ হবে। কিন্তু কেউ যদি সবসময় তার চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবানদেরকে লক্ষ্য করে, তাহলে তার মনে হবে "আমি কেন বঞ্চিত হলাম?" এ অবস্থায় মানুষ কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, সে সর্বদা বিচলিত, হতাশ, চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকে অধিক আহরণের জন্য। এমনকি সম্পদ হাতে আসার পরও এমন লোক ভীত থাকে যে কখন আবার তা নিঃশেষ হয়ে যায়, সে চারপাশের মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, এই বুঝি কেউ তার সম্পদ হ্রাস করতে এল। কাউকে যদি সে তার সাথে হাসিমুখে কথা বলতে দেখে, তবে সে ধারণা করে, এ বোধহয় আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে। এভাবে তারা জীবনের খুব সরল বিষয়গুলো থেকে সহজতম আনন্দও নিতে পারে না। সবকিছুই তাদের কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের অন্তর কখনই স্থিতি লাভ করতে পারে না, কেননা তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ " কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

তাই যদি আমরা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাই, তবে আমরা কিছুতেই অন্তরে প্রশান্তি ও বিশ্রাম লাভ করতে পারব না। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "তাদের সম্পদ এবং সন্তানুসন্ততি যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে..." (সূরা আত তাওবা ৫৫)

এখানে কাফির, পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের অর্জন যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে। কেননা "...**আল্লাহর পরিকল্পনা হচ্ছে তাদেরকে দুনিয়ার**

এসমস্ত জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া, যেন তাদের জান এ অবস্থায় কবয করা হয় যে তারা অবিশ্বাসী।" (সূরা আত তাওবা, ৫৫)

কেননা তারা যখন সীমা-লংঘন করা সত্ত্বেও আরও বেশী করে সম্পদ লাভ করে, তখন তারা উৎফুল্ল হয় এই ভেবে যে আমরা খুব ভাল-ভাল কাজই করছি, সবই ঠিকমত চলছে, তখন তাদের সীমা-লংঘন আরও বেড়ে যায়, কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য শাস্তি, কেননা আরও বেশী সম্মপদ লাভ করার কারণে তারা কখনও তাদের ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করবে না, কারণ যখন সম্মপদের ক্ষতি হয়, তখন একজন মানুষ এ চিন্তা করার অবকাশ পায়, যে তার হয়ত এভাবে সম্মপদের পেছনে ছোটা উচিৎ নয়, বিশেষতঃ যখন তা এত সহজেই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাকে যদি আল্লাহ দিতেই থাকেন, তবে কখনও সে ফিরে আসবে না এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মাঝে তোমাদের জন্য শত্রু" রয়েছে, অতঃপর তাদের সম্মপর্কে সতর্ক হও।"

এখানে তাদেরকে সাধারণভাবে শত্রু " বলা হয়নি, কিন্তু আমরা যদি তাদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হই যেভাবে আল্লাহ চান, তবে তারা আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়। যেমন কারও স্ত্রী যদি সাজসজ্জা করে এবং সুগন্ধী মেখে বেড়াতে যেতে চায়, অথচ সে ব্যক্তি জানে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: " যে মহিলা সুগন্ধী ছড়িয়ে বাইরে যায়, সে একজন যিনাকারী, যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কারণে তাকে বাধা দিতে চায় না এবং এভাবে তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়, এ অবস্থায় এই স্ত্রী তার শত্রুতে পরিণত হয়, কারণ এই স্ত্রী তাকে আল্লাহর আদেশ পালন থেকে বিরত রেখে আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত করে তুলল। কারণ এ কাজের জন্য এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, রাসূল (সা) বলেন: " তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, এবং প্রত্যেককে সে যার রাখাল (অর্থাৎ যারা বা যা কিছু তার ক্ষমতাধীন ও অধীনস্থ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই স্ত্রী তার পাপের জন্য শাস্তির যোগ্য, এবং এই স্বামী তার অধীনে তার স্ত্রীকে এ কাজ করতে দেয়ার জন্য শাস্তির যোগ্য, এভাবে তার স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে তার শত্র“তে পরিণত হল। একইভাবে ধরা যাক সন্তানরা তাদের জন্মদিন করতে চাচ্ছে, এবং তারা তাদের বাবার মন গলানোর জন্য বলছে, যে আমার বন্ধুদের জন্মদিন হয়, অমুকের জন্মদিন হয়, আমি কেন করতে পারব না, অথচ আপনি জানেন **যে জন্মদিন পালন** করা ইসলামে নিষিদ্ধ কেননা এই অনুষ্ঠানের মূল প্রোথিত পৌত্তলিকতায়। আপনি যদি স্নেহপরবশ হয়ে আপনার সন্তানদেরকে জন্মদিন পালন করার অনুমতি দেন, তাহলে এই সন্তানরা আপনার শত্রুতে পরিণত হল কেননা আপনাকে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করে দিল। এখানে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থাটি তৈরী হয়েছে, তা হল আপনার স্ত্রী-সন্তানের প্রতি আপনার ভালবাসা আল্লাহর প্রতি আপনার ভালবাসাকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে আপনি ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করতে শুরু করেছেন। তাওহীদের দাবী এটাই যে আমরা কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কোন আদেশ অমান্য করব না।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ২: “ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ” অর্থ: “যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।”

অর্থাৎ বিভিন্নভাবে সম্পদ আহরণের পেছনে সাধনা তোমাদেরকে ব্যস্ত রাখে একেবারে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। সূরা আনআমের ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন:

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

“অতএব যখন তারা সতর্কবাণী ভুলে গেল, যার দ্বারা তাদেরকে স্মরণ করানো হয়েছিল, আমরা তাদের জন্য প্রতিটি (উপভোগ্য) বস্তুর দরজা খুলে দিলাম, যতক্ষণ না তারা এই ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়ল এবং হঠাৎ এর মাঝে আমি তাদেরকে ছিনিয়ে নিলাম (মৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে শাস্তিতে নিক্ষেপ করলাম)...” (সূরা আল আনআম, ৪৪)

তাদের এই পরিণতি এজন্য যে তারা সম্পদের দ্বারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার উপদেশকে ভুলে গিয়ে শয়তানের কজার মধ্যে চলে যায়, এবং আল্লাহ তাদেরকে যাবতীয় পার্থিব সম্পদ দান করতে থাকেন, এবং তাদের এই ভোগ-বিলাসের মধ্যস্থলে হঠাৎ তাদের জান কবয করা হয় এ অবস্থায় যে তারা কাফির। এভাবে যখন মৃত্যু আমাদেরকে স্পর্শ করে, আমরা উপলব্ধি করি যে, জীবিত অবস্থায় এ সবকিছুই ছিল আমাদের জন্য পরীক্ষামাত্র। এই জীবনে মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় কেননা এখানে আমরা যা করছি, তার পরিণতি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এই পরিণতি আমরা কেবল জানতে পারি ওহীর মাধ্যমে। দৃশ্যত আমাদের মগ্ন হয় যে একজন লোক ভাল কাজ করেও খারাপ পরিণতি বরণ করছে, অথচ অপর একজন খারাপ কাজ করেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করছে, বহু বড় বড় পাপাচারীকে দেখা যায় সম্মপদ এবং সম্মানের স্তুপের ওপর অধিষ্ঠিত অবস্থায়। তাই কাজের পরিণতি আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট নয়। কেবল আল্লাহর নবীরাই আমাদেরকে কাজের প্রকৃত পরিণতি সম্মপর্কে অবহিত করেন যে, চূড়ান্ত পরিণতিতে আমাদের সবার কাজের হিসাব নেয়া হবে, এবং এ পৃথিবীতে সেটা না হলেও পরবর্তী জীবনে অবশ্যই তা হবে। তাই আল্লাহ যখন আমাদের এই সংবাদ দিচ্ছেন যে মানুষ তাদের সম্মপদাহরণের প্রচেষ্টার জালে আটকে পড়ে থাকে মৃত্যুমুখে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত, তিনি আমাদেরকে এই উপদেশই দিচ্ছেন যে আমরা যেন সেই রাস্তায় না যাই। আমরা যেন এই অবস্থায় আটকে পড়ার আগেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা নিসার ১৮ নং আয়াতে বলেন:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٨)

আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। অতএব তার তাওবাহ কোনন কাজজে

আসবে না, তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা আন নিসা, ৪ : ১৮)

যদি মৃত্যুযন্ত্রণা একবার শুরু হয়ে যায়, এ অবস্থায় তওবা কবুল করা হবে না, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাস্তব কথা হচ্ছে আমরা জানি না যে মৃত্যু কখন হাজির হবে, এটা যেকোন মুহূর্তে হতে পারে। যদি আমরা সত্যিই না জানি যে মৃত্যু কখন আসবে আমরা কি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকার সাহস দেখাতে পারি? নিশ্চয়ই নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: *"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা কবুল করবেন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।"*

যে অবস্থায় একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হয়ে যায় যে তার মৃত্যু উপস্থিত, এ অবস্থায় তার তওবা কবুল হবে না, আর আমরা কেউই জানিনা কখন আমার সে অবস্থাটি চলে আসবে। আমরা যদি জীবনের কোন এক সময় **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** শিখে থাকি, *আর মৃত্যুর সময় যদি শিয়রে বহু লোক বসে এই কলেমা পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তবুও একজন মৃত্যুপথযাত্রী এটা উচ্চারণ করতে পারবে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এই নিশ্চয়তা লাভের একটিই উপায়, এখন থেকেই নিজের জন্য নেক কাজের জীবন বেছে নেয়া, সৎকর্মের পথে চলার জন্য এখনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ যেসব কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সেগুলো করতে চেষ্টা করা, এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কাজ পরিহার করতে সচেষ্ট হওয়া।*

কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"এবং নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কোন আত্মাকে অবকাশ দেন না, এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল মুনাফিকুন, ১১)

আমাদের সকলের মৃত্যুর ক্ষণটি নির্ধারিত হয়ে আছে, আমরা একে এগোতেও পারব না, পিছাতেও পারব না, এটা নির্ধারিত, তবে কখন, তা আমাদের জানা নেই। এজন্য, মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে ‐ এ বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এর মানে এই নয় যে সবসময় মৃত্যুর ভয়ে দরজা আটকে ঘরে বসে থাকতে হবে, কেননা আল্লাহ পাক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে মৃত্যু যথাসময়ে উপস্থিত হবেই, যদিও বা কেউ সুউচ্চ টাওয়ারে তার বিছানায় অবস্থান করে, তাহলেও মৃত্যু নির্ধারিত সময় হলে তার কাছে পৌঁছে যাবেই। তাই আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে, কিন্তু এ সম্মপর্কে সচেতন থাকতে হবে যে যেকোন সময়ে আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম: "***...যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।***" কোন কোন পণ্ডিত এর ব্যাখ্যা এটা নিয়েছেন যে কিছু মানুষ তাদের কবরকে পর্যন্ত বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের প্রতীকে পরিণত করে থাকে কবরের ওপর বিশাল সৌধ নির্মাণ করে ও এ নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে। কেউ কেউ তাদের পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে বড়াই করে যে কত সৌখিনভাবে একে সাজানো হয়েছে! এদের কাছে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই, এরা মনে করে সম্পদ তাদেরকে চিরস্থায়ী করবে। আর তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্যের একটি হচ্ছে তাজমহল। তাজমহলের বর্ণনায় দেখা যায় বাগাড়ম্বর এবং আবেগের প্রাচুর্য, সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! এটা এমন ভালবাসা যা আপাদমস্তক আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে আদেশ দিয়েছিলেন যে ***এক হাতের চেয়ে উঁচু কোন কবর পেলে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে।*** এই ধরনের কাঠামো ইসলামে হারাম। অথচ একে মুসলিম স্থাপত্য এবং মুসলিমদের কীর্তির নিদর্শন বলে প্রচার করা হয়! কখনও নয়। বরং এটা মুসলিমদের অধঃপতন এবং মূর্খতার জলজ্যান্ত প্রতীক, সীমাহীন অজ্ঞতার পরিচয়! তারা কিভাবে এমন বিলাসবহুল একটি সৌধ নির্মাণ করতে পারল যা কিনা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনবে!

তেমনি উল্লেখ করা যায় *<u>পাকিস্তানে জিন্নাহর কবরস্থানের কথা</u>*, যেখানে সুবিশাল সৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ পাকিস্তান শব্দের অর্থ: পবিত্র ভূমি, কিংবা পবিত্রদের ভূমি! এবং আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশেই এরূপ নমুনা পাওয়া যাবে, এমনকি আমাদের বাপ-দাদাদের কবরেও কোন না কোন ধরণের কাঠামো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, তা ফলক, কিংবা ফুলের তোড়া কিংবা সাদা রং করা কবর ্ যে রূপেই হোক না কেন এ সবই পৌত্তলিকদের রীতির অনুসরণ, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কবরকে এর চারপাশের জমি থেকে মোটেই ভিন্ন দেখানো উচিৎ নয়।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৩: " كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ " অর্থ: "কিন্তু শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"

অর্থাৎ সত্য হচ্ছে এই যে মৃত্যু অতি নিকটে, এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতা তোমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতা থেকেও তার অধিক নিকটবর্তী, এবং জাহান্নামও।"

তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছ। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। অবশ্যই অতি শীঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [ইবন কাসীর, আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৪: " ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ " অর্থ: "এবং অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।"

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একই কথা পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে এ ব্যাপারটিকে জোর দিচ্ছেন যে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারার এই মুহূর্তটি অতি অতি নিকটে! যেমন আমরাও কোন কিছু জোর দিয়ে বলতে চাইলে দুবার বলে থাকি। কুরআনে কোন কোন আয়াত এভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে

বিশেষ জোর দেয়ার জন্য। কখনও কোন অতীব গুরুত্বহ বক্তব্য বহনকারী আয়াতকে বিভিন্ন সূরায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কখনও একই সূরার শুরুতে এবং শেষে আনা হয়েছে, কখনও পর পর আনা হয়েছে। মৃত্যুর ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একবার কেউ কবরে শায়িত হয়ে গেলে তার বাকি জীবন কেবলই একের পর এক সত্যের উন্মোচন। তার কবর হয় জান্নাতের একটি বাগান, কিংবা একটি আগুনের বিছানা! আমাদের মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই আমাদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৫: " كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ "

অর্থ: "যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে!"

যদি আমরা সত্যিই জানতাম এই পার্থিব জীবনের প্রকৃত রূপ, তাহলে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করছি, সেভাবে জীবন যাপন করতাম না, আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে যেত। কিন্তু আমাদের যদি এই নিশ্চিত জ্ঞান থাকত, তাহলে এই জীবন পরীক্ষার বিষয় হত না, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইচ্ছা করেই আমাদেরকে সেই জ্ঞান দান করেন নি। এই জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে ওহীর মাধ্যমে যা ধর্মগ্রন্থে এসেছে, এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আমরা নবীদেরকে বিশ্বাস করতে পারি, নাও করতে পারি, ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করতে পারি বা অবিশ্বাস করতে পারি। যদি মুমিনদেরকে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়া হত, তবে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হত না, তারা ফেরেশতায় পরিণত হত। কিন্তু আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করতে চান, আর এ জীবন আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এক পরীক্ষা মাত্র, আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, আমরা এই পরীক্ষা ক্ষেত্রেই অবস্থান করছি, আর এই পরীক্ষা চলছে প্রতিনিয়ত।

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: ***"আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা অল্পই হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।"*** কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতি তা নাযিল করেছেন, যা তিনি আমাদের প্রতি করেননি, যেহেতু তাঁকে এই বাণী বহন করার গুরুদায়িত্ব পালন

করতে হয়েছে, যা করার কারণে তিনি সে সময়ের মুশরিকদের শত্রুতার বোঝা কাঁধে নিয়েছেন, যারা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করার, ঘর থেকে বের করে দেয়ার এবং ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে আত্মিক শক্তি দান করার জন্য এমন কিছু বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁকে দিয়েছেন যা আমাদেরকে দেন নি যেন তিনি এই জীবনের বাস্তব রূপ উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য এই হাদীসের মানে এই নয় যে আমাদেরকে সবসময় বিমর্ষ থাকতে হবে এবং ভুরু কুঁচকে হাঁটাচলা করতে হবে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও হাসতেন, এমনকি তিনি কখনও কৌতুকও করতেন। কিন্তু এটা তার অভ্যাস ছিল না। যেমন কিছু মানুষ আছে প্রতি কথার সাথেই হাসতে থাকে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর, যারা প্রতিটি বিষয়েই কৌতুক বোধ করে, তাদের নিকট গোটা জীবনটাই একটা বিরাট কৌতুকে পরিণত হয়, ফলে জীবনের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার ব্যাপারে যে সচেতনতা থাকা দরকার তা তারা হারিয়ে ফেলে।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৬: " لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ " অর্থ: "তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে।"

আমরা প্রত্যেকেই জাহান্নামের আগুন প্রত্যক্ষ করব, এই জীবনে নয়, মৃত্যুর পরের জীবনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা মারইয়ামে উল্লেখ করছেন:

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

"তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যাকে এর (জাহান্নামের আগুনের) নিকটে আনা হবে না..." (সূরা মারইয়াম, ৭১)

বুখারী শরীফের হাদীসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন *"কাউকে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামে তার স্থানটি দেখানো হয়, যেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হত যদি সে অবিশ্বাস করত, যেন সে অধিকতর কৃতজ্ঞ হয়। তেমনি কাউকে ততক্ষণ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না, যতক্ষণ না তাকে জান্নাতের ঐ স্থানটি দেখানো হয়, যা*

সে বিশ্বাসী হলে লাভ করতে পারত, যেন সে অধিকতর শোকাচ্ছন্ন ও বিমর্ষ হয়।"

অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি সেতু স্থাপন করা হবে। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সেতুটি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: এটি পিচ্ছিল এবং এতে সাঁড়াশি রয়েছে। বিশ্বাসীদের মধ্যে একদল চোখের পলকে তা পার হয়ে যাবে। অন্যদল বিদ্যুত গতিতে পার হবে। কেউ ঝড়ো বাতাসের গতিতে। কেউ দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে, কেউ উটের গতিতে। কেউ কোন ক্ষতি ছাড়াই এটা পার হবে। অন্যদের কিছু আঁচড় লাগবে। আর কেউ কেউ জাহান্নামে পড়ে যাবে। শেষ যে ব্যক্তি এই সেতু অতিক্রম করবে, সে এমনভাবে এটা পার হবে যেন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এর নাম পুলসীরাত।

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৭: "ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ" অর্থ:
"অতঃপর নিশ্চয়ই তোমরা একে (জাহান্নাম) স্বচক্ষে দেখবে।"
মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমরা একে স্বচক্ষে দেখতে পারব, এ জীবনে আমরা একে দেখতে পাই নবীদের (আ) বর্ণনায় অংকিত চিত্রানুযায়ী। তাঁরা কিতাব ও ওহী অনুযায়ী জাহান্নামের বর্ণনা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমরা একে নিশ্চিতভাবে দেখব: ***"আইনুল ইয়াকীন"।***

রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাখ্যা করেছেন, *মুমিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন দেখবে, তারা তা দেখে উৎফুল্ল হবে, কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ থেকে বাঁচিয়েছেন, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের এ দৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কষ্ট বৃদ্ধি করা, এ দৃশ্য দেখে তারা চরম দুঃখ, ক্ষোভ (নিজেদের মূর্খতার কারণে), হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, একথা উপলব্ধি করে যে তাদেরকে এখানে থাকতে হবে চিরকাল!*

উপরে বলা হয়েছে (الْيَقِين) এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খবর কোনদিন চাক্ষুষ দেখার মত নয়। মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তূর পর্বতেই তাকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী-ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল; তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭১]

সূরা আত তাকাসুর, আয়াত ৮: “ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ”

অর্থ: “অতঃপর সেদিন তোমরা অবশ্যই (পার্থিব) আনন্দ-উপভোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এই পৃথিবীতে আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তা সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হব। কেননা যেমনটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে, এই জীবনে আল্লাহ পাক আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার সবই পরীক্ষা। আমাদের সম্পদ পরীক্ষার বিষয়, আমরা রিক্ত হস্তে পৃথিবীতে এসেছি এবং কপর্দকহীন অবস্থায় এখান থেকে বিদায় নেব। এই সম্পদ পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে আমানত হিসেবে। যদি আমরা একে আল্লাহর পছন্দনীয় পথে ব্যয় করি, তাহলে এর কল্যাণ আমাদের সাথে রয়ে যাবে, যদি আমরা একে অন্যায় পথে ব্যয় করি, তবে এর পাপ আমাদেরকে গ্রাস করতে আসবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন তিনটি জিনিস *“একজন মৃত ব্যক্তিকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে, দুটি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়। তার আত্মীয়, তার সম্পদ*

এবং তার আমল তাকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে, তার আত্মীয় এবং সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, দুটি নিয়ামত রয়েছে যা সম্পর্কে মানুষ প্রতারিত হয়, সুস্বাস্থ্য এবং অবসর। মানুষ এর দ্বারা প্রতারিত হয় এই ভেবে যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ দুটি অনুগ্রহ আমাদের সাথে সর্বদা থাকবে। কিন্তু আমরা সহজেই এগুলো হারাতে পারি, এবং যখন আমরা দুর্বল কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ি, আমাদের অবসর সময় শেষ হয়ে আসে, তখন আমরা ইচ্ছা থাকলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করতে পারি না, এবং তখন আমাদের আপসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন **"ফা ইযা ফারগতা, ফানসাব।"** ভাবার্থ: "যখন তুমি (নিয়মিত ইবাদতের) ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হও, অন্য ইবাদতে লেগে যাও।" (সূরা ইনশিরাহ, ৭)
আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের এক অবিরাম প্রক্রিয়া।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"...নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন মরণ, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"(সূরা আল আনআম, ১৬২)
আমাদের গোটা জীবনই আল্লাহর জন্য হতে হবে, এই পার্থিব জীবনে আমাদের কোন ছুটি নেই। সৎকর্ম থেকে কিংবা ইসলাম থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ছুটি নিতে পারব না। ইসলাম শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা খাদ্যগ্রহণের মতই এক অবিরাম প্রক্রিয়া, এ থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকার উপায় নেই, ইসলাম যেন আমাদের একটি অংশ। আমরা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া একটি মুহূর্তও টিকতে পারি না, তেমনি একজন বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণের অবস্থা ছাড়া একটি মুহূর্ত থাকতে পারে না। যদি আমরা ইসলাম থেকে সাময়িক ছুটি নেই, তবে বুঝতে হবে আমার ইসলাম নিছক কিছু আচার অনুষ্ঠান, প্রকৃত ইসলাম নয়।

যেমন আমাদের সমাজে দেখা যায় **“রামাদান মুসলিম”** , যারা কেবল রামাদান মাসে নামায পড়ে, অন্যদের চেয়ে বেশী পরিমাণেই পড়ে, কিন্তু রামাদান শেষ হলে সে এগার মাসের জন্য ইসলাম থেকে ছুটি নেয়, সে মনে করে যে পরবর্তী রামাদানে সে তার সমস্ত ইবাদত পূর্ণ করে নেবে, প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলাম নয়।

আরও দেখা যায় **“জুম’আ বারের মুসলিম** ”, যে কোন নামায পড়ে না, কেবল জুমআর নামাযে হাজির হয়, সপ্তাহের বাকী সময় সে ইসলাম থেকে ছুটি কাটায়। এধরনের লোকেরা ভীষণ ক্ষতি ও ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। এমন জুম’আর নামায আল্লাহর নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা যদি আমাদের জীবনে নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে হঠাৎ করে একদিন কিংবা বছরে একটি মাস আমাদের পক্ষে কিছুতেই একনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সালাতকে আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশের মত প্রতিষ্ঠা করা চাই, এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকে ‘নামায পড়’ এ আদেশ দেননি, তিনি আদেশ দিয়েছেন ‘সালাত প্রতিষ্ঠা কর।’ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জীবনের মৌলিক কাঠামো।

তাই আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদেরকে এ কথাগুলো চিন্তা করতে হবে। কুরআনের ১০২ নং সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকে আহবান জানিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করার। মুমিন হিসেবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ইবাদত করা। আল্লাহ পাক বলেন:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

“আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।”(সূরা আয যারিয়াত, ৫৬)

অর্থাৎ তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্-প্রদত্ত নেয়ামত সম্মপর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না, সেগুলোতে আল্লাহ্র হক আদায় করেছ কি না; নাকি পাপ কাজে ব্যয় করেছ? [সা’দী]

এতে সকল প্রকার নেয়ামত এসে যায়। কুরআন ও হাদীসের অন্যত্র এরকম কিছু নেয়ামতের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে,

وَ لَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَ الۡبَصَرَ وَ الۡفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنۡہُ مَسۡـُٔوۡلًا ﴿۳۶﴾

“আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।” [সূরা আল-ইসরা:৩৬]

এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাদীসেও নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ***“দু’টি নেয়ামত এমন আছে যাতে অধিকাংশ মানুষই ঠক খায়। তার একটি হলো, স্বাস্থ্য অপরটি হচ্ছে অবসর সময়।” [বুখারী: ৬৪১২]***

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধায় কাতর হয়ে বের হলেন, পথে আবুবকর ও উমরও বের হলেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বের হয়েছ? তারা বলল, ক্ষুধা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার নফস তার শপথ, আমিও সেকারণেই বের হয়েছি। তারপর তিনি বললেন, চল। তারা সবাই এক আনসারীর বাড়ীতে আগমন করলেন। আনসারী লোকটির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গিদ্বয়কে দেখে যার-পর-নাই খুশী হয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানোর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী জানালো যে, সে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে গেছে। ইত্যবসরে আনসারী লোকটি এসে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আজি কেউ আমার মত মেহমান পাবে না। তারা বসলে তিনি তাদের জন্য এক কাঁদি খেজুর নিয়ে আসলেন

যাতে কাঁচা-পাকা, আধাপাকা, ভাল-মন্দ সবধরণের খেজুর ছিল। তারপর আনসারী লোকটি ছুরি নিয়ে দৌড়াল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান! দুধ দেয় এমন ছাগল যবাই করো না। আনসারী তাদের জন্য যবাই করলে তারা ছাগলের গোস্ত খেল, খেজুর গ্রহণ করল, পানি পান করল। তারপর যখন তৃপ্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন, "তোমরা কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নেয়ামত সম্মপর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদেরকে ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করল, তারপর তোমরা এমন নেয়ামত ভোগ করার পর ফিরে গেলে"। **[মুসলিমঃ ২০৩৮]**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? এটা তো শুধু (আসওয়াদান বা দুই কালো জিনিস) খেজুর ও পানি। রাসূল বললেন, "অবশ্যই তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [তিরমিয়ীঃ ৫/৪৪৮, ইবনে মাজাহ:৪১৫৮, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম যে নেয়ামত সম্মপর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে, আমি কি তোমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইনি?" [তিরমিয়ীঃ ৩৩৫৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আদম সন্তান! তোমাকে ঘোড়া ও উটে বহন করিয়েছি, তোমাকে স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোমাকে ঘুরাফিরা ও নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছি, এগুলোর কৃতজ্ঞতা কোথায়?" [মুসলিমঃ ২৯৬৮, মুসনাদে আহমাদ; ২/৪৯২]

এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদের কে করা হবে না, সৎ মুমিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ্ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংখ্যাহীন। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৪] [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, আত-তাফসীরুস সহীহ]

কুরআনের এই আয়াতে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তাই আমাদের এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। সেইসাথে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইবাদত এ কারণে নয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন রয়েছে, বরং তাঁকে আমাদের ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই। আমাদের ইবাদত করতে হবে সেই অবস্থান অর্জনের জন্য, যে অবস্থানে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জান্নাতে কেবল এই অবস্থানে উন্নীত ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছেন, লোকদেরকে জানিয়ে দাও, কেবল প্রকৃত বিশ্বাসীরাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। তাই আসুন আমরা জীবন নিয়ে চিন্তা করি, জীবন নিয়ে আমাদের পরিতৃপ্তির অভাবের কারণ নিয়ে চিন্তা করি, এই অতৃপ্তির উৎস কোথায়? এর উৎস হচ্ছে জীবনের সঠিক লক্ষ্যের ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া। শয়তান আমাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে জীবনের বিভিন্ন আকর্ষণের ফাঁদে আটকে ফেলেছে, এগুলো হয়ত আমাদের পার্থিব জীবনকে কিছুটা আনন্দদায়ক করবে, কিন্তু এগুলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, আর এ অবস্থাতেই আমাদের স্ত্রী-সন্তানেরা পর্যন্ত আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়, আমাদের অজান্তেই।

শিক্ষা:-

১: এমন বিষয় সম্মপর্কে জ্ঞাত থাকা, যে বিষয় সমূহ মানুষকে হিসাবের দিন কে ভুলিয়ে রাখে।

২:বেশি বেশি কবর জিয়ারত করা,জিয়ারত মানুষ কে সে দিনের কথা সরণ করিয়ে দেয় যে একদিন নিজের চির স্থায়ী ঠিকানা হবে এ কবর।

৩: জাহান্নাম থেকে রক্ষা চাওয়া, যেন এক সেকেন্ডের জন্য ও জাহান্নামের ধারে কাছে যেতে না হয়।

৪: আমার উপর অর্পিত নিয়ামত যেন আল্লাহর সরণে সপনে রক্ষনা বেক্ষন করতে পারি তার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া।

৫: সে সময়ের জন্য দোয়া করা যে সময় এ পৃথীতে বিচরন করবে আমাদের উত্তরসূরী,তারা যেন আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে আল্লাহ কবুল করেন।

বই: ইসলামী আন্দোলন " সাফল্যের শর্তাবলী"

সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী, অনুবাদক: আব্দুল মান্নান তালিব

প্রকাশকের কথা:

১. এই পৃথিবীর বুকে মানুষের কোন উদ্দেশ্য, আন্দোলন, সংস্কামূলক কোন পদক্ষেপ সফল হতে হলে সে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সে আন্দোলনের বিশেষ গুণগুলো দেখা যায়।

২. সমস্যা সঙ্কুল এই দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উত্তম পথ নেই।

৩. এ আন্দোলন তার কর্মীদের কাছে আশা করে অধিক কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ আর কুরবাণী। দাবী করে বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্টের।

ভুমিকা:

*** সমস্যাঃ**

১. জাতির মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আকাঙ্খিত লোকের অভাব নেই। অভাব হলো আগ্রহ ও উদ্যোগের, তার চেয়ে বেশী অভাব যোগ্যতার।

২. জাতি সমগ্র প্রভাবশালী অংশ সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গণ সৃষ্টিতে মুখর। আর যারা সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গণের কাজে লিপ্ত নেই তারাও সৃষ্টি বিন্যাসের চিন্তামুক্ত।

৩. বর্তমান যুগে সমাজ জীবন পরিগঠন ও ভাঙ্গার বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে সরকার।

*** সম্ভাবনাঃ**

১. জাতি সামগ্রিকভাবে অসৎপ্রবন নয়।

২. বিচক্ষনতার সাথে সুসংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠা চালালে জনমত একদিন সত্যের পথে আসবেই।

৩. বিকৃতির কাজে লিপ্ত বাতিলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির অভাব। এক- চারিত্রিক শক্তি, দুই- ঐক্যের শক্তি।

শিক্ষনীয়ঃ

১. দ্বীনপ্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহর কাজ । এ জন্য শর্ত হল ধৈর্য্য, আন্তরিকতা এবং বুদ্ধি বিচক্ষনতা দিয়ে সামনে আগানো।

২. আল্লাহরপ্রদত্ত নীতির অনুসরন।

৩. সাময়িক আবেগ দিয়ে নয় সুস্থ্ মস্তিষ্কে, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বইটির মূল অংশ পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ

১. ব্যক্তিগত গুণাবলী- ক. ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। খ. ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। গ. চরিত্র ও কর্ম। ঘ. দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য।

২. দলীয় গুণাবলী- ক. ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা। খ.পারস্পরিক পরামর্শ। সংগঠন ও শৃংখলা। ঘ. সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

৩. পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী- ক. খোদার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা। খ.আখেরাতের চিন্তা। গ. চরিত্র মাধুর্য। ঘ. ধৈর্য্য। ও ঙ. প্রজ্ঞা।

চরিত্র ও মাধুর্যের কতিপয় বিষয়াবলীঃ

১. উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মত।

২. সৃষ্টিরপ্রতি সহানুভুতিশীল ও মানবতার দরদী।

৩. ভদ্র ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন।

৪. আত্মনিভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু।

৫. মিষ্টভাষী ও সদালাপী।

৬. তাদের দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা ও কেউ করবে না বরং তাদের থেকে কল্যান কামনা করবে।

৭. নিজেদেও প্রাপ্যের চেয়ে কমের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অপরকে বেশী দিতে প্রস্তুত থাকবে।

৮. মন্দের জবাব ভাল দিয়ে দেবে।

৯. নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলীর কদর করবে।

১০. অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেয়ার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে।

১১. অন্যের দোষ-ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে এবং নিজের জন্য কারোর উপর প্রতিশোধ নেবে না।

১২. অন্যের সেবা গ্রহন করে নয় ,অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে।

১৩. নিজের স্বার্থে নয় , অন্যের ভালোর জন্য কাজ করবে।

১৪. কোন প্রশংসার অপেক্ষা না করে , কোন নিন্দার তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করবে।

১৫. খোদা ছাড়া আর কারোর পুরষ্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।

১৬. তাদেরকে বল প্রয়োগে দমন করা যাবে না।

১৭. ধন-সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে নির্দ্বিধায় ঝুকে পড়বে।

১৮. তাদের ভদ্রতা ও ন্যায়নীতির ব্যাপারে শত্রুদের ও আস্থা থাকবে।

ধৈর্য্যের কতিপয় বিষয়াবলী:

১. তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত না হারানো।

২. তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া।

৩. বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা।

প্রজ্ঞার কতিপয় বিষয়াবলী:

১. গভীর দৃষ্টি।

২. চিন্তাশক্তি।

৩. বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিরপ্রয়োজন।

৪. পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

৫. বিচার বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে।

এসব গুণকেই এক কথায় বলা হয় **প্রজ্ঞা**।

৪. মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী: ক. গর্ব ও অহঙ্কার। খ.প্রদর্শনেচ্ছা গ. ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত।

গর্ব ও অহঙ্কার থেকে বাঁচার উপায়ঃ

১. বন্দেগীর অনুভূতি। ২. আত্মবিচার । ৩. মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি। ৪. দলগত প্রচেষ্টা।

প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাঁচার উপায়ঃ ১. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। ২. সামষ্টিক প্রচেষ্টা।

৫. মানবিক দুর্বলতা- ক) আত্মপুজা। খ) আত্মপ্রীতি।

বাঁচার উপায় : তওবা ও এস্তেগফার।

গ) হিংসা বিদ্বেষ । ঘ) কু-ধারণা। ঙ) গীবত। চ) চোগলখোরী। ছ) কানাকানি ও ফিসফিসানী। জ) মেজাজের ভারসাম্যহীনতা। ঝ) একগুয়েমী। ঞ) একদেশদর্শীতা। ট) সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা। ঠ) সংকীর্ণমনতা।

মুখস্থঃ তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত- আয়াতুল কুরসি (পৃষ্ঠা-০৮)
সূরা হাশরের শেষ রুকু (পৃষ্ঠা-৬০),
তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত (পৃষ্ঠা-১৯),
মাসয়ালাঃ নামাজ সংক্রান্তঃ পৃষ্ঠা-২০

অনুশীলনী- ০৪ঃ ফেব্রুয়ারী-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা যিলযাল, দেখুন পৃষ্ঠা ৩৮

বই নোট : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

লেখক : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.)

তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা মূলত কুরআনের ভূমিকা নয় বরং এইটা হচ্ছে তাফসির- তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা, যেটাকে লেখক রাহিমাহুল্লাহ ১৪টি পয়েন্টে আলোচনা করেছেন।

১। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা, কুরআন পাঠকের সংকট
২। সংকট উত্তরণের উপায়
৩। কুরআনের মুল আলোচ্য
৪। ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব
৫। ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়
৬। ইসলামী দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়
৭। কুরআনের বর্ণনাভংগী
৮। এহেন বিন্যাসের কারণ
৯। কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো
১০। কুরআন অধ্যায়নের পদ্ধতি
১১। কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন
১২। কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা
১৩। পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান
১৪। বৈধ মতপার্থক্য

২য় পয়েন্ট ।তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

লেখার মূল লক্ষ্য দু'টি:

১. কুরআন বুঝার প্রাথমিক খোরাক :

কুরআন বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক সত্য আগে জানা দরকার। তা না হলে পাঠের মাঝপথে মনে আসবে সংশয়, আর থেমে যাবে হৃদয় দিয়ে অনুধাবনের পথ। বহু মানুষ বছরের পর বছর কেবল বাইরের কথা পড়ে যায়, ভেতরের আলোয় পৌঁছায় না।

২. জিজ্ঞাসু মনের প্রথম আলাপন:

যে প্রশ্নগুলো কুরআন পড়ার শুরুতেই মনে জাগে, লেখক তাদের আগে থেকেই সামনে এনে জবাব দিয়েছেন। এসব প্রশ্ন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ।

কুরআন পাঠকের সংকট :
"যে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তুতি নিয়ে সাধারণ বই পড়া হয়, সেই মানসিকতা নিয়ে কুরআনের দরজায় এলে–কুরআন পাঠ নয়, বরং আত্মিক বিভ্রান্তিই বেশি হয়।"

এক নজরে কুরআন পাঠকের সংকটগুলো:

১. পাঠক কুরআনকে সাধারণ বইয়ের মতো অধ্যায়ভিত্তিক ও ধারাবাহিক মনে করে পড়তে যান।
২. কিন্তু কুরআনের রচনাশৈলী, ভাষা ও উপস্থাপন একেবারে ভিন্ন হওয়ায় তারা বিভ্রান্ত হন।
৩. কুরআনের মূল উদ্দেশ্য, কেন্দ্রীয় বার্তা ও প্রসঙ্গ না জানায় তারা তা ধরতে পারেন না।
৪. ফলে তারা খণ্ড খণ্ড তত্ত্ব পেলেও কুরআনের সামগ্রিক দিক ও প্রাণসত্তা থেকে বঞ্চিত হন।
৫. এই বিভ্রান্তি থেকেই অনেকের মনে সন্দেহ, বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভুল সিদ্ধান্ত জন্ম নেয়।
৬. মূল সংকট কুরআনের নয়, বরং পাঠকের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তুতির অভাবে।

বিস্তারিত :

১. *সাধারণ বই-পাঠের মানসিকতা বনাম বাস্তবতা* : পাঠক কুরআনকেও সাধারণ পাঠ্যবইয়ের মতো অধ্যায়-অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পাবে বলে ধরে নেয়। ভাবেন, ধারাবাহিকভাবে জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো সাজানো থাকবে–যেমন আইন, নীতি, ইতিহাস ইত্যাদি।

বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন : কুরআনে বিষয়বস্তু একাধারে আকীদা, শরীয়াহ, ইতিহাস, উপদেশ, ভয়, সুসংবাদ, যুক্তি–সব একত্র। এক প্রসঙ্গের মাঝে অন্য প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ে; বর্ণনা ও শব্দবিন্যাসেও আসে বৈচিত্র্য।

২*. পাঠকের হতাশা ও বিভ্রান্তি:* সুবিন্যস্ত সূচিপত্র না পেয়ে পাঠক ভাবেন–এটি অগোছালো, খণ্ডিত বক্তব্যের সমষ্টি। সন্দেহবাদীরা এখানেই কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তির ভিত্তি তৈরি করে।

৩. *ব্যাতিক্রম রচনাশৈলী* : কুরআনের ভাষা, বিশ্লেষণপদ্ধতি, শব্দের গভীরতা, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সাধারণ পাঠ্যশাস্ত্র থেকে আলাদা। দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতির কারণে পাঠক আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে ব্যর্থ হয়।

৪*. ফলাফল:* কেউ কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন নসিহত ও উপদেশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। কেউবা ভুল পটভূমির কারণে অর্থবিকৃতি ও চিন্তার বিচ্যুতিতে পড়ে।

৫*. মূল সংকট:* কুরআন বোঝার আগে প্রয়োজন যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও বর্ণনা পদ্ধতির বোধ। এগুলো ছাড়া কুরআনের হৃদয় ছুঁয়ে দেখা সম্ভব নয়।

২য় পয়েন্ট: সংকট উত্তরণের উপায় :

❑ ৪টি প্রশ্ন আগে বুঝতে হবে :

১. *সংকট কী?* – কুরআন পাঠকের সংকট হচ্ছে কুরআন বুঝতে গিয়ে সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া।

২. সংকট কেন এবং কোথা থেকে তৈরি হয়েছে? – মৌলিক ধারণার অভাবে।

৩. সংকট কিসের উপর ভিত্তি করে? – কুরআনের পরিচয় ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াত সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে।

৪. সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কেমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন? – নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কুরবানী দিয়ে কুরআন ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াত অনুযায়ী দেখা।

❖ কুরআন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা : কুরআন কোনো প্রচলিত গ্রন্থ নয়; এটি এক অভিনব, স্বতন্ত্র ও সর্বযুগোপযোগী কিতাব। প্রচলিত বইয়ের কাঠামো ও মানদণ্ডে কুরআনকে বিচার করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

❖ কুরআন অনুধানের পূর্বশর্ত : কুরআনের প্রকৃত পরিচয় ও তার উপস্থাপক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াতকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। বিশ্বাস না থাকলেও কুরআনের বক্তব্য বোঝার জন্য এর মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে হয়।

সূত্রসমূহ :

২য় সূত্র : আল্লাহর পরিচয়, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

২য় সূত্র : আল্লাহর ঘোষণা ; মানুষের দায়িত্ব, কর্মনীতি ও পরিণতি
৪র্থ সূত্র : অবাধ্যতার ইতিহাস
৪র্থ সূত্র : আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত দেওয়ার পদ্ধতি
৫ম সূত্র : নবীগণের মিশন ও ভূমিকা
৬ষ্ঠ সূত্র : মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ও চূড়ান্ত হেদায়াত

৪র্থ পয়েন্ট। আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়

কুরআনের মূল বিষয়বস্তু : মানুষের কল্যাণ কিসে—এই প্রশ্নের যথার্থ ও জাজ্জ্বল্যমান সত্যভিত্তিক উত্তর।

কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় : মানুষ যে মতবাদ ও কর্মনীতি গ্রহণ করেছে তা ভুল; সত্য হলো আল্লাহর দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি।

চূড়ান্ত লক্ষ্য : ১. মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি গ্রহণে আহ্বান।
২. আল্লাহর হেদায়াত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

মানব সমাজের সমস্যা : অনুমাননির্ভরতা, প্রাকৃতিকতা ও শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সত্য বিকৃতির কাজ মানুষ নিজেরাই করে এসেছে।

তিনটি মূল বিষয় :

১. বিষয়বস্তু: মানব কল্যাণের সত্য অনুসন্ধান।

২. আলোচ্য বিষয়: সত্য-মিথ্যার বিভ্রান্তি দূরীকরণ।

৩. লক্ষ্য ও বক্তব্য: সত্য পথে আহ্বান।

কুরআনের আলোচনার বিষয়সমূহ :

১. আকাশ-পৃথিবীর গঠন
২. মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া
৩. পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস
৪. জাতির আকীদা, নৈতিকতা, কর্মের সমালোচনা
৫. অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

উদ্দেশ্য: ১. কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যার শিক্ষা নয়, ২. সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আলোচনা।

আলোচনার বৈশিষ্ট্য:

- সব আলোচনা কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও দাওয়াতের দিকে আবর্তিত
- অপ্রয়োজনীয় বিশদ ব্যাখ্যা পরিহার
- গভীর ঐক্য ও সংগতি বজায় রেখে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন
- কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

ধাপে ধাপে নাযিল: কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি, বরং ২৩ বছরে ধাপে ধাপে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হয়।

প্রচলিত গ্রন্থের মতো নয়: এতে ধারাবাহিক রচনা ও বিষয়বিন্যাস নেই; এটি এক অভিনব গ্রন্থ।

প্রথম দিকের বিষয়বস্তু:

- **নবীকে প্রস্তুত করা:** দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি শেখানো। সত্য পরিচিতি ও ভুল ধারণা খণ্ডন।
- **সঠিক জীবনের দাওয়াত:** নৈতিকতা ও কল্যাণের পথ দেখানো।
- **দাওয়াতের শুরু:** মক্কা ও নিজ জাতি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা হয়।

৪র্থ পয়েন্ট। ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব (মক্কী দাওয়াতের প্রথম ৪-৫ বছর):

- দাওয়াতের শুরুতে সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও সাহিত্যসমৃদ্ধ আয়াত নাযিল হয় যা সহজেই মানুষের মনে গেঁথে যেত।
- ভাষা ছিল মিষ্টি, প্রভাবশালী ও আরবদের রুচি অনুযায়ী।
- স্থানীয় ইতিহাস, নিদর্শন ও বাস্তবতা দিয়ে সত্যের যুক্তি উপস্থাপন করা হতো।
- প্রতিক্রিয়া তিন রকম:
- কিছু মানুষ ইসলাম কবুল করে উম্মাহ গঠন শুরু করেন।
- অনেকেই বিরোধিতায় নেমে পড়ে।
- দাওয়াত কুরাইশের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হতে থাকে।

৫ম পয়েন্ট। দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রায় ৯ বছর)

- ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয়।
- বিরোধীরা অপপ্রচার, নির্যাতন, বয়কট, হিজরতের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।

- এরপরও ইসলামী দাওয়াত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে; প্রায় সব বংশে কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করে।
- আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাকওয়া, ধৈর্য, দাওয়াতের পদ্ধতি ও ঈমানদারদের প্রশিক্ষণমূলক আয়াত নাযিল হতে থাকে।
- শিরক ও জাহেলিয়াতকে যুক্তির মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাদের সন্দেহ দূর করা হয়।

৬ষ্ঠ পয়েন্ট। দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায় (মদীনী পর্ব ১০ বছর):

- হিজরতের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য মদিনায় একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়।
- ইসলাম রাষ্ট্রীয় রূপ পায়; যুদ্ধ, মুনাফিক ও আহলে কিতাবদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়।
- কুরআনের বাণী এখন রাজকীয় ফরমান, রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক বিধান ও শত্রুদের মোকাবেলার নির্দেশনায় পূর্ণ।
- মুসলমানদের আত্মগঠনে, সমাজ গঠনে ও জিহাদের প্রেরণায় নাযিল হয় আয়াতসমূহ।
- ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বৈশ্বিক দাওয়াতের ভিত্তি গড়ে তোলা হয়।

৭ম পয়েন্ট। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি

- **দাওয়াতি সূচনা:** কুরআনের প্রথম নাজিল শুরু হয় একটি দাওয়াতি আহ্বান নিয়ে।

- ২৩ বছরের বাস্তবতা: দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।
- **রচনাশৈলী আলাদা:** কুরআনের বর্ণনা ডক্টরেট থিসিস বা গবেষণাপত্রের মতো নয়।
- **বক্তৃতাভঙ্গি:** কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো বক্তৃতা ও ভাষণের মতো, যা মানুষের হৃদয়, বিবেক ও আবেগকে লক্ষ্য করে।
- **আহ্বানকারীর ভাষা:** এটি কোনো অধ্যাপকের নয়, বরং একজন আহ্বানকারীর আবেগপূর্ণ ভাষণ।
- **বহুমুখী কাজ:** রাসূল ﷺ-কে চিন্তা বদল, আবেগ জাগানো, বিরোধিতা ভাঙা, সাথীদের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া, শত্রুদের মোকাবিলা করা—সব একসাথে করতে হতো।
- **ভাষার বৈচিত্র্য:** কুরআনের ভাষা এই বাস্তব দাওয়াতের উপযোগীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; কোনো নির্দিষ্ট একক ভঙ্গি নয়।
- **পুনরাবৃত্তির কারণ:** এক পর্যায়ে থাকা অবস্থায় একই বিষয়ের বারবার আলোচনা দরকার হয়; কিন্তু তা ভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়।
- ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যবহার: পুনরাবৃত্তিকে বিরক্তিকর না করে নতুন রূপ, শব্দ ও শৈলীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- মূলনীতি কখনো আড়ালে যায় না: তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলো পুরো কুরআনে বারবার এসেছে।

- **কারণ:** এই মৌলিক ধারণাগুলো দুর্বল হলে ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যেত।

৮ম পয়েন্ট। এহেন বিন্যাসের কারণ

- **নাযিলের ক্রম রাখা হয়নি কেন?** কুরআন নাযিলের যে ধারায় এসেছে, নবী ﷺ তা বিন্যাসে অক্ষুণ্ন রাখেননি; কারণ দাওয়াত পরিপূর্ণ হওয়ার পর তার উপযোগিতা পরিবর্তিত হয়েছে।
- দাওয়াতের পর্যায়ভিত্তিক নাযিল: কুরআন ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।
- পরিপূর্ণ দাওয়াতের পর নতুন প্রয়োজন: ইসলাম প্রচারের শুরুতে অপরিচিতদের জন্য শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় ছিল; পরে, ঈমানদারদের দায়িত্ব, শাসন, সমাজ ও ইতিহাসের শিক্ষা প্রয়োজন হয়।
- নতুন বিন্যাসের প্রয়োজন: পরিণত উম্মাহর জন্য প্রয়োজন হয় একটি সম্পূর্ণ, সংগঠিত ও লক্ষ্যভিত্তিক কিতাব।
- কুরআনের প্রকৃতি: একই বিষয়ের আলোচনা মক্কী ও মাদানী সূরায় ছড়িয়ে থাকলেও এতে ইসলামের সামগ্রিক চিত্র পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়।
- **বিভিন্ন পর্যায়ের মিশ্র বর্ণনা:** মক্কী যুগের আলোচনা মাদানী সূরায়, আর মাদানী নির্দেশনা মক্কী সূরার মধ্যে আসতে পারে—এই বৈচিত্র্যেই ইসলামের পূর্ণতা ফুটে ওঠে।
- নাযিলের ক্রমে বিন্যাস করলে সমস্যা: তখন কুরআনের সাথে প্রতিটি আয়াতের নাযিল-পরিস্থিতির ইতিহাস জুড়ে দিতে হতো, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতো।

আল্লাহর উদ্দেশ্যঃ
কুরআন যেন সব শ্রেণির মানুষ–শিশু, নারী, বৃদ্ধ, সাধারণ, পণ্ডিত–সহজে বুঝতে ও পাঠ করতে পারে।
নির্ভেজাল কিতাবঃ আল্লাহর বাণীকে অন্য কোনো ইতিহাস বা ব্যাখ্যার মিশ্রণ ছাড়া একত্রিত ও সংরক্ষণই ছিল লক্ষ্য।
আসল ভুল ধারণাঃ কুরআনের বিন্যাস নিয়ে আপত্তি তোলেন যারা, তারা কুরআনের উদ্দেশ্য না জেনে এটিকে ইতিহাস বা সমাজ বিজ্ঞানের কিতাব ভাবেন।

আয়াত বিন্যাসে নবী ﷺ-র ভূমিকাঃ

- নবী ﷺ নির্দেশ দিতেন কোন আয়াত বা সূরা কোথায় বসাতে হবে।
- কোনো অংশ যদি সম্পূর্ণ সূরা না হয়, তবুও তিনি নির্দেশ দিতেন সেটি কোন সূরার কোন জায়গায় বসাতে হবে।
- নামাযে, তেলাওয়াতে তিনি এই বিন্যাসই অনুসরণ করতেন।
- সাহাবাদের অনুসরণঃ সাহাবায়ে কেরাম এই বিন্যাস অনুযায়ী কুরআন মুখস্থ করতেন।
- বিন্যাস ছিল ঐশী ও চূড়ান্তঃ কুরআন যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, তেমনি এর বিন্যাসও নবী ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশেই সম্পূর্ণ হয়েছিল।
- হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল নাঃ এই বিন্যাসে কোনো মানুষের নিজ ইচ্ছায় পরিবর্তনের সুযোগ বা অধিকার ছিল না।

৯ম পয়েন্ট। কুরআন কিভাবে সংকলিত হলোঃ

- নবুয়তের যুগে সংরক্ষণ
- নামাজ ফরজ হওয়ায় কুরআন মুখস্থ করা আবশ্যক ছিল।
- সাহাবিরা সাথে সাথে কুরআন মুখস্থ করতেন।
- কাতিবরা খেজুরপাতা, হাড়, পাথরে লিখে রাখতেন।
- আবু বকর (রা)-এর সময়ে সংকলন
- ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজ সাহাবী শহীদ হন।
- হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন।
- হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) লিখিত ও মৌখিক দুই মাধ্যম মিলিয়ে নির্ভুল কপি প্রস্তুত করেন।
- সংকলিত কপি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত হয়।
- উসমান (রা)-এর সময়ে প্রামাণ্য কপি প্রচলন
- ইসলাম বিস্তারের ফলে বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠে ফিতনার আশঙ্কা দেখা দেয়।
- হযরত উসমান (রা) একমাত্র কুরাইশী উচ্চারণে লিখিত নুসখা প্রণয়ন ও প্রচার করেন।
- অন্য সব পাঠপ্রণালী বন্ধ করে দেন।
- এই নুসখাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

আজকের কুরআন

- বর্তমান কুরআন হযরত উসমান (রা) প্রণীত অনুলিপিরই প্রতিলিপি।
- বিশ্বব্যাপী হাজারো কপি থাকা সত্ত্বেও এক হরফও পরিবর্তিত হয়নি।
- এটি ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ।

১০ম পয়েন্ট। কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

- **মন-মস্তিষ্ক মুক্ত রাখা:** কুরআন অধ্যয়নের শুরুতে পূর্বনির্ধারিত চিন্তাধারা, মতবাদ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আন্তরিক ও নির্ভেজাল উদ্দেশ্যে পড়তে হবে।
- **প্রথম পাঠে সামগ্রিক ধারণা অর্জন:** প্রথমবার কুরআন পড়ার সময় এর সামগ্রিক বিষয়, মৌলিক চিন্তা ও জীবনব্যবস্থার ভিত্তি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। পড়ার সময় প্রশ্ন বা সংশয় নোট করতে হবে, পরে উত্তর খুঁজতে হবে।
- **বারবার পাঠ ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি:** একবার পড়া যথেষ্ট নয়; বারবার পড়তে হবে, প্রতিবার নতুন ভঙ্গিতে পড়তে হবে। নোটবই নিয়ে বসে বিস্তারিত লেখা উচিত।
- **সংশয় ও প্রশ্ন সংরক্ষণ:** প্রথম অধ্যায়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর না পেলে তা লিখে রেখে দ্বিতীয় বা পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তর খুঁজতে হবে, ধৈর্য ধরে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে।
- **বিষয়ভিত্তিক গভীর অধ্যয়ন:** কুরআনের বিভিন্ন বিষয় যেমন আদর্শ মানুষ, কল্যাণ ও ক্ষতির বিষয়াদি আলাদা আলাদা করে নোট করতে হবে এবং মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে।

- **বিভিন্ন বিষয় ভাগ করে লেখা:** যেমন 'পছন্দনীয় মানুষ' ও 'অপছন্দনীয় মানুষ', 'কল্যাণের উপাদান' ও 'ক্ষতির কারণ' এর মতো ভাগ করে নোটবইতে লিখে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে।
- **কুরআনের সামগ্রিক জীবনচিত্র অনুধাবন:** বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে কুরআন থেকে জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট করতে হবে।
- **সমস্যা নির্ধারণ করে অনুসন্ধান:** জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালাতে চাইলে সেই সমস্যা সংক্রান্ত প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হবে, তারপর কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করতে হবে।
- **গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে উত্তর পাওয়া:** আগেও পড়া আয়াতগুলোতেও গবেষণা করলে নতুন নতুন অর্থ বা তত্ত্ব সামনে আসবে।

১১ তম পয়েন্ট। কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন

- **কুরআন শুধু তাত্ত্বিক বই নয়:** এটি কোনো মতবাদ বা চিন্তাধারার গ্রন্থ নয়, বরং জীবনের কাজ করার নির্দেশনা ও বাস্তব প্রয়োগের কিতাব।
- **আসল উপলব্ধি কাজের মধ্য দিয়ে:** কুরআনের প্রাণসত্তা বুঝতে হলে শুধু পড়া নয়, এর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা ও কাজ করতে হবে।
- **ধর্মগ্রন্থ বা মাদ্রাসার শিক্ষার বাইরে:** মাদ্রাসার পাঠ বা খানকাহয় বসে শুধু তত্ত্ব অনুধাবনেই সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়।

- দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাবঃ কুরআন একটি সক্রিয় আন্দোলনের বই, যা মানুষের নীরবতা ভেঙে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করার আহ্বান দেয়।
- **বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ**ঃ কুরআন অনুসারীদেরকে সমাজের অবিচার, অবিশ্বাস, কুফর ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখায়।
- **সত্যনিষ্ঠ ও সক্রিয় জীবনের আহ্বানঃ** কুরআন অনুসারীরা গৃহের বাইরে এসে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়, শুধু নিঃসংগ জীবন নয়।
- **খিলাফতে ইলাহীয়ার দীর্ঘ সংগ্রামঃ** কুরআন ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলন ২৩ বছর ধরে নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- **সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অংশ হতে হবেঃ** কুরআনের পূর্ণ উপলব্ধি হবে শুধু যখন নিজেকে ঐ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখবেন এবং কাজ করবেন।
- **'কুরআনী সাধনা'ঃ** কুরআনের আয়াত ও সূরা বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির স্মৃতি হয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামনে আসবে, এক ধরনের ধারাবাহিক সাধনা।
- **ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাস্তবায়ন অপরিহার্যঃ** ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া অথবা জাতির সামাজিক ব্যবস্থা কুরআনের পথে না গেলে এর প্রাণসত্তা উপলব্ধি সম্ভব নয়।

১২ তম পয়েন্ট। কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

- **কুরআনের মূল দাবি:** কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাতে নাযিল হয়েছে।
- **নাযিলের সময়ের আরববাহিনী লক্ষ্য:** অধিকাংশ আয়াত আরববাসীর ঐতিহাসিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে।
- **স্থানীয় ও সাময়িক বিষয়বস্তু থাকা স্বাভাবিক:** বিশেষ সময় ও স্থানের মানুষের অবস্থান বুঝিয়ে, তাদের বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।
- **সমগ্র মানবতার জন্য প্রযোজ্যতা:** কেবল আরবদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; আয়াত ও নির্দেশনার মূল যুক্তি ও নীতি সব যুগ ও জাতির জন্য প্রযোজ্য।
- **কুরআনের প্রমাণ পদ্ধতি ও যুক্তি সার্বজনীন:** শিরকের বিরুদ্ধে কুরআনের যুক্তি বিশ্বজনীন, যেকোনো যুগের মুশরিকের জন্য প্রযোজ্য।
- **সমগ্র মানবজাতির জীবনে প্রভাব:** কুরআনের শিক্ষা ও দাওয়াত স্থান ও সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে চিরন্তন ও সার্বজনীন।
- **বস্তু নিরপেক্ষতা ও সময়ের সাথে খাপ খাওয়া:** কোনো চিন্তা বা দর্শন পুরোপুরি বস্তু নিরপেক্ষ নয়; পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়।
- **আন্তর্জাতিক দাওয়াতের বাস্তবতা:** দাওয়াত শুরুতে স্থানীয় মানুষের কাছে পেশ করা এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।
- **আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যবস্থার পার্থক্য:**

- **জাতীয় ব্যবস্থা:** নির্দিষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষ অধিকারের দাবি।
- **আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা:** সকল মানুষের মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করে।
- **সাময়িক ব্যবস্থা:** সময়ের সাথে পরিবর্তিত ও অস্থায়ী।
- **চিরন্তন ব্যবস্থা:** সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খায়।
- **কুরআন একটি চিরন্তন, সার্বজনীন ব্যবস্থা:** এটি শুধুমাত্র আরবের জন্য বা সাময়িক কোনো জাতির জন্য নয়, বরং সব যুগ ও জাতির জন্য আদর্শ জীবন ব্যবস্থা।

১৩ তম পয়েন্ট। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

- **কুরআন জীবন বিধান গ্রন্থ হলেও:** সরাসরি সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সম্মপূর্ণ বিস্তারিত নিয়ম-কানুন কুরআনে পাওয়া যায় না।
- **নামায ও যাকাতের বিধানও বিস্তারিত নয়:** এমনকি নামায ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযও কুরআনে বিস্তারিতভাবে প্রতিটি নিয়ম তুলে ধরা হয়নি।
- **অব্যক্ত কারণ:** আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল শুধু কিতাব নাযিল করা নয়, বরং পয়গম্বরকে প্রেরণ করা – যিনি জীবন ব্যবস্থার বিস্তারিত বাস্তব রূপ স্থাপন করবেন।
- **গৃহনির্মাণের রূপকে উদাহরণ হিসেবে বোঝানো হয়েছে:** নকশা (কুরআন) দেওয়ার পর একজন ইঞ্জিনিয়ার (পয়গম্বর) সেই নকশা অনুযায়ী পুরো ভবন নির্মাণ করেন। তাই কেবল নকশা দেখে অসংগতি আনা যুক্তিহীন।

- **কুরআন মূলনীতি ও মৌলিক বিষয় উপস্থাপন করেঃ** খুটিনাটি বিবরণ না দিয়ে মূল নীতি, ভাবনা ও নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে।
- বৈজ্ঞানিক যুক্তি, প্রমাণ ও আবেদনের মাধ্যমে শক্তিশালী করণঃ কুরআন চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তি শুধু দেয় না, পাশাপাশি যুক্তি ও আবেগ দিয়ে তাদের দৃঢ় করে।
- **ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণঃ** কুরআন জীবনের বিভাগগুলোর মূল চৌহদ্দি ও সীমারেখা নির্দেশ করে।
- **বাস্তব গঠন ও নির্মাণ পয়গম্বরের দায়িত্বঃ** নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন ব্যবস্থার আদর্শ কাঠামো তৈরি করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

১৪ তম পয়েন্ট। বৈধ মতপার্থক্য

- **কুরআন কঠোরভাবে নিন্দা করে এমন মানুষদের যারাঃ** আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়ার পরও নিজেদের মধ্যে দলে বিভক্ত হয়, দলাদলি করে, ও নিজেদের দীনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলে।
- **কিন্তু একই সময়ে দেখা যায়ঃ** দীন ও আইন বিষয়ে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আলেম, তাবেইন, সাহাবা এবং ইমামদের মধ্যেও ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল।
- **সব জায়গায় একমত হওয়ার আয়াত নেইঃ** এমন কোনো আয়াত নেই যা প্রতিটি বিষয়ে একমত থাকার নির্দেশ দেয়।
- **তাহলে প্রশ্নঃ** কুরআনের কঠোর নিন্দা কি ঐ আলেমদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? না হলে কুরআন কোন ধরনের মতবিরোধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে?

মতপার্থক্যের দুই ধরণ এবং কুরআনের রায়ঃ

প্রথম ধরনের মতপার্থক্যঃ

- আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যে সবাই ঐক্যবদ্ধ।
- কুরআন ও সুন্নাহ জীবন বিধানের উৎস স্বীকার।
- ছোটখাটো বিষয়ে আলেমদের মধ্যে স্বতন্ত্র মত থাকতে পারে।
- কেউ কাউকে দীন থেকে বহিষ্কৃত বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করবে না।
- যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে মতামত দেওয়া ও গ্রহণ করা হয়।
- সমাজের উন্নতি ও বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হিসেবে এই মতপার্থক্যকে দেখা হয়।

দ্বিতীয় ধরনের মতপার্থক্যঃ

- মৌলিক দীনীয় বিষয় বা ইমান-বিশ্বাসে বিভাজন সৃষ্টি।
- নিজের মতকে 'সত্য মুসলিম' ও অন্যদের 'বহিরাগত' ঘোষণার প্রচার।
- দলগঠন করে অন্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা, বিদ্বেষ ও দীন থেকে বহিষ্কার করার প্রচেষ্টা।
- এতে সমাজে বিভাজন, বিদ্বেষ, ও ধ্বংসাত্মক দলাদলি তৈরি হয়।
- কুরআন এই ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির কঠোর নিন্দা করে।

কুরআন কী চাইছে?ঃ

- **বুদ্ধিমত্তার মুক্ত অবস্থানঃ** ইসলামী সমাজে জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষের মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়।

- মৌলিক বিশ্বাসে একতা বজায় রাখা: ইসলামী নীতি ও মূল বিশ্বাসের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য থাকতে হবে।
- দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ থেকে বিরত থাকা: যা কেবল বিভাজন, বিদ্বেষ ও উম্মাহর ক্ষতি করে।
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এমন বৈধ মতবিরোধকে প্রশংসিত করেছেন।

পাঠকের জন্য পরামর্শ

- কুরআনের গভীর অধ্যয়ন ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) মনোযোগ দিয়ে পড়া প্রয়োজন।
- যেসব প্রশ্ন মনে হয়, সংশ্লিষ্ট অংশে তার জবাব খোঁজার চেষ্টা করা।
- মতবিরোধের বিষয়ে সচেতন থাকা ও মৌলিক ইসলামী ঐক্য রক্ষা করা।
- দ্বন্দ্ব, দলাদলি, ও বিভাজনের পথ এড়িয়ে চলা।

দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত,

আল ইমরান-১০৪

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।

ইউসূফ-১০৮

قُلۡ هٰذِهٖ سَبِیۡلِیۡۤ اَدۡعُوۡۤا اِلَی اللّٰهِ ۟ عَلٰی بَصِیۡرَۃٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیۡ ؕ وَ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ

বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও, আর আল্লাহ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আন নাহল-১২৫,

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।

হামীম আস সাজদাহ-৩৩,

وَ مَنۡ اَحۡسَنُ قَوۡلًا مِّمَّنۡ دَعَاۤ اِلَی اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?

মায়েদা-৬৭

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕوَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕوَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তার বার্তা প্রচার করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضْعَفُ الإِيمَانِرواه مسلم

বর্ণনাকারীঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।” (আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮৬, আসহাবে সুনান)

মাসয়ালা: বিভিন্ন নামাজ সংক্রান্ত- পৃষ্ঠা- ২০

অনুশীলনী- ০৫ঃ মার্চ- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী- সূরা আসর,

(ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়)

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

অর্থঃ সময়ের কসম। মানুষ আসলে খুবই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং পরস্পরকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের "আল আছর" শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়কালঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মুফাস্সির একে মাক্কী বলেছেন। এর বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় মাক্কী যুগের প্রথম অংশে অবতীর্ণ। এর আকার মাক্কী সুরার বৈশিষ্ট্য বহন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এর মধ্যে স্পষ্ট ভাষায়, মানুষের সাফল্য ও কল্যাণ এবং ধ্বংসের পথ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেন- মানুষ যদি এই একটি সুরা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে এটিই তাদের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হিসন দারেমী আবু মাদীনা-

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا، لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا عَلى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إِلى آخِرِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ "سُوْرَةَ الْعَصْرِ"

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্য থেকে যখন দুই ব্যক্তি মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সুরা আছর না শোনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না।' (তাবারানী)

ব্যাখ্যাঃ

মূলবিষয়ঃ এ সুরায় চারটি গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা সময়ের ভেতর অবস্থানকালীন ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে-
১.ঈমান ২. সৎকাজ ৩.পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া। ৪. পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেয়া।

কসমের অর্থঃ আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, অভিনবত্ব প্রকাশের জন্য কখনও কসম খাননি বরং যে বিষয়টি প্রমাণ করার উদ্দেশ্য এই বস্তুটি তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তার কসম খেয়েছেন। এখানে সময়ের কসম খাওয়ার অর্থ হলো যাদের মধ্যে উল্লিখিত চারটি গুনাবলী রয়েছে তারা ছাড়া বাকী সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে সময় সাক্ষী।

আয়াত নং ১-৩

সময়ের কসমঃ সময় বলতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এটি কোন দীর্ঘ সময় নয়। ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে বের হয়ে আসা বর্তমান অতীতে নিপতিত হচ্ছে। অতীতের কসম হলো ইতিহাসের সাক্ষ্য। বর্তমানের

কসম হলো বর্তমানের অতিবাহিত সময় মানুষকে কাজের জন্য দেয়া হচ্ছে। দ্রুত অতিবাহিত সময়ই হলো আসল মূলধন।

ইমাম রাযী কর্তৃক এক মনীষির উদ্ধৃত উক্তি-
এক বরফ ওয়ালা বাজারে হেকে চলছিল, **দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুজি গলে যাচ্ছে**।
১) "মানুষ" বলতে সমস্ত জাতিকে বোঝানো হয়েছে।
২) "ক্ষতি" বলতে সাধারন অর্থে লাভের বিপরীত হলেও এখানে কল্যাণ ও সফলতা বিপরীত অর্থে।
৩) (সাফল্য ও ক্ষতির ব্যাখ্যা করতে হবে) প্রকৃত অর্থ হলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় ক্ষতি বিরাজমান। চারটি গুন সম্পন্ন লোক দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই লাভবান।

চারটি গুনঃ
১) ঈমানঃ ঈমানের সমন্বয় হলো ক) মৌখিক স্বীকৃতি খ) অন্তরে বিশ্বাস গ) কাজে পরিণত করা।
কোরআনে ঈমানের ব্যাখ্যা-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

"যারা বলেছে আল্লাহ আমাদের রব তারপর তার উপর অবিচল হয়ে গেছে।"(হা-মীম সিজদা-৩০)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

"আসলে তারাই মূমিন আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেপে উঠে।"(আনফাল-২)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

“আসলে তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এরপর কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়নি।”(হুজুরাত,১৫)

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

“যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে ভালোবাসে।” (বাকারা-১৬৫)

ঈমানের আসল লক্ষ্য হলো প্রকৃত ঈমান, কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনো।”(নিসা-১৩৬)

২) সৎকাজঃ

দ্বিতীয় গুণটি হলো সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় সালেহাত সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের দৃষ্টিতে, যে কাজের মূলে ঈমান আছে এবং যা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে তা, সৎকাজ। ঈমানের পর সৎকাজের বর্ণনার অর্থ হলো ঈমান বিহীন কোন সৎকাজের পুরস্কার দেয়ার ...... নেই। সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈমান ও সৎকাজ বীজ আর বৃক্ষের মতো।

পরবর্তী দু'টি গুণ হলো - যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা পরস্পরকে হক কথা বলা হক কাজ করা এবং ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ

দিতে হবে। এর প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক না থেকে সম্মিলিতভাবে একটি সৎ সমাজ দেহ গড়ে তুলতে হবে।

"হক" শব্দটি বাতিলের বিপরীত। দু'টি অর্থ-

সঠিক, নির্ভুল, সত্য অনুসারী এবং আকিদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারীর কথা।

আল্লাহর বান্দার বা নিজের যে হকটি আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(১) বাতিল মাথা উঁচু করে দাড়ালে হক পন্থীরা নিরব দর্শক নয়।

(২) সমাজে প্রানশক্তি বজায় থাকে।

(৩) হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হক পন্থীরা অন্যদেরকেও হকের উপদেশ দেয়।

সুরা মায়েদার (৭৮-৭৯) তে বলা হয়েছে-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

'হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আ:) এর মুখ দিয়ে বনী ইসরাঈল জাতির উপর লা'নত করা হয়েছে কারণ তাদের সমাজে গোনাহ ও জুলুম ব্যাপক বেড়ে গিয়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দিত না।'

চতুর্থ গুনটি হলো সবরঃ হকের নসিহত করতে গিয়ে বা হকের সমর্থন করতে গিয়ে যে সব সমস্যা ও বাধার মুখে নিপতিত হতে হয় তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ় থাকার উপদেশ দিতে থাকবে।

-ঃ শিক্ষা ঃ-

(১) দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে।

(২) প্রকৃত ঈমানদারকে অবশ্যই সৎকাজ করতে হবে এবং পরস্পরকে হক কথা বলতে হবে।

(৩) ঈমানদারকে অবশ্যই বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং বাতিলকে মাথা উচু করে দাড়াতে দেবেনা।

(৪) হক পথে চলার সময় সমস্ত বাধা বিপত্তি অবশ্যই ধৈর্য্য ধরে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

বইঃ চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান

নঈম সিদ্দিকী

ভূমিকাঃ

১. শয়তানের তৎপরতাঃ মানুষের তৎপরতা বৃদ্বির সাথে সাথে শয়তানের তৎপরতা ও বৃদ্বি পায়। শয়তানের চ্যালেঞ্জ "যে মানুষের সামনে, পিছনে, উপরে, নিচে চতুর্দিক থেকে আক্রমন করবে"। বর্তমান পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এর বাস্তব চিত্র।

২. স্বার্থপরতাঃ এলাকার সংক্রামক ব্যাধি হতে দেখে দূরে অবস্থান যেমন স্বার্থপরতা তেমনি বর্তমানে কেউ ঈমান নিয়ে মসজিদের কোনে আশ্রয়, নেয়াটাই স্বার্থপরতার সামিল।

৩. ঈমানের পুঁজিঃ বাজারে আবর্তনের মধ্যে পুঁজির স্বার্থকতা। সিন্দুকে পড়ে থাকা পুঁজি যেমন কোন মুনাফা বয়ে আনতে পারে না তেমনি

চরিত্ররূপ পুঁজি কোন মুনাফা বয়ে আনতে পারে না। কিন্তু জনসমক্ষে খাটানোর মধ্যেই রয়েছে চরিত্রের স্বার্থকতা।

চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদানঃ ৩টি

১. খোদার সাথে যথার্থ সম্পর্কঃ

ক) পূর্ণনিয়মানুবর্তিতার সাথে মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন করা

খ) কুরআন, হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন করা

গ) নফল নামাজের উপর যথসম্ভব গুরুত্বারোপ

ঘ) সার্বক্ষনিক দোয়া ও যিকির

২. সংগঠনের সাথে সম্পর্ক:

কর্মীদের করণীয়ঃ

ক) আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা করা।

খ) অন্ধ আনুগত্য পরিহার করা।

গ) ব্যক্তির রুচি,প্রকৃতি ও প্রবনতার কারনে আনুগত্য কম বেশী করা যাবে না।

ঘ) কর্তৃত্বশালীদের সুন্দর আচরন ও মনমেজাজের অধিকারী হতে হবে।

কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের কতিপয় আরো বিষয়াবলীঃ

= দায়িত্বশীল কর্তৃক কোন সার্কুলার জারী করা হলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

= কোন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

= দলীয় শৃংখলার আনুগত্যে ত্রুটি করলে, মিথ্যা সাক্ষী দিলে, চুরি করলে, কারো অর্থ আত্মসাৎ করলে, গীবত করলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

= সংগঠনকে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে একটি আমানত মনে করে প্রত্যেক সহযোগীকে ব্যক্তিগতভাবে এর রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দায়িত্বশীলদের করনীয়ঃ

ক) সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।
খ) সহযাগীদের দুর্বলতাগুলো মাফ করে দেয়ার, মনকে কলুষিত না করার ও নিরাশ না হওয়ার মানষিকতা থাকতে হবে, বিভিন্ন সময় মাঝে মাঝে সহযাগীদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

৩. সহযোগীদের সাথে সম্পর্কঃ

ক) কোন খবর বা বিবরণ শুনার পর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্বান্ত নেয়া ঠিক নয়।
খ) একে অন্যকে এক দল অন্য দলকে বিদ্রুপ করা উচিত নয়।
গ) অন্যের গীবত করা বা কারো সম্মপর্কে কুধারনা করা মোটেই উচিত নয়।

পরিশেষে, যদি আমরা খোদার সাথে সম্পর্ক কায়েমের যথাযথ ব্যবস্থা করে দলীয় নীতি ও শৃংখলার আনুগত্য করি এবং উল্লিখিত নৈতিক গুনাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে ইনশাআল্লাহ, আমাদের ব্যর্থতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। খোদা আমাদেরকে স্বয়ংসমপূন্ন হওয়ার তিনটি সুযোগ দেন, তাহলে বিশ্বাস করুন আমরা ব্যবসায়ে যে পুঁজি খাটাচিছ তা কয়েকগুন অধিক মুনাফাদানে সক্ষম হবে।

দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত আল ইমরান-১০৪, ইউসূফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-৩৩, মায়েদা-৬৭ *দেখুন পৃষ্ঠা ১১২*
দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, *দেখুন পৃষ্ঠা ১১৪*

মাসয়ালাঃ সিয়াম সংক্রান্ত।

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

এক নজরে সিয়াম বা রোজার জরুরি মাসআলা-মাসায়েল

❑ ১. সিয়ামের সংজ্ঞাঃ

সিয়াম (الصيام) আরবি শব্দ। বহুবচন। একবচন সওম (الصوم)। বাংলায় রোজা যা মূলত ফারসি ভাষা থেকে আগত। সওম-এর শাব্দিক অর্থ, বিরত থাকা।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক (ফজর) থেকে সূর্যাস্ত (মাগরিব) পর্যন্ত রোজা ভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকাই হল সিয়াম বা রোজা।

❑ ২. রোজা রাখার বিধানঃ

নিম্নে বর্ণিত কতিপয় শর্ত সাপেক্ষ প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর রমজানের রোজা রাখা ফরজ।

❖ আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৩]

❖ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল, নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, হজ সম্পাদন করা এবং রমজানের রোজা রাখা।" [সহিহ বুখারী: ৮ ও সহিহ মুসলিম: ১৬]

❑ ৩. রোজা ফরজ হওয়ার শর্তাবলি:

রোজা ফরজ হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই—

১. মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের রোজা রাখা আবশ্যক নয়। তবে তাদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য রোজা রাখার জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

৩. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। পাগলের উপর রোজা ফরজ নয়।

৪. রোজা রাখার শারীরিক সক্ষমতা থাকতে হবে। রোজা রাখতে অক্ষম বা যার জন্য কষ্টসাধ্য তার জন্য রোজা রাখা আবশ্যক নয়। যেমন: বয়োবৃদ্ধ, দীর্ঘ মেয়াদী রোগী কিংবা শয্যাশায়ী ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা আবশ্যক নয়।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরমে ভারী কাজ করার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। এ ক্ষেত্রে হয় কর্মঘণ্টা কমিয়ে দিবে অথবা রাত্রিকালীন কাজ করবে।

৫. শরিয়তের বাধামুক্ত থাকতে হবে। (যেমন: ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব নির্গত হওয়া ইত্যাদি)

❑ ৪. রোজার নিয়ত:

ক. মনে মনে রোজা রাখার নিয়ত থাকা আবশ্যক। মুখে উচ্চারণ করে আরবিতে 'নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম.." অথবা বাংলায় নিয়ত উচ্চারণ করা বিদআত।

খ. ফজরের পূর্বেই নিয়ত করা আবশ্যক।

পুরো মাসের জন্য মাসের শুরুতে একবার নিয়ত করাই যথেষ্ট। তবে প্রতি রাতে আলাদা আলাদা নিয়ত করা উত্তম।

উল্লেখ্য যে, কোনও কারণে রোজা ভাঙলে পুনরায় শুরু করার সময় আবার নিয়ত করতে হবে।

❑ ৪. রোজা ভঙ্গের কারণ সমূহঃ

◈ ক. যে কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় তা হল,

রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করাঃ

যদি কোনও ব্যক্তি রমজান মাসে ইচ্ছাকৃত ভাবে স্ত্রী সহবাস করে তবে তার রোজা ভেঙে যাবে এবং এর বদলে একটি রোজা কাজা করার পাশাপাশি কাফফারা (টানা ৬০টি রোজা রাখা) আদায় করতে হবে। তাও সম্ভব না হলে একটি রোজার বিনিময়ে ৬০ জন গরিব-অসহায় মানুষকে খাবার খাওয়াতে হবে বা খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতে হবে। (জনপ্রতি সোয়া কেজি চাল)। টাকা দেওয়া শরিয়ত সম্মত নয়।

◈ খ. যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় কিন্তু শুধু কাজা আবশ্যক হয় (কাফফারা নয়):

নিচের কারণগুলোর কোনও একটি ঘটলে রোজা ভেঙে যাবে এবং রমজানের পর সেই রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রেখে দিলেই হবে (কাফফারা আবশ্যক নয়):

➧ **(১). ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা:** সুবহে সাদিক বা ফরজ উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনও খাবার, পানীয়, ওষুধ ইত্যাদি গ্রহণ করা।

উল্লেখ্য যে, এমন কিছু যা সাধারণত খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তা ইচ্ছাকৃত ভাবে গিলে ফেললেও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন: পাথর, মাটি বা অখাদ্য অন্য কিছু।

➧ **(২) ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করা:** যদি কেউ আঙুল দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে মুখ ভরে ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করে। রোগ বা অন্য কোনও কারণে অনিচ্ছা বশতঃ বমি হলে রোজা ভঙ্গ হবে না।

➧ **(৩) নাক বা কানে ওষুধ প্রবেশ করানো:** যদি এমন কোনও তরল ওষুধ ব্যবহার করা হয় যা সরাসরি পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়।

- রোজা অবস্থায় রক্ত দান করলে বা হিজামা (সিঙ্গা) লাগালে রোজা ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি দ্বিমতপূর্ণ। অধিক বিশুদ্ধ মতে, রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যেহেতু অনেক আলেমের মতে রোজা ভেঙ্গে যাবে তাই সতর্কতা এবং মতবিরোধ থেকে বাঁচার স্বার্থে সম্ভব হলে তা দিনে না করে রাতে করাই ভালো।

➧ **(৪) ভুলবশত ইফতার বা সেহরি করা:** সময় শেষ হওয়ার পর সেহরি খাওয়া অথবা সময় হওয়ার আগে ইফতার করে ফেলা (যদিও ব্যক্তি মনে করেছিল সময় আছে)।

উল্লেখ্য যে, উক্ত রোজা কাজা করার বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। তবে অধিক বিশুদ্ধ মতে তা কাজা করে নিবে। এটাই অধিক সতর্কতামূলক অবস্থান।

➧ (৫) রোজা অবস্থায় অসতর্কতা বশত কোনও কিছু খেলে বা পান করলে রজা ভঙ্গ হয় না। তবে স্মরণ আসার সাথে সাথে পানাহার বন্ধ করতে হবে। এমনকি মুখে থাকলেও তা ফেলে দিতে হবে।

➧ **(৬) নারীদের পিরিয়ড বা সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব:** রোজা থাকা অবস্থায় দিনের যেকোনো সময় ঋতুস্রাব শুরু হলে বা বাচ্চা প্রসব হলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

❑ ৫. যাদের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে (৫টি শ্রেণি):

✪ **১. অসুস্থ ব্যক্তি:** যদি রোজা রাখার কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে রোজা ভাঙতে পারবেন এবং পরবর্তীতে সুস্থ হলে তা কাজা করবেন।

✪ **২. মুসাফির:** সফরের কারণে কষ্ট হলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। তবে কষ্ট না হলে রোজা রাখাই উত্তম। ভাঙ্গলে পরবর্তীতে তা কাজা করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে (সে অন্য সময়ে কাজা করবে)।" [সূরা আল বাকারা: ১৮৫]

✪ **৩. ঋতুমতী ও প্রসূতি নারী:** মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্রাব চলাকালীন সময় (সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪০ দিন) রোজা রাখা আবশ্যক নয়। রোজা অবস্থায় স্রাব শুরু হলে বা বাচ্চা প্রসব হলে স্বয়ংক্রিয় রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে রমজানের পরে আগামী রমজানের পূর্বে তা কাজা করে নিতে হবে।

✪ **৪. গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী মা:** যদি নিজের বা বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে তার তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন এবং পরে কাজা করবেন। তবে যদি কোনও ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে রোজা রাখা মুস্তাহাব।

✪ **৫. অতিবৃদ্ধ বা দীর্ঘমেয়াদী রোগী:** যারা একেবারেই রোজা রাখতে সক্ষম নন তাদের জন্য রোজা রাখা আবশ্যক নয়। তবে প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদ্রব্য (ফিদিয়া যার পরিমাণ সোয়া কেজি চাল) দিতে হবে।

❑ **৬. রোজার মূল শিক্ষা ও উদ্দেশ্য:**

❍ **১. তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন:** রোজার প্রধান এবং মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের মনে আল্লাহর ভয় বা সচেতনতা সৃষ্টি করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" [সূরা বাকারা: ১৮৩]

❍ **২. নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ (আত্মশুদ্ধি):** সারাদিন নিজের বৈধ চাহিদা (খাবার ও পানীয়) পরিহার করার মাধ্যমে একজন মুমিন তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

❍ **৩. ধৈর্য ও সহনশীলতার চর্চা:** ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে রোজাদার ধৈর্যের গুণ অর্জন করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসকে "ধৈর্যের মাস" হিসেবে অভিহিত করেছেন।

❍ **৪. সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধ:** অনাহারে থাকার যন্ত্রণা অনুভবের মাধ্যমে সমাজের অভাবী ও দরিদ্র মানুষের কষ্টের প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। এটি দান-সদকা ও মানুষের সেবায় উৎসাহিত করে।

❍ **৫. আখলাক বা চরিত্রের সংশোধন:** রোজা অবস্থায় মিথ্যা বলা, গিবত করা বা ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা বাধ্যতামূলক।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী কাজ বর্জন করেনি, তার পানাহার বর্জন করাতে আল্লাহর কোনও প্রয়োজন নেই।" [সহিহ বুখারী: ১৯০৩]

❍ **৬. শারীরিক সুস্থতা:**
চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার ফলে শরীরের পরিপাকতন্ত্র বিশ্রাম পায় এবং শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যায়, যা সুস্থতার জন্য সহায়ক। এ ছাড়াও অনেক উপকার আছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"আর তোমাদের রোজা রাখাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পারো।" [সূরা বাকারা: ১৮৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদ্ধতির আলোকে সিয়াম পালনের তওফিক দান করুন এবং তা কবুল করুন। আমিন।

লেখক:

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানি, দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ অ্যাসোসিয়েশন, সৌদি আরব

https://www.facebook.com/groups/abdullahilhadiqusetionanswer/posts/1557378158698894/

অনুশীলনী- ০৬ঃ মার্চ- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা আলাক- (১-৫ নং আয়াত),

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ১. ইক্বরা বিছমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ২. খালাকাল ইংছা-না মিন'আলাক

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ৩. ই ক্বরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ৪. আল্লাযী 'আল্লামা বিলা ক্বালাম

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ৫. 'আল্লামাল ইনছা-না মা-লাম ইয়া'লাম

সূরা আল-আলাক্বের প্রথম ৫টি আয়াত (অনুবাদ):

১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে

৩. পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক পরম দয়ালু।
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।

এক নজরেঃ নামঃ আল আলাক্ব, প্রথম নযিলকৃত সুরা, আয়াত সংখ্যা ১৯, মক্কায় অবতীর্ণ

নামকরণঃ সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ

এই সূরাটির দু'টি অংশ । প্রথম অংশটি (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে (عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি (كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ) থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারেও উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ ,বুখারী ,মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য । এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা) ,আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে ,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে ।তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন , মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন । এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা গুহায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন, হযরত আয়েশা রা. তাহানুস (طحنوش) শব্দ ব্যবহার করেছেন । ইমাম যুহরী তা'আব্বুদ (طعبد) বা ইবাদাত - বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন । এখানে তিনি কোন ধরনের ইবাদাত করতেন ? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতে পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি) ঘর থেকে খাবার - দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন ।তারপর হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন । তিনি আবার কয়েক দিনের খাবার সামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন । একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন । হঠাৎ তাঁর ওপর ওহী নাযিল হলো । ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন :" পড়ো "এর পর হযরত আয়েশা (রা) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :আমি বললাম , "আমি তো পড়তে জানি না। "একথায় ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে

ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেল্লাম । তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন , "পড়ো " আমি বলালাম "আমি তো ,পড়তে জানি না। "তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো।তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো আমি আবার বলালাম ,"আমি তো পড়া জানি না" । তিনি তৃতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো ।তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ), (পড় নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখানে থেকে (لَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - যা সে জানতো না) পর্যন্ত । হযরত আয়েশা (রা) বলেন ,এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন । তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে এসে বললেন, আমার গায়ে কিছু (চাঁদর - কম্বল) জড়িয়ে দাও ! আমার গায়ে কিছু (চাঁদর - কম্বল) জড়িয়ে দাও ! তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো।তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভাব দূর গেলে তিনি বললেন :"হে খাদীজা ! আমার কি হয়ে গেলো ? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন ,আমান নিজের জানের ভয় হচ্ছে। "হযরত খাদীজা বললেন : "মোটেই না ।বরং খুশী হয়ে যান।আল্লাহর কসম !আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমাণিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন । সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে ,আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন , অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন । নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।"তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন।

ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই । জাহেলী যুগে তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন ভাইজান !আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (রা)বললেন :"ভাতিজা !তুমি কি দেখেছো ?"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করছেন । ওয়ারাকা বললেন : "ইনি সেই নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ) ওপর নাযিল করেছিলেন । হায় ,যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম ! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে ।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :"এরা আমাকে বের করে দেবে ?"ওয়ারাকা বললেন :"হাঁ, কখনো এমনটি হয়নি ,আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি । যদি আমি আপনার সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো ।"কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন। এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মূহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাংক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে , একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা।এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে ।এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত

নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি ,আমরা তো আগেই আশংকা করেছিলাম আপনি কোন একটি কিছু হওয়ার দাবী করবেন ,কারণ আপনি বেশ কিছু কাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায় ।হযরত খাদীজা (রা) কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছির পঞ্চান্ন বছর ।পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন ।স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে হেরা গুহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করে নেন যে , যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) জীবন দেখে আসছিলেন , তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো গভীরভাবে অবগত ছিলেন । তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন , ইনি সেই একই " নামূস " যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় তাঁর মতেও মুহাম্মাদ (সা) এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে , তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁর হুমকি দিয়ে

ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে , ঠিক সে সময় এই সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায় , নবী হবার পর প্রাকশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারনে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে , তিনি কোন নতুন দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু জেহেল জাহেলী শিরা - উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে । এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্কৃতি উল্লেখিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন : আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে , " মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রাখছে ? লোকেরা জবাব দেয় , " হাঁ "। একথায় সে বলল , " লাত ও উয্যার কসম , যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো। " তারপর একদিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্ত হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে । তাকে জিজ্ঞেস করা হয় , তোমার কি হয়েছে ? সে বলে , আমার ও তার মঝাখানে আগুনের একটি পরিখা , একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , সে যদি আমার ধারে কাছে ঘেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (*আহমদ , মুসলিম , নাসায়ী ,*

ইবনে জারীর , ইবনে আবী হাতেম , ইবনুল মুনযির , ইবনে মারদুইয়া , আবু নাঈম ইসফাহানী ও বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : আবু জেহেল বলে , যদি আমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন , যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে। (*বুখারী , তিরমিযী , নাসায়ী , ইবনে জারীর , আবদুর রাজ্জাক , আবদ ইবনে হুমাইদ , ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)*

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন , আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো , হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি ? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো । জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো , হে মুহাম্মাদ ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো ? আল্লাহর কসম ! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । (*আহমাদ , তিরমিযী , নাসায়ী , ইবনে জারীর , ইবনে আবী শাইবা , ইবনুল মুনযির , তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)*

এ ঘটনাবলীর কারণে كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ থেকে সূরা যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

দরস

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

১) পড়ো (হে নবী) , তোমার রবের নামে ৷যিনি সৃষ্টি করেছেন৷

১. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি , ফেরেশতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জবাবে দিলেন , আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায় ,ফেরেশতা অহীর এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে সেগুলো পড়তে বলেছিলেন । কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো , আমি বলতে থাকি এবং আপনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলা তাঁর প্রয়োজন হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায় , বিসমিল্লাহ বলো এবং পড়ো। এ থেকে একথাও জানা যায় যে , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে , তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন। " কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্ব - জাহান এবং বিশ্ব - জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

২) জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণ ভাবে বিশ্ব - জাহানের সৃষ্টি কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে , মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আলাক (عَلَقٍ) হচ্ছে আলাকাহ (عالاقه) শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত । গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশতের আকৃতি ধারণ করে । এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন , সূরা আল হজ্জ ৫ আয়াত , ৫ থেকে ৭ টীকা)

﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾

৩) পড়ো , এবং তোমার রব বড় মেহেরবান ,

.

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীণতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টি সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি , কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার , উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনায় সাহায্যে মানুষকে

কসম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংগু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

৫) মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকে সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটি এভাবে বলা হয়েছে :

وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ "আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না। " (আল বাকারাহ ২৫৫)

যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্বিক আবিস্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে দিয়েছে। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে , আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞাতটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে , তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি

তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদদাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, নবুওয়াত লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে।

(আরো ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমূল কুরআন আল মুদদাসসিরের ভূমিকা)।

সূরা আল-আলাক-এর প্রথম ৫টি আয়াত পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত বাণী, যা শিক্ষার গুরুত্ব, স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকা এবং মানুষের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে আলোকপাত করে. এ আয়াতে আল্লাহর নামে পাঠ করা, সৃষ্টির জ্ঞানার্জন এবং কলমের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে.

সূরা আল-আলাক (১-৫) এর শিক্ষাঃ

১. পাঠ বা শিক্ষার গুরুত্বঃ "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন" (আয়াত ১)। এর মাধ্যমে জ্ঞানার্জন শুরু করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর নামে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। এটি প্রমাণ করে ইসলামে শিক্ষার ভিত্তি হলো স্রষ্টার পরিচয় ও তাঁর ওপর ঈমান।

২. মানুষের সৃষ্টি রহস্যঃ "সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে" (আয়াত ২)। মানুষ অত্যন্ত তুচ্ছ একটি অবস্থা (জমাট রক্ত বা 'আলাক') থেকে সৃষ্ট। এই সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান মানুষকে অহংকার ছেড়ে বিনয়ী হতে শেখায় এবং স্রষ্টার ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়।

৩. জ্ঞানের আধার মহান রবঃ "পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহামহিমান্বিত" (আয়াত ৩)। তিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন এবং অজানাকে জানিয়েছেন।

৪. জ্ঞানের মাধ্যম ও বিস্তারঃ "যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন" (আয়াত ৪)। জ্ঞান লিখে রাখা এবং তা বিস্তারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম

হিসেবে 'কলম' বা লিখন পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৫. মানুষের সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞান: "শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না" (আয়াত ৫)। মানুষের নিজস্ব কোনো জ্ঞান নেই; যা কিছু জ্ঞান অর্জিত হয়, তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে বা শিক্ষাতেই সম্ভব।

মূল শিক্ষা:

এই আয়াতগুলো মানুষের জীবনের লক্ষ্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও ইসলামের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বই: ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)

এটি ১৯৪০ সনের বক্তৃতা, জামায়াতে ইসলামী তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
[বইয়ের মুল নাম: ইসলামী হুকুমাত কিসতারাহ কায়েম হোতি হ্যায়]

ভূমিকাঃ

ইসলামী বিপ্লবের পথ বইটির মূল কথা হল 'ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে' এই লক্ষ্যে বইটির লেখক মরহুম মাওলানা মওদুদী (রঃ) ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে এ সম্পর্কে এক অনুপম বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যের শিরোনাম ছিল *'ইসলামী হুকুমাত কিসতারাহ কায়েম হোতি হ্যায়'* এর অর্থ হল ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূল আলোচনা:

বইটির মূল আলোচনাকে **৮টি** অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা.

১. ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়

২. রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন

৩. আদর্শিক রাষ্ট্র
৪. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র।
৫. ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি বা পন্থা
৬. অবাস্তব কল্পনা বা ধারনা
৭. ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
৮. সংযোজন

ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ

১. বর্তমানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' নাম শিশুদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে।
২. যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা এটা জানেন না কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং জানার চেষ্টাও করেন না।
৩. যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা যে প্রস্তাব দেয় মোটর সাইকেলে যেমন আমেরিকায় পৌঁছানো সম্ভব নয় তেমনি তাদের প্রস্তাবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তনঃ

"কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না।"
১. একজায়গা থেকে তৈরি করে এনে অন্য জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
২. কোন একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে।
৩. সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে জন্মলাভ করে ইসলামী রাষ্ট্র।
৪. সামাজিক উদ্যম, উদ্দীপনা, ঝোঁক-প্রবণতা প্রভৃতি নিবিড় সম্পর্ক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত।
৫. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন।
৬. সামাজিক কার্যক্রম ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
৭. দীর্ঘ প্রানান্তকর চেষ্টা (যেমন বীজ হতে ফল)।

আদর্শিক রাষ্ট্রঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

(ক) ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র।

(খ) সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রভাবমুক্ত।

২. ফরাসী বিপ্লবের আদর্শিক রাষ্ট্রের ক্ষীণ রশ্মি দেখা গেলেও জাতীয়তাবাদের প্রভাবে চাপা পড়ে তা বিলুপ্ত হয়।

(ক) রাশিয়ার কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও অতিসত্ত্বর তা আদর্শচ্যুত হয়।

(খ) মুসলিম দেশের কতৃত্বশীল লোকেরা জাতীয়তাবাদের আখড়ায় পড়ে ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা হারিয়ে ফেলেছে।

৩. আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের প্রয়োজনঃ

ক) ভিত্তি স্থাপন হতে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত প্রায় অস্তিত্ব রক্ষা করা। উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি করা।

খ) জাতীয়তাবাদী চিন্তা-পদ্ধতি সংগঠন প্রণালী পরিহার করা।

৪. আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের লক্ষ্যেঃ

ক) জাতি-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে এর আদর্শ পেশ করা।

খ) সেই আদর্শ অনুযায়ী সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করে কল্যাণ সাধন।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্রঃ

(ক) ইহার বৈশিষ্ট্যঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ

২. নিখিল বিশ্ব জগৎ আল্লাহতাআলার রাজ্য। তিনি ইহার প্রভূ, শাসক ও বিধানদাতা।

৩. মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি।

৪. খেলাফতের এই দায়িত্বের জন্য প্রত্যেককেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

(খ) ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপঃ

১. এটা ধর্মহীন রাষ্ট্র হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

২. এটা পরিচালনার জন্য এক বিশেষ মনোবৃত্তি বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ ধরনের নির্ধারন আবশ্যক।

৩. ধর্মহীন রাষ্ট্রের জজ ও প্রধান বিচার প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের কেরানী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের জন্য খোদাভীতি, নিজ কর্তব্য পালন ও সেজন্য আল্লাহরকাছে জবাব দিহির তীব্র অনুভূতি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকের প্রয়োজন।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা কারীদের বৈশিষ্ট্যঃ

১. পৃথিবীর বিপুল পরিমান সম্পত্তি হস্তগত থাকলেও তারা তার পূর্ণ আমানতদার।
২. রাজশক্তি করায়ত্ত হলেও সুখ নিদ্রা ত্যাগ করে জনস্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণ।
৩. যুদ্ধে বিজয়ী দেশে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে তাদের ইজ্জত আব্রুর হেফাজতকারী।
৪. নিজেদের স্বার্থকে ধুলিস্যাৎ করে অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।
৫. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এমন মর্যাদার অধিকারী হবে যে, তাদের সততা, সত্যবাদীতা, ন্যায়পরয়নতা, নৈতিক ও চারিত্রিক, মূল নীতির অনুসরণ এবং প্রতিশ্রুতিও চুক্তি পালনের ব্যাপারে গোটা বিশ্ব তাদের উপর আস্থাশীল হবে।

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি বা পন্থাঃ

ক. ইসলামী রাষ্ট্রের অলৌকিক আবির্ভাব ঘটনা

খ. ইসলামী জীবন দর্শন চরিত্র ও প্রকৃতির বিশেষ মাপকাঠি অনুযায়ী গঠিত ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করা। নেতা ও কর্মীদের এই বিশিষ্ট আদর্শে আত্মগঠন করা।

গ. সমাজ জীবনে অনুরূপ মনোবৃত্ত ও নৈতিক উদ্দীপনা জাগ্রত করা।
ঘ. ইসলামী আদর্শে নাগরিকদের গড়ে তুলতে একটি অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা।
ঙ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা ও কাজ করতে সক্ষম এমন লোক গড়ে তোলা।
চ. ইসলামী আদর্শের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
ছ. ইসলামী আন্দোলন চতুপার্শ্বে যাবতীয় অবাঞ্চিত জীবন-ধারার বিরূদ্ধে প্রকাশ্যে সংগ্রাম করবে।

২. ইহাতে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া যাবেঃ
ক. পরীক্ষার অগ্নিদহনে উত্তীর্ণ ত্যাগী লোক তৈরি হবে।
খ. এ আন্দোলনে এমনসব লোক পর্যায়ক্রমে যোগদান করবে যাদের প্রকৃতিতে সত্য-ন্যায়ের উপাদান অন্তর্নিহিত রয়েছে।
গ. সর্বশেষে কাঙ্খিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

৩. যে কোন ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনঃ
ক. একটি বিশেষ ধরনের আন্দোলন।
খ. বিশেষ ধরনের সামাজিক চেতনা সম্পন্ন নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট। উদাহরণ, রুশ বিপ্লব, জার্মানির সমাজতন্ত্রের বিপ্লব ।

অবাস্তবকল্পনা বা ধারনাঃ

১. কিছু লোকের ধারণা মুসলিম জাতিকে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে একই পাটফর্মে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারলেই ইসলামী রাষ্ট্র আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত হবে।
২. মুসলমানদের বর্তমান নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার স্বরূপ যেমন- চরিত্রগত দিক থেকে দুনিয়ার মুসলিম ও অমুসলিম জাতিগুলোর সবগুলোর অবস্থা প্রায় একই। উদাহরণঃ আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে

দুর্নীতি, রোজার দিনে একই সাথে খাওয়া, সুদ, ঘুষ, জেনা ইত্যাদির সাথে লিপ্ত হওয়া।

ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা:

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কর্মপন্থাই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা। তার অনুসৃত বিশিষ্ট কর্মপন্থাগুলো নিম্নরূপ:

১. ইসলাম হলো সেই আন্দোলনের নাম যা মানব জীবনের গোটা ইমারত নির্মান করতে চায় এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

২. ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে নয়।

৩. মূল লক্ষ্য আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাওয়াত দেওয়া।

ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মনীতির চারটি দিক রয়েছেঃ

ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার আহবান।

খ) অগ্নী পরীক্ষায় নিখাঁদ প্রমানিত হওয়া।

গ) নেতা ছিলেন আদর্শের মডেল।

ঘ) আদর্শের কার্যকর স্বাভাবিক বিপব।

ক) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার আহবানঃ

১. বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী হয়ে থাকা তবে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তববাদীতার দাবী হলো সেই মহান সম্রাটের হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করে দাও তার একান্ত আনুগত্য দাস হয়ে যাও।

২. গোটা জাতির একজনই সম্রাট মালিক এবং সার্বভৌম কর্তা রয়েছেন। অন্য কারো কতৃত্ব করার কোন অধিকার নাই।

৩. আল্লাহ ছাড়া আমি সকলের বিরূদ্ধে বিদ্রোহী এবং যারা আল্লাহকে মানে তারা ব্যতিত

৪. এই ঘোষণা উচ্চারণ করার সাথে সাথে বিশ্ববাসী আপনার শত্রুহবে এবং চতুর্দিক থেকে সাপ, বিচ্ছু আর হিংস্র পশুরা আপনাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করছে।

খ) অগ্নি পরীক্ষায় নিখাঁদ প্রমাণিত হওসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে পোপ (খৃস্টান) ঠাঁকুরদের সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলো এগুলো গঠন করে হলো ঐক্যজোট।

২. তাদের উপর নেমে আসে কঠিন অত্যাচার এবং এর ফলেই ইসলামী আন্দোলন মজবুত হয় এবং ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করে।

৩. এর ফলেই সমাজের মনি-মুক্তাগুলো আন্দোলনে শরিক হয়।

৪. একদিকে এই বিপ্লবী কাফেলায় যারা শরিক হচ্ছিল বাস্তবে ময়দানে তাদের হতে থাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ।

৫. কিছু লোক দিনের পর দিন মার খাচ্ছে এ দেখে কিছু মানুষ উৎসাহী হয় এরা কি কারণে মার খাচ্ছে।

গ) নেতা ছিলেন আদর্শের মডেলঃ

১. বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের সেই মহান নেতার নেতৃত্ব আদর্শ, সহানুভূতি এবং সার্বিকভাবে তার মডেলকে অনুসরণ করা একান্ত দরকার।

২. এই নেতার স্ত্রী ছিলেন বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক।

৩. কালিমার দাওয়াত কবুল ও মানুষকে এ দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে তাদের সম্পদ শেষ হয়ে যায়।

৪. নেতা ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহনশীল।

৫. সমকালীন সময়ে তাকে ইসলামী আন্দোলনের কাজ না করার প্রতিফল হিসাবে আরব জাহানের বাদশাহী এবং আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী দিতে চেয়ে ছিল। কিন্তু তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন এবং তিরস্কার আর প্রস্তাব্যগত সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন।

৬. অত্যন্ত গরমের সময় মরুভূমির মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন সাথীদের সাথে নিয়ে।

৭. হাশেমী গোত্রের লোকেরা এই আন্দোলনের প্রতি অনীহা ছিল।

ঘ) আদর্শের কার্যকর স্বাভাবিক বিপ্লবঃ

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একদল লোককে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করা হয়েছিল যারা ইসলামের পূর্ণ প্রশিক্ষণ পেয়ে এতটা যোগ্য হয়েছিল যে তারা যেকোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিল। উদাহরণ, মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র।
একথা সত্য যে, একাজের জন্য প্রয়োজন ঈমান, ইসলামী চেতনা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মজবুত ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিগত আবেগ, উচ্ছাস ও স্বার্থের নিঃশর্ত কুরবাণী।

একাজের জন্য এমন একদল দুঃসাহসী যুবকের প্রয়োজন যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার উপর পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাকবে। অন্যকোন দিকে তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ হবে না। পৃথিবীতে যা-ই ঘটুকনা কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না।

দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত আল ইমরান-১০৪, ইউসূফ-১০৮, আন নাহল-১২৫, হামীম আস সাজদাহ-৩৩, মায়েদা-৬৭ দেখুন পৃষ্ঠা ১১২
দাওয়াত সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, দেখুন পৃষ্ঠা ১১৪
মাসয়ালাঃ সিয়াম সংক্রান্ত। দেখুন পৃষ্ঠা ১২২

অনুশীলনী- ০৭ঃ এপ্রিল- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত)

বিষয়ঃ ইসলামী আন্দোলন তথা, বায়আতের গুরুত্ব

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي

التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ

اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

আয়াতের অনুবাদঃ

(১১১) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে । তাদের প্রতি তাওরাত, ইন্‌জিল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশী ওয়াদা পূরণকারী কে আছে ? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

(১১২) তারা আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাগমনকারী, তার ইবাদত কারী, তার প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তার সামনে রুকু কারী ও সেজদা কারী, সৎ কাজের আদেশ কারী, অসৎ কাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমা সংরক্ষনকারী (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনা বেচার সওদা করে)। আর হে নবী! এ মুমিনদেরকে সুখবর দাও!

সূরা আত্ তাওবার নাম করনঃ

এ সূরাটির দু'টি নামে পরিচিতঃ আত্ তাওবাহ ও আল বারাআত। তাওবা নাম করনের কারণঃ এ সূরার ১১৮ নং আয়াতে কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ মাফ করে তাওবা কবুল করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষনা করা হয়েছে বলে একে বারায়াত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণঃ

১.এটা যখন সংকলন করা হয় তখন সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়- কেহ কেহ বলেন এই সূরা আনফালের অংশ অথবা কেহ কেহ বলেন- আলাদা সূরা।

২.বিসমিল্লাহ্ হলো রহমত কামনা ও নিরাপত্তার জন্য, আর এ সূরার মধ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছে, তাই বিসমিল্লাহ্ লেখা হয়নি।

৩.ইমাম কায়েশী বলেন- জিব্রাঈল (আ.) এই সূরা নাযিলের সময় বিসমিল্লাহ নিয়ে আসেন নাই তাই।

৪.ইমাম রাযী বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখেন নি, কাজেই সাহাবা কেরাম ও লেখেন নি এবং পরবর্তী লোকেরা ও এ রীতি অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র কুরআন যে নবী থেকে হুবুহু ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহন করা হয়েছিল এবং যে ভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষন করার জন্য যে সর্বোচ্ছ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এটি তার একটি প্রমাণ।

সূরা আত্ তাওবা নাযিলের সময়কালঃ

এ সূরা ৩টি ভাষনে নাযিল হয়।-

প্রথম ভাষণ: ২য় হতে ৫ম রুকুর শেষ পর্যন্ত। এ অংশ ৯ম হিজরীর যিলক্বদ মাসে নাযিল হয়।

২য় ভাষণ: ৬ষ্ঠ রুকু থেকে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত, ৯ম হিজরীর রজব মাসে নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ: ১০ম রুকু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে অবতীর্ণ হয়।

সূরা আত্ তাওবার বিষয়বস্তু:

* বিধর্মীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে (২য় রুকু)।

* তাবুক যুদ্ধের অভিযান (৬ষ্ঠ-১০ম রুকু)।

* মুনাফিকদের পরিণাম ও পরলৌকিক শাস্তি।(৪২-৪৩,৪৭-৫৯,৬১-৬৮,৭৪-৯০,৯৩-৯৮,১০১,১০৭-১১০,১২৪ ও ১২৭ আয়াত)

* মসজিদে জেরার নির্মাণের পরিণাম ও উহা ধ্বংস করার নির্দেশ (১০৮ নং আয়াত)।

* শহীদের মর্যাদা, মাহাত্ম সৎপথে অর্থ ব্যয় এর পরিণাম (১৪তম রুকু)।

আলোচ্য আয়াতগুলোর শানে নুযুল: অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশগ্রহনকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়'আত নেয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই এই সূরাটি মাদানী হওয়া সত্ত্বে ও এ আয়াতগুলোকে মাক্কী বলা হয়েছে।

আকাবা: "এখানে আকাবা বলতে বোঝায় মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে"। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বায়আত নেয়া হয়।

* ২য় দফা নেয়া হয় নবুয়তের একাদশ বছরে, তখন মোট ৬ জন লোক ইসলাম গ্রহন করে মদীনায় ফিরে যায়। এত মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম -এর চর্চা শুরু হয়।

* ২য় দফায় পরবর্তী বছর হজ্জ্বের মৌসুমে পূর্বের ৫ জন সহ মোট ১২ জন নবী করিম এর হাতে বায়আত গ্রহন করে। আর এভাবে মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে থাকে (৪০ জনের ও বেশী)। ফলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নবী করিম   হযরত মোসআব বিন উমাইর (রা:) কে কোরআন তালিমের জন্য প্রেরণ করেন।

* ৪র্থ দফায় নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর ৭০ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সহ ৪র্থ ও সর্বশেষ বায়আত এ আকাবায় অনুষ্ঠিত হয়। ‘সাধারণত একেই বায়’আতে আকাবা বলা হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যা :

১১১ নং আয়াত-

* **১১১** নং আয়াতটি-ই জিহাদ সংক্রান্ত ২য় আয়াত। কারন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থান কালে এ পর্যন্ত জিহাদ সংক্রান্ত কোন হুকুম নাযিল হয়নি।

* জিহাদ অর্থ :- প্রচেষ্টা চালানো।

* জিহাদের স্তর : ৫ টি-

১. দাওয়াত ইলাল্লাহ।

২. শাহাদাৎ আলান্ নাস।

৩. কিতাল ফি-সাবিলিল্লাহ।

৪. আমল বিল মা'রুফ নাহি আনিল মুনকার।

৫. ইক্বামতে দ্বীন।

যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِبِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْتَعْلَمُونَ

“তোমরা আল্লাহ ও রাসুল এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন বাজি রেখে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝতে পার”। (আস্ সফ-১১)

জিহাদের সফলতাঃ

*** আখেরাতের সফলতাঃ** আল্লাহ বলেন-

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَابِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْفَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“(এ সব লোকদের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর পথে লড়াই করা সে সব লোকদেরই কর্তব্য, যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে, অচিরেই তাকে আমি বিরাট পুরষ্কার দান করব”।(সূরা আন নিসা ৭৪)

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاالْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ

“আল্লাহ তোমাদের সব গুণাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদের এমন বাগানে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা”। (আছ্ ছফ-১২)

* তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করা হবে যার নেয়ামত সমূহ অশেষ ও চিরন্তন।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِي

এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। (আছ্ ছফ:-১৩)

শহীদের মর্যাদাঃ

* প্রথম রক্তপাতেই তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।
* জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হবে (কবরে)।
* কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।
* 'কবরে' বড় বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।
* হাশরের ময়দানে তার মাথায় একটা আকর্ষনীয় মূকুট পড়ানো হবে।
* তাকে তার ৭০ জন আত্মীয়ের শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে।

বাইয়াতঃ আভিধানিক অর্থ- ক্রয়- বিক্রয়, লেন-দেন, চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, অঙ্গীকার, নেতৃত্ব মেনে নেয়া। একে ইংরেজীতে বলা হয়- To sell, To bye, To make a contract, Agreement, Arrangenment, Business deal. পরিভাষায়- "আল্লাহর সন্তুষ্টি অজর্নের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সপে দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত"।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাই'আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তবে তারই উপর এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন। ফাতহ-১০

لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়'আত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন নিকট আসন্ন বিজয়। ফাতহ-১৮

বাইয়াতের ব্যাপক অর্থ-

* **আল্লাহর সাথে জান মালের চুক্তি।**

-আত্ তাওবা:১১

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অতঃপর তারা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

* **আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশে শপথ। -**
সকল ধরনের হারাম বা নিষেধকৃত কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চুক্তি। মুমতাহিনা: ১২

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

- হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাই'আত করে এ মর্মে প্রতশ্রিুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাইয়াতের গুরুত্ব:
সংশ্লিষ্টতা: * নফ্স বা প্রবৃত্তি। * ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। * ইবলিশ।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ

(১৮২৬) আবূ যার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) গেল, সে আসলে তার ঘাড় থেকে ইসলামের গল রশিকে খুলে ফেলল।"** (অর্থাৎ, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেল।) (আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ৮৯২, ১০৫৩ , আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

বাইয়াতের ফজিলত: আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন এবং দুনিয়ার জীবনের চেয়ে পরকালের জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য।

فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার। **সূরা নিসা-৭৪**

*** আল্লাহর মাগফিরাত।**

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِي

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আল ইমরান- ১৩৩,

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

(২১) তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। হাদীদ-২১

*** সর্বোচ্চ ঈমানের অধিকারী হওয়া।**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না। (আল ইমরান-১০২)

*** পরকালীন নিশ্চিত সফলতার গ্যারান্টি।**

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ- নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সুরা আল আ'লা- ১৪,

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا - সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে, আস-শামস্-৯

*** জাহান্নামের আগুন থেকে বাচার জন্য।**

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য- যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে, আস্ সফ-৯-

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا - সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে, আস-শামস্-৯

বাইয়াত কার নিকট করতে হবে:

* আল্লাহর নিকট।

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট।

* রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবর্তমানে ইসলামী সংগঠনের নিকট।

বাইয়াতের অবস্থা:

* ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে সাহাবীরা রাসূল এর হাতে বাবলা গাছের নীচে হযরত ওসমান (রা:) হত্যার সংবাদে যে বাইয়াত গ্রহন করেন, তাকে বাইয়াতুল রিদওয়ান বলে।

* রাসূল এর ইন্তেকালের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের হাতে মুসলিম মিল্লাতের বাইয়াত গ্রহন মুসলিম জাতির জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত।

বাইয়াত পরিহার করার পরিণাম:

*** পরকালে পীড়াদায়ক শাস্তি।**

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولاً

আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা* ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বনী ইসরাঈল-৩৪

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

আর তোমরা যখন অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃত পক্ষে তোমরা নিজদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর। আন্ নাহল-৯১

*** জাহেলিয়াতের মৃত্যু।**

রাসূল   বলেছেন- “যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ

آتِكَ لأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "

৪৬৪০। উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আম্বরী (রহঃ) ... নাফি (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনু মুতী (রাঃ) এর নিকট এলেন যখন হারবা-র দুঃখময় ঘটনা ঘটেছিল। যুগটা ছিল ইয়াযিদ ইবনু মুআবিয়ার যুগ। তখন তিনি (ইবনু মুতী) বললেন, আবূ আবদুর রহমানের জন্য বিছানা পেতে দাও। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে বসতে আসিনি, এসেছি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যে হাদীস শুনেছি তা তোমাকে শুনাতে। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, **যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিন দলিল বিহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন শিকল নেই তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।** (মুসলিম)

*** কিয়ামতের ময়দানে অপমানজনক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করবেন।**

সূরা আত্‌ তাওবার **১১১** নং আয়াতে মৌলিকভাবে তিনটি কথা উল্লেখ যোগ্য। সেগুলো হল-

প্রথমত: আল্লাহর সাথে মুমিনদের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি।

দ্বিতীয়তঃ চুক্তি সম্পাদন করা মুমিনদের কাজ। আর সেটা হচ্ছে- জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। যার ধরন হলো মারবে ও মরবে।
(সূরা তাওবা-৪১, আন নিসা-৭১ নং আয়াত)
তৃতীয়তঃ মুমিনগণ আল্লাহর সাথে যে বাইয়াত বা চুক্তি সম্পাদন করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ এজন্যই যে, আল্লাহর এ জান্নাতের ওয়াদা সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত। আর আল্লাহর চাইতে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কেউ নেই।

১১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যাঃ-
১১২ নং আয়াতে বাইয়াত গ্রহনকারী মুমিনদের **৮** টি গুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ২য় সাতটি গুণের সংক্ষিপ্ত সার হলো ৮ম গুণ।
* **আত্ তা'য়িবুনা** - তাওবাকারীগণ। অর্থাৎ যারা অপরাধ করার পর অনুতপ্ত হয়ে কৃত অপরাদের ক্ষমা চেয়ে তা আর না করার ওয়াদা করে।
(সূরা আল ইমরান- ৯০,১৩৫; নিসা- ১৭,১১০; আন আম- ৫৪; আরাফ-১৫৩;মুমিন-৩; আস্‌শুরা- ২৫; নাহল-১১৯;)
* **আল আবিদুনা** - ইবাদতকারীগণ।
* **আল হামিদুনা** - প্রশংসাকারীগণ, শুকরিয়াকারীগণ। অর্থাৎ যারা বিপদে-মুসিবতে, সুখে-দুখে, সবসময় আল্লাহর পশংসা করে। সূরা নসর-৩
* **আছ্ ছা'য়িহুনা** - পরিভ্রমণকারীগণ। কারো কারো মতে রোজা পালনকারীগণ। এখানে ইসলামের জন্য, জিহাদের জন্য ও হালাল রুজির জন্য ভ্রমন ও হতে পারে। ইসলাম পূর্ব যুগে খ্রীস্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা পালনকে এর স্থলাভিসিক্ত করা হয়েছে। কারন দেশ ভ্রমনের উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ।

অথচ রোযা এমন এক এবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এর ভিত্তিতে কতিপয় বর্ণনাকরী জিহাদকে ও দেশ ভ্রমনের অনুরুপ বলা হয়। রাসূল বলেছেন- আমার উম্মতের দেশ ভ্রমণ হলো জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। (ইবনে মাজা ও বায়হাকী)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত **'সা'য়িহুন'** অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরামা (রা:) এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো দ্বীনের শিক্ষার্থী, যারা এলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের পয়ে পড়ে।
* **আঁরা'কিয়ূনাস্ সাজিদুনা** - রুকুকারী ও সিজদাকারীগণ। অর্থাৎ যারা নামাজ কায়েম করে। যেমন- সূরা হজ্জ: ৭৭, লোকমান: ১৭, আন কাবুত: ৪৫।
* **আল আ'মীরুনা বিল মা'রুফ** - সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ কারী।
* **আন্ নাহু না আনীল মুনকার** - মন্দ ও খারাপ কাজের বাধাদান কারী।
* **আল হাফিজুনা লি-হুদুদিল্লাহ** - আল্লাহর সীমা হিফাজত কারী, সংরক্ষনকারীগণ, আল্লাহর নিষেধ যথাযথভাবে পালনকারীগণ।
---- প্রথম সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসিল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার কথা হলো এ যে - এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহর নির্ধারিত তথা শরীয়তর হুকুমের অনুগত ও হেফাজতকারী।

শিক্ষনীয় দিকঃ

১. আল্লাহর তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।

২. আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে, মরলে শহীদ বাচলে গাজী।

৩. জিহাদের বিনিময়ে জান্নাত এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা।

৪. আল্লাহর পথে জিহাদ করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় সফলতা লাভ করা যায়।

৫. মুমিনদের জীবনের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত আল্লাহর পথে জিহাদ।

৬. মুমিনের যে গুণগুলোর কথা বলা হয়েছে এগুলো পুরোপুরি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

বইঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্পর্ক

খুররম জাহ্ মুরাদ

☆ লেখক পরিচিতি:

- নাম : ইঞ্জিনিয়ার খুররম জাহ্ মুরাদ
- পিতার নাম : মঞ্জুর আলী মুরাদ
- মাতার নাম : বেগম আনতুল হাই
- ১৯৩২ সালের ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে
- MED ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, করাচী থেকে গ্রাজুয়েশন
- যুক্তরাষ্ট্রের ভিনেটা ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন
- ইসলামী জমিয়তে তালাবা, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন
- ১৯৫৭ সালে অঈউ (Associate Council Engineer) এর এমডি হিসেবে পুর্ব পাকিস্থানে (বাংলাদেশে) আসেন
- ১৯৬০-৭০ পর্যন্ত তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন
- ১৯৭০ সালে লন্ডনের দাওয়াতুল ইসলাম ট্রাস্টে যোগদান করেন
- কাবা শরীফের সম্প্রসারণ কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং তার নামে কাবা শরীফে ***বাবে খুররম মুরাদ*** নামে একটি দরজা আছে

- ১৯৯৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

☆ প্রাথমিক কথাঃ

ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, প্রাক ইসলামী যুগে মানুষে মানুষে কোন ভাতৃত্বের বন্ধন ছিলনা। বিভিন্ন গোত্র, দল, খান্দানে বিভক্ত ছিল। ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু ও জানমাল ইজ্জতের দুশমন। এমতবস্থায় শত্রুতা ভুলে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের মহান শিক্ষা দিয়েছিল হযরত মুহাম্মদ ।
যার প্রভাবে সর্বকালের সবচেয়ে বিশৃঙ্খল জাতি সর্বশ্রেষ্ট জাতিতে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল একটি আদর্শ রাষ্ট্র, আর তা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সুতরাং বলা যায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এমন একটি ঔষধ তথা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ অতীব প্রয়োজন।

☆ মৌলিক আলোচনাঃ

প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তিনটি

১. প্রয়োজনীয় গুনাবলী ২. ধ্বংস ও দুর্বলকারী উপাদান এবং তা থেকে বাঁচার উপায় ৩. যে সমস্ত গুণাবলী সম্পর্ককে মজবুত ও উন্নত করে

☆ বইটির ৪টি ভাগে রয়েছেঃ

১. পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি, তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
২. চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য
৩. সম্পর্ককে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার উপায়
৪. সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার পন্থা।

১. পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১.১. *সম্পর্কের ভিত্তি ও মর্যাদা*

(ক) সম্পর্কের প্রকৃতি

(খ) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সম্পর্ক একটি আদর্শিক সম্পর্ক এটা কোন হালকা বা ঠুনকো সম্পর্ক নয়। গভীর ও প্রগার ভালবাসা এবং স্থিতিশীলতার সমন্বয়ে রচিত।

১.২. *ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অপরিহার্য দাবি*

(ক) পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গোটা জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এজন্য ঈমান মুমিনদেরকে সকল মানুষদের সাথে সাধারণ ভাবে এবং পরস্পরের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেয়।

(খ) আর এ সম্পর্ককে আদল ও ইহসানের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেয়।

১.৩. *বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের জন্য ভ্রাতৃত্ব অপরিহার্য*

(ক) ঈমানের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি

(খ) বিপ্লবের জন্য একটি সুদৃঢ়, স্থিতিশীল ও ভ্রাতৃত্বসূলভ সম্পর্ক অপরিহার্য।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সম্পর্কের প্রকৃতি হবে শীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়।

১.৪. ভ্রাতৃত্বের দাবি তার গুরুত্ব ও ফলাফল

(ক) ভ্রাতৃত্বের দাবি হচ্ছে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, রহমত ও ভালবাসার সম্পর্ক

(খ) ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব, রাসুলের বানী-“তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতোক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে” (মুসলিম-আবু হুরায়রা)

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভ্রাতৃত্বের ফলাফল- ঈমান পূর্ন হবে আখেরাতের সফলতা

১.৫. *আখিরাতে ভ্রাতৃত্বের সুফল*

(ক) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীরা আরশের ছায়াতলে থাকবেন

(খ) সম্পর্ক স্থাপন কারীদের জন্য নূরের মিম্বর তৈরি হবে।

১.৬. *পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব*

(ক) কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য এক ঈমানের ভিত্তিতে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন ইসলামী আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ন

(খ) পারস্পরিক সম্পর্কের বিকৃতি গোটা দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

২. চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

২.১. কল্যান কামনা- কল্যাণ কামনার প্রকৃতি মানদন্ড হচ্ছে যে, মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ পরস্পরকে ভালবাসবে এবং কল্যাণ কামনা করবে যে রুপ সহোদর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা হয়।

২.২. আত্মত্যাগ - একজন মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য শুধু নিজের পছন্দই করেনা বরং নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ নিজের প্রয়োজনকে মুলতবী রেখে অপরের প্রয়োজন মেটাবেন।

২.৩. আদল (সুবিচার)

ক) লোকদের অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা ও ভারসাম্য কজায় রাখা

খ) প্রত্যেকের অধিকার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

২.৪. ইহ্সান (সদাচরণ)

ক) ইহসান অর্থ হল সম্পর্কের সৌন্দর্য ও পূর্নতা দান করা।

খ) সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদল যদি অপ্রীতি ও তিক্ততা থেকে রক্ষা করে তবে ইহসান তাতে মাধুর্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

২.৫. রহমত

ক) রহমতের এ গুণই ব্যক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং সাধারণ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে।

খ) রাসুলের বানী- "যারা রহম করে, রহমান তাদের প্রতি রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো, যেন আসমানবাসী তোমাদের রহম করেন।"

২.৬. মার্জনা- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ পরস্পর একে অন্যের দোষত্রুটি মার্জনা করবে। কারণ যারা দুনিয়ার জীবনে ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা উচিৎ।

২.৭. নির্ভরতা- মোমিনগন একে অন্যের উপর যেন নির্ভর করতে পারে। অর্থাৎ তার সমস্ত গোপন বিষয়াদির ব্যাপারেও পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে প্রকাশ করতে পারে অন্যের কাছে। আর এটাই হল ভ্রাতৃত্বের দাবি।

২.৮. মূল্যোপলব্ধি - মানুষ তার এ সম্পর্কের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকু অবহিত হবে, যাতে করে এর সঠিক মূল্যটা সে উপলব্ধি করতে পারে। আর এটা তখনি সম্ভব হবে যখন সে কোন ক্রমেই তার এ সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত হবেনা।

৩. সম্পর্ককে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার উপায়

৩.১. অধিকারে হস্তক্ষেপ- একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে তার ভাইয়ের অধিকারের মধ্যে কোন একটি অধিকার ও হরণ করার অপরাধ যাতে সে অপরাধ না হয় তার প্রতিকারের দিকে দৃষ্টি রাখা। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোন

মুসলমানের হক নষ্ট করেছে, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তার প্রতি জাহান্নামকে অনিবার্য এবং জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

৩.২. দেহ ও প্রানের নিরাপত্তা- কোন মুসলিম ভাইয়ের দেহ প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একজন অন্যের জন্য সর্বদা প্রস্তত থাকবে। । রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তার সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে কুফরী।" (বুখারী, মুসলিম)

৩.৩. কটুভাষা ও গালাগাল - কোন ভাইকে সাক্ষাতে গালাগাল করা তার সঙ্গে কটু ভাষায় কথা বলা এবং ঠাট্রা বিদ্রুপ করা সম্পূর্ন নাজায়েজ। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোন কটুভাষি ও বদ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।"

৩.৪. গীবত - গীবত হচ্ছে মানুষ তার ভইয়ের সামনে নয় বরং তার পেছনে বসে নিন্দা করা।

৩.৫. চোগলখোরী - গীবতের একটি বিশেষ রূপ হল চোগলখোরী। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "চোগলখোর জান্নতে যাবেনা।"

৩.৬. শরমিন্দা করা .- আপন ভাইকে তার সাক্ষাতে বা অন্য লোকের সামনে তার দোষত্রুটি জন্য লজ্জা দেওয়া এবং এভাবে অবমাননা করা শরমিন্দার অন্তর্ভুক্ত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার গুনাহের জন্য লজ্জা দিল তার দ্বারা সেই গুনাহ কাজ না হওয়া পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবেনা।" রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "তাদেরকে কোন দোষ বা গুনাহের লক্ষ্য বানিয়ে শরমিন্দা ও অপমানিত করেনা।"

৩.৭. ছিদ্রান্বেষণ - কোন ভাইয়ের দোষত্রুটি খুজে বেড়ানোই ছিদ্রান্বেষণ করা। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়িয়োনা। কারণ, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন

দোষ ও গুনাহ খুঁজতে থাকে, আল্লাহ তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান, তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন-সে তার ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুক না কেন।"

৩.৮. উপহাস করা - ঠাট্টা বিদ্রুপের মাধ্যমে একে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় অপর কোনো সম্প্রদায়কে ঠাট্টা করোনা, সম্ভবতঃ সে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে। আর কোন নারী অপর কোন নারীকে ঠাট্টা করো না, সম্ভবত সে শ্রেষ্ঠ হবে তার চাইতে।" (সুরা হুজরাত ১১)

৩.৯. তুচ্ছ জ্ঞান করা .- অপর ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মারাত্মক গুনাহের কাজ। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে না অপমান করবে আর না তুচ্ছ জ্ঞান করবে।"

৩.১০. নিকৃষ্ট অনুমান .- প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া কোন মুসলমান যদি তার ভাই সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহ করে তবে তাহাই নিকৃষ্ট অনুমান। অনুমান করে কথা বলা গুনাহের কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে ঈমানদারগন, বহু অনুমান থেকে তোমরা বেঁচে থাকো, নিঃসন্দেহে কোন-কোন অনুমান হচ্ছে গুনাহ।" (সুরা হুজরাত ১২)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা অনুমান পরিহার করো, কেননা অনুমান হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা কথা।" (বুখারী,মুসলিম; আবু হুরায়রা রা.)

৩.১১. অপবাদ .- গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হল অপরের কাছে এক ভাই সম্পর্কে মিথ্যা বলা যে দোষ এর মধ্যে সে নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "যারা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে কষ্ট দেয়, তারা আপন মাথায় 'বুহ্তান' ও স্পষ্ট গুনাহ চাপিয়ে নিলো।" (সুরা আহযাব. ৫৮)

৩.১২. ক্ষতিসাধন .- মুমিনদের লক্ষ্য রাখা অতিব প্রয়োজন যে, তার দ্বারা যেন অন্যের ক্ষতি সাধন না হয়। হাদিসে ক্ষতি সাধন কারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে।

৩.১৩. মনোকষ্ট .- মুসলমানদের অবশ্যই চলা-ফেরা, কথা-বার্তায় সতর্ক থাকতে হবে যে, তার দ্বারা যেন কেউ মনোকষ্ট না পায়। কারণ এর দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হয়।

৩.১৪. ধোকাঁ দেওয়া .- কথা বার্তা বা লেনদেনে আপন ভাইকে ধোঁকা দেয়া বা মিছে কথাবলা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সব চাইতে বড় খিয়ানত হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ভাইকে কোনো কথা বললে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করলো; অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথা বললে।" (তিরমিযী; সুফিয়ান বিন আসাদ)

৩.১৫. হিংসা .- হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা এক ঘৃণ্য ব্যাধি। এই মারাত্মক ব্যাধির প্রভাবে লোকদের ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়ে। হিংসার মূলে কতগুলো জিনিস থাকে। যেমন বিদ্বেষ, শত্রুতা, ব্যক্তিগত অহমিকা, অপরের সর্ম্পকে হীনমন্যতা অপরকে অনুগত করার প্রেরনা ইত্যাদি। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক । কারন আগুন যেমন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, হিংসা ঠিক তেমনি নেকী ও পুণ্যকে খেয়ে ফেলে।"

৪. সর্ম্পককে দৃঢ়তর করার পন্থা

৪.১. মান ইজ্জতের নিরাপত্তা .- এক মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানের মান ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এটা সম্ভব হলে আন্তরিকতা গড়ে উঠে।

৪.২. দুঃখ কষ্টে অংশগ্রহণ .- মুমিণগন হচ্ছে একটি দেহ। দেহের এক অংশে যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়। তবে অন্য অংশ ও তেমন কষ্ট অনুভব করে। ঠিক তেমনি এক মুসলমান অপর মুসলমানের দুঃখ কষ্টে শরীক থাকবে।

৪.৩. সমালোচনা ও নসীহত .- নিজের একটি দোষ নিজের চোখে ধরা পড়েনা। তাই মুমিনগন একে অপরকে গঠন মুলক সমালোচনা ও নছিহতের মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে এক মুসলমান অপর মুসলমানের আয়না স্বরূপ।

৪.৪. মোলাকাত .- একথা সত্য যে পরস্পর অধিক সাক্ষাতের ফলেই এক জন মানুষের সাথে আরেক জন মানুষের বন্ধন টিকে থাকে। সুতারাং মোলাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪.৫. রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যা .- কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে তার সেবা শুশ্রুসার প্রয়োজন হয়। ফলে বন্ধুত্বের বন্ধন আরো দৃঢ হয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন "যখন সে রোগাক্রান্ত তাকে সেবা কর "।

৪.৬. আবেগের বহি.প্রকাশ .- কোন মানুষের মধ্যে কারো প্রতি প্রেম ভালবাসা থাকলে তা আবেগের মাধ্যমে বহি.প্রকাশ পাবে। এভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

৪.৭. প্রীতি ও খোশ-মেজাজের সাথে মুলাকাত .- পরিচ্ছন্ন মন দিয়ে সাক্ষাতে কথা বলার সময় মিষ্টি কথা বলার এবং ঠাট্রা বিদ্রুপ ও উপহাস থেকে দূরে থাকা। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নেক কাজের ভেতর কোনোটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদি তা আপন ভাইয়ের সাথে তোমার হাস্যোজ্জ্বল সাক্ষাৎ করার তূল্যও হবে।" (মুসলিম; আবু যর রা.)

৪.৮. সালাম .- পারস্পরিক সর্ম্পক বৃদ্ধিতে সালামের বিকল্প নেই। সালামের মাধ্যমে অন্ধকার দূরীভূত হয়। এজন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “পরস্পর সালাম বিনিময় কর।”

৪.৯. মুছাফাহা .- মুছাফাহা হলো পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের দ্বিতীয় মাধ্যম। অর্থাৎ সালামের গোটা ভাবধারাই এদ্বারা পূর্নতাপ্রাপ্ত হয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মুছাফাহার দ্বারা তোমাদের পারস্পরিক সালামের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে।” (তিরমিযী; আবু উমালাহু রা.)

৪.১০. উৎকৃষ্ট নামে ডাকা .- কাউকে তার পছন্দনীয় ভাষায় সম্বোধন করলে সে খুশী হয়। আন্তরিকতা চলে আসে। পক্ষান্তরে উপনামে বা বিকৃত নামে ডাকলে মন খারাপ করে সম্পর্ক নষ্ট হয়।

৪.১১. ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঔৎসুক্য .- আন্তরিক ভালোবাসার একটি অন্যতম তাকিদ হচ্ছে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের ন্যায় আপন ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ঔৎসুক্য পোষণ করা। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তখন তার কাছে থেকে তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার গোত্র-পরিচয় জিজ্ঞেস করে নিবে। কারণ এর দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসার শিকড় অধিকতর মজবুত হয়।” (তিরমিযী, ইয়াজিদ বিন নাআমাহ রা.)

৪.১২. হাদীয়া .- সম্পর্ক বৃদ্ধির অতি উত্তম পন্থা হল মাসে মাসে উপহার দেওয়া। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও, এরদ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং হৃদয়ের দূরত্ব ও শত্রুতা বিলীন হয়ে যাবে।” (মুয়াত্তা মালিক; আত্বা)

৪.১৩. শোকর-গোজারী .- অপরের ভালোবাসা উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে শোকর-গোজারী হচ্ছে একটি উত্তম পন্থা। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কেউ যখন তাঁর খেদমতে কিছ পেশ

করতেন, তিনি শুকরিয়ার সাথে তা গ্রহণ করতেন এবং কেউ তার কোন কাজ করে দিলে সেজন্যে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

৪.১৪. একত্রে বসে আহার .- আন্তরিকতা, ভালবাসা প্রকাশের একটি চমৎকার পন্থা হল একত্রে বসে আহার করা। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কোন খাবার জিনিস থাকলে অথবা কোথাও থেকে কিছু আসলে তিনি গোটা মজলিসকে তাতে শরীক করতেন।

৪.১৫. দোয়া .- একজন আরেকজনের জন্য দোয়া করলে যদি সে ব্যক্তি তা দেখতে পায় তবে সে মুগ্ধ হয়। এভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

৪.১৬. সুন্দরভাবে জবাব দেয়া .- পারস্পরিক কথা বার্তায় কোন প্রশ্নের জবাব সুন্দর ভাবে দেয়া যায়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দুইজন প্রেমিকের মধ্যে সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যে তার ভাইয়ের প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণ করে।"

৪.১৭. আপোষ রফা এবং অভিযোগ খন্ডন .- কোন ব্যাপারে মনো মালিন্য হলে আপোষ করে নেয়া এবং অভিযোগ খন্ডন করা। অভিযোগ থেকে বাঁচতে হলে করনীয়-

প্রথমতঃ অভিযোগের সুযোগ না দেওয়া,

দ্বিতীয়তঃ দরাজদিল হওয়া উচিত,

তৃতীয়তঃ অভিযোগ লালন না করে তার ভাইয়ের নিকট প্রকাশ করা উচিত,

চতুর্থতঃ অভিযোগে অসন্তুষ্ট না হয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত,

পঞ্চমতঃ অভিযোগ জানবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা,

ষষ্ঠতঃ অভিযোগ স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে কোনরূপ কার্পন্য না করা।

৪.১৮. প্রভুর কাছে তাওফিক কামনা .-

বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক হচ্ছে ঈমানের একটি বুনিয়াদী শর্ত। একজর ভাই আরেকজন ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে মুনাজাত করা উচিত।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, *"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমাদান কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জানে কোন হিংসা ও শত্রুতাভাব রেখো না। হে আমদের প্রভু! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়।"*

আন্দোলন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ وَمَن
يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার। **সূরা নিসা-৭৪**

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ
وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ
ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।

সূরা নিসা- ৭৫

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। **সূরা নিসা-৭৬**

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তার রাসূল এবং তাঁর (আল্লাহর) পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয় তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস ,

তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। সূরা আত্ব- তওবা-২৪,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য। **সূরা আত্ব- তওবা- ৩৮**

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন, আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। **সূরা আত্ব- তওবা- ৩৯**

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দুজনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাকর)কে বলেছিল, 'তুমি বিষণ্ন হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইল। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **সূরা আত্ব- তওবা- ৪০**

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ

ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে! **সূরা আত্ব- তওবা- ৪১,**

সূরা আস-সাফ-৯,১০,১১,১২

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى

ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য- যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে। -৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক 'আযাব থেকে রক্ষা করবে? ১০

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। ১১

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। **১২**

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيب

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না। আপনি মুশরিকদেরকে

যার প্রতি ডাকছেন তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি দ্বীনের দিকে হেদায়াত করেন। **সূরা আশ-শুরা-১৩**

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন । তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি । তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত । তিনি আগে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষের জন্য। কাজেই তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে অবলম্বন কর ; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!
সূরা হজ্জ-৭৮

আন্দোলন সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত

٨٠٠- وَرُوِيَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّهَدَاءُ ثَلَاثَةَ رَجُلٌ خَرَجَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ أَنْ يُقَاتِلُ، وَلَا يُقْتَلُ. يُكَثِّرُ سَوَادَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّها.

وَأَخَرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُؤْعَنُ مِنَ الْفَزْعِ وَيُروعُ مِنَ الْمُوْرِ الْعِينِ، وَكَلَّتْ عَلَيْهِ حُلَةُ الْكَرَاكَ ويُوضع على واسم تاج الْوَقَّارِ وَالْخُلْدِ، وَالثَّانِي خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِنَا يُولِدُ أن يُقتل ولا يُقتل فإن مات أو قبلَ كَانَتْ وكَبَتُهُ مَعَ انواهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ السلامُ - بين يدي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ عَلِيْهِ مُقْتَدِرٍ، وَالثَّالِثُ خرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتَلَ وَيُقْتَلُ، فَإِنَّ مات أَوْ قُتِلَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة هَرا سَبَقَةٌ وَاضِعَهُ عَلَى عَاتِهِم . وَالنَّاسُ جَا ثُوْنَ عَلَى الرُّكَّبِ، يَقُولُ أَلَا أَفْسَحُوا لَنَا فَإِنَّا قَدْ بدلنا دِمَاء نَا وَأَمْوَالَنَا لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِمٍ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لا براهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ لِنَّبِيّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لزحلَ لَهُمْ عَنِ الطَّرِيقِ ، لما يولى مِنْ وَاجِبِ حَقِّهِمْ حَتَّى يَأْتُوا منَارِيرَ مِنْ نُورٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيَجْلِسُوا عَلَيْهَا يَنظُرُوْنَ كَيْفَ يقضى بَيْنَ النَّاسِ لا يَجِدُونَ عمَّ الْمَوْتِ، وَلَا يَفْتَقُوْنَ فِي الْبَرْزَعِ، وَلَا تُفْزِعُهُمُ الصُّبَحَةُ، وَلَا يَهُتُهُمُ الْحِسَابُ، وَلَا الْمِيزَانُ، وَلَا الصِّرَاطَ ، يَنْظُرُونَ كَيْفَ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا يَسْأَلُوْنَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطُوا وَلَا يَشْفَعُونَ فِي شَيْ إِلَّا شَقِمُوا فِيْهِ، وَيُعْطَوْنَ مِنَ الْجَنَّةِ مَا أَحَبُّوا، وَيَتَبَوَّ نُوْنَ مِنَ

الْجَنَّةِ حَيْثُ أَحَبُّوا رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالْمُبْهَمِي وَالْإِسْتَهَابِنُ وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৮০০। হযরত **আনাস ইবনে মালেক** (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ **শহীদরা তিন রকমের**। প্রথমত, যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে বের হয়, কিন্তু সে লড়াই করতেও চায় না, নিহত হতেও চায় না। সে চায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াতে। এই পথে চেষ্টা-সাধনা করতে গিয়ে যদি সে মারা যায় বা নিহত হয়, তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তাকে কবর আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে। কিয়ামতের সময়কার মহা আতংক থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে, জান্নাতের অনুপম সুন্দরী হুর সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। তাকে পরম সম্মানের পোশাক পরানো হবে, তার মাথায় সম্মানজনক ও অনন্তকাল স্থায়ী মুকুট পরানো হবে। আর **দ্বিতীয় শ্রেণীর** হলো এমন লোক, যে জান ও মাল নিয়ে একনিষ্ঠভাবে বের হয়। হত্যা করতে চায়, কিন্ত নিহত হতে চায় না। সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে সে আল্লাহ তায়ালার সামনে হযরত ইবরাহীমের সাথে পাশাপাশি আসনে বসবে। **তৃতীয়** যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল সহ আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর পথো বের হয়, সে হত্যাও করতে চায়, নিহত হতেও তার আপত্তি নেই। সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে সে কিয়ামতের দিন নিজের তরবারী ঘাড়ে ঝুলিয়ে সবাইকে দেখাতে দেখাতে আসবে। লোকেরা ভীড় জমিয়ে থাকবে। সে বলবেঃ আমাদের জন্য জায়গা করে দাও। আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রক্ত ও অর্থব্যয় করে এসেছি। রসূল (সা) বলেনঃ আল্লাহর কসম, তারা যদি হযরত ইবরাহীমকে বা অন্য কোন নবীকেও এ কথা বলতো, তবে তিনি পথ ছেড়ে দিতেন। কেননা তাদের কত গুরুত্ব ও

অধিকার, তা তিনি দেখবেন। অবশেষে তারা আরশের নীচে কিছুসংখ্যক আলোর মিম্বরে বসবে। সেখানে বসে তারা কিভাবে বিচারকার্য সমাধা করা হয় তা দেখবে তারা মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করবে না, কবরে কোন আযাব ভোগ করবে না। চিৎকার ধ্বনি শুনে তারা পেরেশান হবে না। হিসেব-নিকাশের জন্য তারা কোন দুশ্চিন্তা ভুগবে না। দাঁড়িপাল্লা এবং পুলসিরাত নিয়েও তারা ভাবনায় পড়বে না তার বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করবে। তারা যা কিছুই চাইবে তা পাবে; যার জন্যই সুপারি করতে চাইবে, করতে পারবে। জান্নাতে তারা যা পছন্দ করবে তাই পাবে এক বেহেশতে যেখানেই তারা থাকতে চাইবে থাকতে পারবে। (বাযযার, বাইহাকী ইসপাহানী)- আত তারগীব ওয়া তারহীব- ২য় খন্ড, ৮০০ নং হাদীস

মাসয়ালাঃ যাকাত সংক্রান্তঃ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, প্রশ্ন হলো - যাকাত কোন ব্যাক্তির উপর ফরজ এবং কখন ফরজ? কি সমস্ত জিনিসের উপর যাকাত ফরজ হয়? কতটুকু মাল যাকাত দিতে হয় বর্তমানের হিসেব অনুযায়ী এবং কাদেরকে যাকাত দেয়া যায়? যাকাত দেয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সময় আছে কি না?

যাকাতের বিধান পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِي

'তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: 'তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।'- সূরা নূর : ৫৬।

لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أُو۟لَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব। সূরা নিসা ১৬২

সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে: 'এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।'

এছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সালাত ও যাকাতের পাবন্দী ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রশ্নই অবান্তর। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে, যেখানে খাঁটি মু'মিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের কথা এসেছে অপরিহার্যভাবে।হাদীস শরীফে এসেছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ (لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ

'যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমরা পুঞ্জিভূত সম্পদ।' (সহীহ বুখারী- ১৪০৩.)

ইসলামে রমজান মাসে সিয়াম সাধনাকে দেহের যাকাতস্বরূপ বলা হয়েছে। রমজান মাসে রোজা পালন করলে যেমন সারা শরীর পবিত্র হয়ে যায়, তেমনি মাহে রমজানে কড়ায়-গন্ডায় যাকাত আদায় করলে মানুষের উপার্জিত সব সম্পদ পবিত্র হয় এবং অধিক সওয়াব হাসিল করা যায়। এই যাকাত দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রমজান মাসই যাকাত আদায়ের সর্বোত্তম সময়। সিয়াম পালন করে রোজাদারেরা পরস্পরের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। ফলে বিত্তবানেরা দান-সাদকা ও যাকাত-ফিতরা প্রদানে উৎসাহিত হন।

রমজান মাসে যেকোনো ধরনের দান-সাদকা করলে অন্য সময়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি নেকি হাসিল হয়। যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি নফল ইবাদত করেন, তবে তিনি মাহে রমজানে একটি ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব পাবেন। যিনি একটি ফরজ আদায় করবেন, তিনি অন্যান্য মাসের ৭০টি ফরজের সমান সওয়াব পাবেন। তাই রমজান মাসে রোজাদার মুমিন বান্দারা একসঙ্গে গরিবে হক যাকাত ও ফিতরা আদায় এ দুটি আর্থিক ইবাদত করে থাকেন।

রমজান মাসে সমাজের ধনী লোকের যাকাত-ফিতরা বা দান-সাদকা প্রদান করুণার বিষয় নয়, এগুলো হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।

যাদের উপর যাকাত ফরয হয়: আগেই বলা হয়েছে যে, যাকাত ইসলামের একটি অপরিহার্য ইবাদত। এজন্য শুধু মুসলিমগণই যাকাত আদায়ের জন্য সম্বোধিত হন। সুস্থমস্তিষ্ক, আযাদ, বালেগ মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত আদায় করা তার ওপর ফরয হয়ে যায়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/২৫৯ বাদায়েউস সানায়ে ২/৭৯,৮২

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়:

১. সব ধরনের সম্পদ ও সামগ্রীর ওপর যাকাত ফরয হয় না। শুধু সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা, পালিত পশু (নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী) এবং ব্যবসার পণ্যে যাকাত ফরয হয়।

২. সোনা-রুপার অলংকার সর্বদা বা কালেভদ্রে ব্যবহৃত হোক কিংবা একেবারেই ব্যবহার না করা হোক সর্বাবস্থাতেই তার যাকাত দিতে হবে।

৩. অলংকার ছাড়া সোনা-রুপার অন্যান্য সামগ্রীর ওপরও যাকাত ফরয হয়।

৪. জামা-কাপড় কিংবা অন্য কোনো সামগ্রীতে সোনা-রুপার কারুকাজ করা থাকলে তা-ও যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে পরিমাণ সোনা-রুপা কারুকাজে লেগেছে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সঙ্গে তারও যাকাত দিতে হবে।সোনা-রুপা ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর অলংকার ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তদ্রূপ হিরা, মণি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ব্যবসাপণ্য না হলে সেগুলোতেও যাকাত ফরয নয়।

৫. মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্ধৃত্ত টাকা-পয়সা নিসাব পরিমাণ হলে এবং এক বছর স্থায়ী হলে বছর শেষে তার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। ব্যাংক ব্যালেন্স, ফিক্সড ডিপোজিট, বন্ড, সার্টিফিকেট ইত্যাদিও নগদ টাকা-পয়সার মতোই। এসবের ওপরও যাকাত ফরয হয়।

৬. টাকা-পয়সা ব্যবসায় না খাটিয়ে এমনি রেখে দিলেও তাতে যাকাত ফরয হয়।

৭. হজ্বের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদি ইত্যাদি প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করা হচ্ছে তা-ও এর ব্যতিক্রম নয়। সঞ্চিত অর্থ পৃথকভাবে কিংবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে এবং নিসাবের ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হবে। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা যদি খরচ হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

৮. দোকান-পাটে যা কিছু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা থাকে তা বাণিজ্য-দ্রব্য। এর মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয।

৯. ব্যবসার নিয়তে কোনো কিছু ক্রয় করলে তা স্থাবর সম্পত্তি হোক যেমন জমি-জমা, ফ্ল্যাট কিংবা অস্থাবর যেমন মুদী সামগ্রী, কাপড়-চোপড়, অলংকার, নির্মাণ সামগ্রী, গাড়ি, ফার্নিচার, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, হার্ডওয়ার সামগ্রী, বইপুস্তক ইত্যাদি, তা বাণিজ্য-দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দেওয়া ফরয হবে।

নিসাবঃ

১. স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হল বিশ মিসকাল।

২. রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হল দু'শ দিরহাম। আধুনিক হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা। এ পরিমাণ সোনা-রুপা থাকলে যাকাত দিতে হবে।

৩. প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা বা বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ হয় তাহলে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়েছে ধরা হবে এবং এর যাকাত দিতে হবে।

৪. যদি সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্য-দ্রব্য- এগুলোর কোনোটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না থাকে, কিন্তু এসবের একাধিক সামগ্রী এ পরিমাণ রয়েছে, যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

৫. নিসাবের অতিরিক্ত সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা ও বাণিজ্যদ্রব্যের যাকাত আনুপাতিক হারে দিতে হবে।

৬. কারো কাছে সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্যদ্রব্য পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমাণ ছিল, বছরের মাঝে এ জাতীয় আরো কিছু সম্পদ কোনো সূত্রে পাওয়া গেল এক্ষেত্রে নতুন প্রাপ্ত সম্পদ পুরাতন সম্পদের সঙ্গে যোগ হবে এবং পুরাতন সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝে যা যোগ হয়েছে তার জন্য পৃথক বছর পূর্ণ হওয়া লাগবে না।

৭. বছরের শুরু ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকলে যাকাত আদায় করতে হবে। মাঝে নিসাব কমে যাওয়া ধর্তব্য নয়। অবশ্য বছরের মাঝে সম্পূর্ণ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে ঐ সময় থেকে নতুন করে বছরের হিসাব আরম্ভ হবে এবং এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে:কুরআন মজীদে যাকাতের খাত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এখাত ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।-সূরা তাওবা : ৬০

১. যে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে অতি সামান্য মাল আছে, অথবা কিছুই নেই, এমনকি একদিনের খোরাকীও নেই এমন লোক শরীয়তের দৃষ্টিতে গরীব। তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

২. যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ অর্থাৎ সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা, বাণিজ্যদ্রব্য ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ আছে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে ধনী। তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

৩. অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ নেই, কিন্তু অন্য ধরনের সম্পদ যাতে যাকাত আসে না যেমন ঘরের আসবাবপত্র, পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নিসাব পরিমাণ আছে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে না। এই ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

৪. যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদও নিসাব পরিমাণ নেই এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য ধরনের মাল-সামানাও নিসাব পরিমাণ নেই এই ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৫. যে ব্যক্তি এমন ঋণগ্রস্থ যে, ঋণ পরিশোধ করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৬. কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সফরে এসে অভাবে পড়ে গেছে বা মাল-সামান চুরি হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে এ ব্যক্তির জন্য শুধু প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করাই জায়েয, এর বেশি নয়।

৭. যাকাতের টাকা এমন দরিদ্রকে দেওয়া উত্তম যে দ্বীনদার। দ্বীনদার নয় এমন লোক যদি যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রবল ধারণা হয় যে, যাকাতের টাকা দেওয়া হলে লোকটি সে টাকা গুনাহের কাজে ব্যয় করবে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

৮. যাকাত শুধু মুসলমানদেরকেই দেওয়া যাবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে নফল দান-খায়রাত অমুসলিমকেও করা যায়।

৯. যাকাতের টাকা যাকাতের হক্বদারদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ করা, কুপ খনন করা, বিদ্যুত-পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১০. যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা, ইসলাম প্রচার, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেওয়া, ওয়াজ মাহফিল করা, দ্বীনি বই-পুস্তক ছাপানো, ইসলামী মিডিয়া তথা রেডিও, টিভির চ্যানেল করা

ইত্যাদিও জায়েয নয়।মোটকথা, যাকাতের টাকা এর হক্বদারকেই দিতে হবে। অন্য কোনো ভালো খাতে ব্যয় করলেও যাকাত আদায় হবে না।

১১. যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হল, উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। যাতে সে নিজের খুশি মতো তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এরূপ না করে যদি যাকাতদাতা নিজের খুশি মতো দরিদ্র লোকটির কোনো প্রয়োজনে টাকাটি খরচ করে যেমন, তার ঘর সংস্কার করে দিল, টয়লেট স্থাপন করে দিল কিংবা পানি বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করল তাহলে যাকাত আদায় হবে না।

১২. আত্মীয়-স্বজন যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়াই উত্তম। ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

১৩. নিজ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে নিজের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতিন এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

১৪. বাড়ির কাজের ছেলে বা কাজের মেয়েকে যাকাত দেওয়া জায়েয যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়। তবে কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেউ কেউ কাজের লোক রাখার সময় বলে, মাসে এত টাকা করে পাবে আর ঈদে একটা বড় অংক পাবে। এক্ষেত্রে ঈদের সময় দেওয়া টাকা যাকাত হিসাবে প্রদান করা যাবে না। সেটা তার পারিশ্রমিকের অংশ বলেই ধর্তব্য হবে।

১৫. কোনো লোককে যাকাতের উপযুক্ত মনে হওয়ায় তাকে যাকাত দেওয়া হল, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে, লোকটির নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে

হবে না। তবে যাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে সে যদি জানতে পারে যে, এটা যাকাতের টাকা ছিল সেক্ষেত্রে তার ওপর তা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব।والله اعلم بالصواب

মাসায়েলের লিংকঃ https://muslimbangla.com/masail/4257

অনুশীলনী- ০৮ঃ এপ্রিল- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ উচ্চারণ: কুল হুয়াল্লাহু আহাদ

বাংলা অনুবাদ: বলুন, তিনিই আল্লাহ, যিনি একক ও অদ্বিতীয়।

২. ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ উচ্চারণ: আল্লাহুস সামাদ

বাংলা অনুবাদ: আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (তিনি মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী)।

৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ উচ্চারণ: লম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম্ উলাদ

বাংলা অনুবাদ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।

৪. وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ উচ্চার: ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ

বাংলা অনুবাদ: এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সুরা ইখলাস - দারস ও ব্যাখ্যা

নাম: (الإخلاص) আল ইখলাস (আর্থাৎ: একনিষ্ঠতা, বিশুদ্ধতা)

আয়াত সংখ্যাঃ ৪; অবতীর্ণ স্থান: মক্কা
সূরাটি তাওহীদ (আল্লাহ একত্ব) সারকথা।

সূরার নামকরণ: পবিত্র কুরআনুল কারীমের মাত্র দুটি সূরা যে সূরা দুটির নামকরণ সূরায় উল্লিখিত শব্দ বা সূরায় বর্ণিত ঘটনা থেকে করা হয়নি। বরং নামকরণ করা হয়েছে সূরার মুখ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। একটি হলো সূরা ফাতিহা আর দ্বিতীয়টি হলো সূরা ইখলাস। অত্র সূরায় একজন সত্যিকার মা'বূদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। **الإخلَاص** শব্দের অর্থ : একনিষ্ঠভাবে কোন কিছু করা। যেমন বলা হয় : **أخلص لله عمله** সে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই তার আমলকে সম্পাদন করেছে। সূরাতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাই **إخلَاص** নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটির ফযীলত: সূরাটি আকারে ছোট হলেও ফযীলতের দিক দিয়ে অনেক বড়।

পরিচ্ছেদঃ ৬৬/১৩. কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরাহ ইখলাস)-এর ফযীলত।

عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا أَيُّنَا يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের বললেন : তোমাদের কেউ কি রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অপারগ হবে? এটা তাদের জন্য কষ্ট কর হয়ে গেল। তারা বলল : হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের কে এরূপ করতে সক্ষম হবে? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

(সহীহ বুখারী হা. ৫০১৫)

অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়লে যে নেকী হবে সেই নেকী এ সূরা পাঠ করলে পাওয়া যাবে। এভাবে এ সূরাটি তিনবার পড়লে সম্পূর্ণ কুরআন পড়ার নেকী পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। কারণ পবিত্র কুরআনে মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ***তাওহীদ, আহকাম ও নসীহত***। সূরা ইখলাসে তাওহীদ পূর্ণভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে।

সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য, এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

পরিচ্ছেদঃ ৯৭/১. আল্লাহর তাওহীদের দিকে উম্মাতের প্রতি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহবান।

أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ

يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَ÷َنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ

৭৩৭৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে অভিযানে পাঠালেন। সালাতে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামত করতেন, তখন ইখ্‌লাস সূরাটি দিয়ে সালাত শেষ করতেন। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ব্যাপারটি আলোচনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাঁকেই জিজ্ঞেস করে কেন সে এ কাজটি করেছে? এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, এ সূরাটির আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী রয়েছে। এ জন্য সূরাটিতে পড়তে আমি ভালোবাসি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ তাঁকে ভালবাসেন। *[মুসলিম ৬/৪৫, হাঃ ৮১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৫৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৮৭১) (সহীহ বুখারী হা. ৭৩৭৫)*

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মাসজিদে প্রবেশ করেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল আর দু'আ করে বলছিল।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কামনা করছি ঐ বাক্যসমূহের মাধ্যমে যে, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। তুমি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ ব্যক্তি ইসমে আযমের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে চেয়েছে। এ নামে চাইলে তিনি দেন আর এ নামে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া দেন। (*আবূ দাঊদ হা. ১৪৯৪, তিরমিযী হা. ৩৪৭৫, ইবনু মাযাহ হা. ৩৮৫৮, সনদ সহীহ*)

[মুল হাদীসঃ পরিচ্ছেদঃ ৬৪. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর সমষ্টি

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** . قَالَ فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " . قَالَ زَيْدٌ فَذَكَرْتُهُ لِزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ . قَالَ زَيْدٌ ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَإِنَّمَا دَلَّسَهُ . وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .

৩৪৭৫। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ আল-আসলামী (রহঃ) হতে তার বাবার সুত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে তার দুআ এভাবে বলতে শুনেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন মা’বূদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।"

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তা’আলার মহান নামের ওয়াসীলায় তার নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে নামের ওয়াসীলায় দুআ করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন। *সহীহঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৫৭)।*

যাইদ ইবনু হুবাব (রাহঃ) বলেন, উক্ত হাদীস কয়েক বছর পর আমি যুহাইর ইবনু মু'আবিয়াহর কাছে উল্লেখ করলাম। সে সময় তিনি বললেন, আমার কাছে আবূ ইসহাক মালিক ইবনু মিগওয়ালের সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন। যাইদ (রাহঃ) বলেন, তারপর এ হাদীস আমি সুফইয়ানের কাছে উল্লেখ করলে তিনিও আমাকে মালিক ইবনু মিগওয়ালের সনদে তা বর্ণনা করেন।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শারীক (রাহঃ) আবূ ইসহাক হতে, তিনি ইবনু বুরাইদাহ হতে, তিনি তার পিতার সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ হাদীস আবূ ইসহাক আল-হামদানী মালিক ইবনু মিগওয়ালের সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি তার শাইখের নাম গোপন করেছেন। শারীক এ হাদীসটি আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।]

পরিচ্ছেদঃ ৬৬/১৪. মু'আব্বিযাত (সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস)-এর ফযীলত।

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৫০১৭. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরাহ ইখ্‌লাস, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন। [৫৭৪৮, ৬৩১৯] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৪৮) (সহীহ বুখারী হা. ৫০১৭)

শানে নুযূলঃ জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : এক গ্রাম্য ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল : তোমার রবের বংশ তালিকা বর্ণনা কর। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (বায়হাকী ৭/১৪৬, হাসান।) উবাই বিন কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুশরিকরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল : হে মুহাম্মাদ তোমার রবের বংশ তালিকা বর্ণনা কর। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক জিনিস যা জন্ম নেয় তা অবশ্যই মারা যাবে এবং যে জিনিস মারা যাবে পরবর্তী বংশধর তার ওয়ারিশ হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মারা যাবেন না এবং তাঁর ওয়ারিশও কেউ হবে না।

তাফসীরঃ একজন সত্যিকার মা'বূদের চারটি বৈশিষ্ট্য এ সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। এ চারটি বৈশিষ্ট্য যে মা'বূদের মাঝে পাওয়া যাবে তিনিই একমাত্র যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার হকদার। এ চারটি বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বা কোন কিছুর মাঝে পাওয়া যায় না। তাই সব বাতিল মা'বূদ বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা উচিত।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: যে মা'বূদের ইবাদত করা হবে তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে তিনি একক হবেন তার কোন অংশীদার থাকবে না। এ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন কিছুর নেই। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা **أَحَد** শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার কোন দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার ইবাদত করা হয় সবই মানুষের বানানো ও মস্তিস্কপ্রসূত চিন্তা-চেতনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسۡمَآءً سَمَّیۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُكُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

"তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের 'ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এটাই সঠিক দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (সূরা ইউসুফ ১২: ৪০)

এ থেকে আরো পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলার শানে উপযোগী নয় এমন নামে তাঁকে অভিহিত করা যাবে না, বরং আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নামেই অভিহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: الصَّمَدُ অর্থাৎ যে মা'বূদের ইবাদত করা হবে তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হবেন না। তিনি কোন খাবার, পানীয় ও নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ হতে মুক্ত হবেন। মোট কথা যিনি নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদসহ অনেক

মুফাসসির বলেছেন : **الصَّمَدُ** সামাদ হলেন তিনি যার মাঝে কোন শূন্যতা নেই। (ইবনু জারীর /২২২) এ বৈশিষ্ট্যটিও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রয়েছে, তাই তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হকদার।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ) একজন সত্যিকার মা'বূদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কাউকে জন্ম দেন না। অর্থাৎ তার কোন স্ত্রী-সন্তান নেই। এটাও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? অথচ তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সমন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আন'আম ৬: ১০১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا(88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا (89) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (91) وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا (92) اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (93)

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তোমরা এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ; যাতে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের

জন্য শোভনীয় নয়! আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।” (সূরা মারইয়াম ৮৮-৯৩)

মূলত: কথা হচ্ছে যে, একজন সত্যিকার মা'বূদকে কেউ জন্ম দিতে পারে না এবং বানাতেও পারে না।

أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ(اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا) وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ كُفْئًا أَحَدٌ.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদম সন্তান আমাকে অবিশ্বাস করে অথচ এটা তার জন্য সমীচীন নয়। সে আমাকে গালি দেয় অথচ এটাও তার জন্য সমীচীন নয়। আমাকে অবিশ্বাস করার অর্থ হলো সে বলে : আমাকে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না। যেমন আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে কি অধিক সহজ নয়? আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হলো : সে বলে : আমার নাকি সন্তান আছে, অথচ আমি একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, আমার কোন সন্তান নেই, আমাকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই। (সহীহ বুখারী হা. ৪৯৭৪, সহীহ মুসলিম হা. ২০৭৮)

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য: একজন সত্যিকার মা'বূদের সত্ত্বা, গুণাবলী ও কাজকর্ম অন্য কোনো কিছুরই সমতুল্য ও সমকক্ষ হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ) "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা শুরা ৪২: ১১)
এ চারটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলার রয়েছে, তাই আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সমস্ত মাখলুকের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য; অন্য কোন মূর্তি, দেব-দেবী ইত্যাদি নয়।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সূরার ফযীলত অনেক। যেমন : নেকীর দিক দিয়ে এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

২. যারা প্রকৃতপক্ষে এ সূরাকে ভালবেসে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে ও তাঁর ওপর ভরসা রাখবে আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ভালবেসে জান্নাত দেবেন।

৩. একজন সত্যিকার মা'বূদের চারটি বৈশিষ্ট্য যা অত্র সূরায় উল্লেখিত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলাই সকল ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কারণ উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য কেবল তাঁর মাঝেই আছে।

৪. সতর্কতা একত্ব (توحيد) এই সূরা একবাক্যে যুদ্ধের একত্বের বাইরে। তিনি একক, অদ্বিতীয়, সাথে অতুলিয়ান।

৫. "আস-সাদ" এমন সত্তা সত্তা মুখপাক্ষী নন। মানুষ, ফেরেশতা, জ্বিন, সব কিছুর উপর নির্ভরশীল।

৬. আল্লাহ জন্ম দেননি, এবং জন্ম নেন নি, তিনি চিরন্তন শাশ্বত। এই আয়াতের মুশরিকদের সেই ভুল ধারণাকে খণ্ডন করে যারা তাদের সন্তানের জন্য দায়ী বা মহিলা মনে করে।

৭. তাঁর কোন দৃশ্য বা সমকক্ষ নেই, তিনি অনন্যসাধারণ। তাঁর সত্তা, গুণাবলি, কর্মকাণ্ড সবই অপরূপ ও অতুলনীয়।

বই নোট: ইসলামী সংগঠন

লেখকঃ অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

প্রকাশনীঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী সংগঠনের গুরুত্বঃ

➧ অর্থঃ সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধ করণ।

➧ ইসলামী সংগঠনের সংজ্ঞাঃ

ইকামাতে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দেয় যে সংগঠন তাকেই বলা হয় ইসলামী সংগঠন।

ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইকামাতে দীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয।

সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েম হতে পারে না। সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বিকাশ সাধন সম্ভবপর নয়।

➧আল্লাহর নির্দেশঃ

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমর তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার।(আল ইমরান-১০৩)

➧ **রাসুল (সঃ) এর বাণীঃ**

ক. তিন জন হলেও জামায়াতী জীবন

খ. জান্নাতের স্বাদ উপভোগের জন্য

গ. সংগঠন সম্পর্কে ওমরের বার্তা

ইসলামী সংগঠনের উপাদানঃ

১. ইসলামী নেতৃত্ব।

২. ইসলামী কর্মী বাহিনী।

৩. ইসলামী পরিচালনা বিধি।

ইসলামী সংগঠন ও ইকামতে দ্বীনঃ

➧ সমাজের চাকা গতিশীল।

➧ অশান্তির মূল কারন ইসলামের অনুপস্থিতি।

➧ বিপ্লবের জন্যই ইসলামের আর্বিভাব।

➧ বিপ্লবের পন্থা বাতলানোর জন্য নবী রাসুল।

➧ দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্যঃ

১. আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের উপায় মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন আর তা আব্দ হিসাবে আল্লাহর বিধান মুতাবেক আত্মগঠন, পরিবার গঠন, দল গঠন ও রাষ্ট্র গঠন।

২. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে হতাশার কোন কারণ নেই।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব কাঠামোঃ

- নেতা একজন।
- আমীর নির্বাচনের মাধ্যমে হয়।
- প্যানেল থাকতে পারে।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনঃ

১. তাকওয়া।
২. যোগ্যতম ব্যক্তি।
৩. ক্যানভাস নেই।
৪. প্রার্থী হওয়া যায় না।

ইসলামী নেতৃত্বের গুনাবলীঃ

১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব।

২. উন্নত আমল।

৩. নম্র ব্যবহার।

৪. সাহসিকতা।

৫. সময়ানুবর্তিতা ।

৬. সাংগঠনিক প্রজ্ঞা।

৭. প্রেরনা সৃষ্টির যোগ্যতা।

৮. সু-ভাষণ।

৯. নথি পত্র সংরক্ষনে পারদর্শিতা।

১০. হিসাব সংরক্ষনে পারদর্শিতা।

ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকাঃ নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে সকল কাজ আবর্তীত হয়ঃ

১. তাকওয়া ।

২. উখুয়াত সৃষ্টি।

৩. ত্যাগের অনুপ্রেরনা সৃষ্টি।

৪. কর্মীদের মাঝে ইনসাফ কায়েম।

৫. বিপদ মুসিবতে ধৈর্য অবলম্বনের তালীম।

৬. আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই সকল তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু রূপে উপস্থাপন।

ইসলামী নেতৃত্বের জবাবদিহিঃ

১. জবাবদিহী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. জবাবদিহী করতে হবে দুই স্থানে।

- নির্বাচক মন্ডলির উপর।
- আল্লাহর নিকট।

ইসলামী সংগঠনের আনুগত্যঃ

১. আল্লাহর আনুগত্য।

২. রাসুলের আনুগত্য।

৩. উলিল আমর বা দায়িত্বশীলদের আনুগত্য

ইসলামী সংগঠনে পদলোভীর স্থান:

১. আত্মপূজারী বা স্বার্থান্ধ ব্যক্তিই নেতৃত্বের লোভ পোষন করে।

২. পদ চাইলে তাকে দেয়া যাবেনা।

৩. দুইজন বাইয়াত গ্রহন করা হয়, তখন যার বাইয়াত শেষে গ্রহন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর।

৪. ইসলামী সংগঠন বা রাষ্ট্রের জনসমর্থনপুষ্ট একজন আমীর বর্তমান থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে আমীর স্বীকার করা যাবে না।
৫. পদলোভী ব্যক্তি আখিরাত বরবাদ করে।

ইসলামী সংগঠনের পরামর্শঃ

- ইসলামী আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য পরামর্শ দেয়া ও নেয়া।
- পরামর্শের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি।

ইসলমী সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহনঃ

১. পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণা নিয়ে সভায় আসবেন না।
২. ঈমান, ইলম ও নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা নিয়ে; লোভ, ভয় কোন্দলে পড়ে নিজের প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত মত ব্যক্ত করবেন না।
৩. মনোযোগ সহকারে একে অন্যের বক্তব্য শ্রবন ও সঠিক অর্থ অনুধাবন।
৪. নিঃসংকোচে মতামত পেশ।
৫. উত্তমের মোকাবেলায় মতের কুরবানী।
৬. সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তের চেষ্টা।
৭. সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে অধিকাংশ মতের আলোকে দ্বি-মত পোষন ভুলে যাবেন।
৮. আমীর দ্বীমত পোষন করলে সদস্যদের সাথে সাধারণ পরামর্শ।

ইসলামী সংগঠনের এহতেসাবঃ

১. ভুল ভ্রান্তি হওয়া এর স্বাভাবিক সংশোধনের জন্য এহতেসাব।
২. এহতেসাব হলো মুমিনদের জন্য আয়না স্বরূপ।
৩. এহতেসাব এর প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি।

ইসলামী সংগঠনে কর্মী পরিচালনাঃ

১. আদর্শের আলোকে মন মানসিকতা গঠন।

২. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান।

৩. ইসলামের বুনিয়াদী নির্দেশগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।

৪. মর্ম উপলব্ধি করে নিয়মিত আল-কুরআন ও আল-হাদীস অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধকরণ।

৫. জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধকরণ।

৬. আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধকরণ।

৭. দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

৮. দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা দান।

৯. দাওয়াতী কাজের রিপোর্ট গ্রহণ।

১০. ইনসাফ ফী সাবীলিল্লাহ-র জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।

১১. সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধকরণ।

১২. সময় সচেতনতা সৃষ্টি।

১৩. পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী হওয়ার জন্য। উদ্বুদ্ধকরণ।

১৪. কাজের পরিকল্পনা সম্মপর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দান

১৫. সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ

১৬. দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

১৭. কাজের তদারক করণ

১৮. কাজের রিপোর্ট গ্রহণ

১৯. রিপোর্ট পর্যালোচনা

২০. সমাজ কর্মীরূপে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

২১. ব্যাপক পরিচিতি অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ

২২. কর্মীকে সুবক্তারূপে গড়ন

২৩. স্ব-চালিত কর্মীরূপে আত্মগঠনে উদ্বুদ্ধকরণ

২৪. নতুন কর্মী গঠনের জন্য কর্মীকে উদ্বুদ্ধকরণ
২৫. সংগঠনের বক্তব্য যথা শীঘ্র অবহিত করণ
২৬. নিষ্ক্রিয় কর্মীর সাথে যথা শীঘ্র যোগাযোগ স্থাপন
২৭. পরামর্শ শ্রবণ
২৮. অগ্রসর কর্মীকে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দান

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের পরীক্ষাঃ

১. পরীক্ষা যাচাই এর জন্য
২. প্রতিকুলতাই পরীক্ষা
৩. দুনিয়া বাসীর কাছে পরিষ্কার করার জন্য এই পরীক্ষা।

ইসলামী সংগঠনে বাইতুলমালঃ

১. ইসলামী সংগঠনে বাইতুল মালের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কর্মীদের ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থদান।
২. ইসলামী সংগঠনের কর্মীরা মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।
৩. তাদের মাল ও জান আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।

ইসলামী সংগঠনের কর্মীর আত্মগঠনঃ

১. আল্লাহর দিকে আহবান
২. একাগ্রতা সহকারে সালাত আদায়
৩. আল-কুরআন অধ্যয়ন
৪. আল-হাদীস অধ্যয়ন
৫. সহায়ক সাহিত্য অধ্যয়ন
৬. রাত্রি জাগরণ
৭. আল্লাহর পথে অর্থ দান

৮. সকল কাজে আল্লাহর স্মরণ
৯. রাসূলের প্রতি দরূদ পড়া
১০. আত্ম সমালোচনা
১১. সাওম পালন
১২. মৌলিক মানবীয় গুণ অর্জন
১৩. পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী কাজ বর্জন

- অশালীন ও অশোভন কথাবার্তা
- গীবত
- আন্দাজ-অনুমান
- হিংসা
- রাগ
- অহংকার

ইসলামী সংগঠনে কর্মী গঠনঃ

১. সাহচর্য দান
(ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন
(খ) মানসিক দৃঢ়তা অর্জনে সহযোগিতা দান
২. সাংগঠনিক পরিবেশে আনয়ন
৩. ছোট খাটো দায়িত্ব অর্পন
৪. অর্থ দানে উদ্বুদ্ধকরণ
৫. প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান
৬. আহবান জ্ঞাপনের দায়িত্ব অর্পন
৭. কাজের রিপোর্ট গ্রহণ

ইসলামী সংগঠনে কর্মীর মানোন্নয়নঃ

১. সাপ্তাহিক সভা

২. শিক্ষা বৈঠক

৩. পাঠ চক্র

৪. দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শিবির

৫. বক্তৃতা অনুশীলন চক্র

৬. ব্যক্তিগত আলাপ, জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ দান।

ইসলামী সংগঠনের সংহতিঃ

১. ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা

২. ইসলামী সংগঠনের বৈশিষ্ট গুলো সম্পর্কে অপূর্ণাঙ্গ ধারণা

৩. ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সংশয়

৪. বিপদ মুসিবাত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব

৫. অগ্রাধিকার নির্ধারণে অক্ষমতা

৬. মানসিক ভারসাম্যহীনতা

(ক) ত্বরা প্রবণতা

(খ) অতি আশা

(গ) চরম পন্থার প্রতি ঝোঁক

(ঘ) অহংকার

(ঙ) অভিমান

৭. মুখোস-পরা দুশমনদের ভূমিকা :

১. আন্দোলনের ক্ষতি করার জন্য ইসলামী সংগঠনে ঢুকে পড়ে

২. ইসলামী সংগঠনে দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের ভিত্তিতে আঘাত হানে

৩. নেতৃস্থানীয় ও কর্মীদের সম্পর্কের সংশয় সৃষ্টি করে

৪. ইসলামী সংগঠনের প্রতি আঘাত হানার জন্য মুখোশ ধারীরা ঘুপটি মেরে বসে থাকে

দৃষ্টান্তঃ

যায়নাব বিনতে জাহাশের বিয়েকে কেন্দ্র করে রাসুলের (সঃ) প্রতি অপবাদ; আয়িশা (রা) এক অভিযানে পেছনে পড়ে যাওয়া এবং এক সাহাবীর সাথে মদীনায় আসার অপবাদ।

ইসলামী সংগঠনের স্বাভাবিক বর্ধনঃ

১. ইসলামী সংগঠনের ক্রমবিকাশের জন্য প্রয়োজন নিরলস কর্মী বাহিনী

২. কর্মীদের মান ও জনগনের ধারনা বদলানোর জন্য প্রয়োজন সময়

৩. আল্লাহ কুরআনে এর ক্রমবিকাশের চারটি পর্যায় উল্লেখ রয়েছে

(ক) অংকুর বের করা

(খ) শক্তি অর্জন করা

(গ) মোটা-তাজা হওয়া

(ঘ) কান্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে যাওয়া।

মধ্যবর্তী স্তরের সংগঠনের কাজঃ

১. উর্ধ্বতনসংগঠনের সাথে সম্পর্কিত কাজ

২. নিজস্ব স্তরে কারনীয় কাজ

৩. অধঃস্তন সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত কাজ

আন্দোলন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত : সূরা নিসা-৭৪ ও ৭৬, তওবা-২৪ ও ৩৮-৪১, আস-সাফ-৯,১০,১১,১২, আশশুরা- ১৩, হজ্জ-৭৮ দেখুন পৃষ্ঠা- ১৭৬

ও ১টি হাদীস মুখস্ত, পৃষ্ঠা- ১৮১

মাসয়ালাঃ সিয়াম সংক্রান্ত। দেখুন পৃষ্ঠা ১২৩

অনুশীলনী- ০৯ঃ মে- ২য় সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা লাহাব

সূরা লাহাব (স্ফুলিঙ্গ)

সূরা ফাতেহার পরে মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা নং **১১১**, আয়াত ৫, শব্দ ২৯, বর্ণ ৮১।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (তাব্বাত ইয়াদাা আবি লাহাবিও ওতাব্ব।)

(১) ধ্বংস হৌক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে।

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (মাা আগ'না আ'নহু মালুহু ওমা কাছাব)

(২) তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে।

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (ছাইছলাা নাারান যাাতা লাহাবি)

(৩) সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (ওয়ামরা আতুহু হাম্মাা লাতাল হাতব)

(৪) এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী।

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (ফী যীদিহাা হাবলুম মমিম মাছাদ)

(৫) তার গলদেশে খর্জুরপাতার পাকানো রশি।

[আবু লাহাব ছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা ও নিকটতম শত্রু প্রতিবেশী। তার স্ত্রী ছিলেন আবু সুফিয়ানের বোন 'আওরা বিনতে হারব উম্মে জামীল।

বিষয়বস্তু :

(১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধ্বংস কামনা করে চাচা আবু লাহাব যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তার জওয়াব (১-৩ আয়াত)। (২) আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের নিকৃষ্টতম শত্রুতার মন্দ পরিণতি বর্ণনা (৪ -৫ আয়াত)।

শানে নুযূল :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর আয়াত নাযিল হ'ল, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ। 'আর তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়-পরিজনকে সতর্ক কর' (শো'আরা ২৬/২১৪), তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী একদিন সকালে ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সকলের উদ্দেশ্যে বিপদসংকেতমূলক ভাষায় ডাক দিয়ে বলেন, يا صَباحاه (প্রত্যুষে সকলে সমবেত হও!)। এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকলেন। অতঃপর সবাই হাযির হ'লে তিনি বলেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِى؟ قَالُوا بَلَى- আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শত্রুসেনা তোমাদের উপরে সকালে বা সন্ধ্যায় হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহ'লে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না? সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, অবশ্যই করব। কেননা, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا 'আমরা এযাবত তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি'। তখন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ 'আমি ক্বিয়ামতের কঠিন আযাবের প্রাক্কালে তোমাদের নিকটে সতর্ককারী রূপে আগমন করেছি'। অতঃপর তিনি আবেগময় কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا –

'হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা'ব বিন লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমার কোনই কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর পাকড়াও হ'তে রক্ষা করতে পারব না'। তবে তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ

مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ وَلاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا
'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও। কিন্তু আল্লাহর পাকড়াও হ'তে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না' ।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إلا ان تقولوا لآ اله الا الله 'তবে যদি তোমরা বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) ।[২]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই মর্মস্পর্শী আবেদন গর্বোদ্ধত চাচা আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটেনি। তিনি চিৎকার দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখের উপর বলে দিলেন تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ 'সকল দিনে তোমার উপর ধ্বংস আপতিত হৌক! এজন্য তুমি আমাদের জমা করেছ'? বলেই তিনি উঠে যান। অতঃপর অত্র সূরাটি নাযিল হয় ।[৩] কথিত আছে যে, এই সময় আবু লাহাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পাথর মারতে উদ্যত হন। কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রতিরোধ করেন' (কুরতুবী; আর-রাহীক্ব ৮৬ পৃ:)।

আবু লাহাব কথাটি তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন। কেননা আখেরাতে জবাবদিহিতার কথা তাদের আগেই জানা ছিল। কিন্তু এটি তাদের কাছে অতীব তুচ্ছ বিষয় ছিল। দুনিয়া তাদেরকে গ্রাস করেছিল ও আখেরাত থেকে বেপরওয়া করেছিল।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আপন চাচাদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ ছিলেন। ১. যারা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিলেন

ও তাঁর সাথে জিহাদ করেছিলেন। যেমন হামযাহ ও আববাস (রাঃ)। ২. যারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন আবু তালিব। ৩. যারা শুরু থেকে মৃত্যু অবধি শত্রুতা করেন। যেমন আবু লাহাব।

আবু লাহাবের পরিচয় :

আবু লাহাব ছিলেন কুরায়েশ নেতা আব্দুল মুত্ত্বালিবের দশজন পুত্রের অন্যতম। নাম আব্দুল ওযযা। অর্থ, ওযযা দেবীর গোলাম। লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'আবু লাহাব' বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গওয়ালা বলা হ'ত। তার আসল নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা তা ছিল তাওহীদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তার আবু লাহাব উপনামটি কুরআনে উল্লেখ করেছেন। কেননা এর মধ্যে তার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবার দুঃসংবাদটাও লুকিয়ে রয়েছে।

আবু লাহাব ছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই প্রিয় চাচা যিনি (১) তাঁর জন্মের খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সর্বত্র দৌড়ে গিয়ে লোকদের নিকট খবরটি পৌঁছে দেন যে, তার মৃত ছোট ভাই আব্দুল্লাহর বংশ রক্ষা হয়েছে। আর এই সুখবরটি প্রথম তাকে শুনানোর জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করে দেন।[৪] (২) তিনি ছিলেন মক্কায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটতম প্রতিবেশী (৩) তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুঅতপূর্বকালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়।[৫]

এত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সবকিছু তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়ে যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুঅত লাভের পর। আবু লাহাব কখনোই তার ভাতিজার সুনাম-সুখ্যাতি ও নবুঅত লাভের মত উচ্চ মর্যাদা অর্জনের বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। যেমন মেনে নিতে পারেননি অন্যতম বংশীয় চাচা আবু জাহল ও তার সাথীরা। ফলে শুরু হয় শত্রুতা। তার পক্ষে সম্ভব কোনরূপ শত্রুতাই তিনি বাকী রাখেননি। যেমন, (১) আবু লাহাব তার দু'ছেলেকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করেন। এই দু'মেয়েই পরবর্তীতে একের পর এক হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। (২) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ, যার লকব ছিল ত্বাইয়েব ও ত্বাহের, মারা গেলে আবু লাহাব খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলেন মুহাম্মাদ এখন 'আবতার' অর্থাৎ লেজকাটা ও নির্বংশ হয়ে গেল। সেযুগে কারু পুত্রসন্তান না থাকলে এরূপই বলা হ'ত। একথারই প্রতিবাদে সূরা কাওছার নাযিল হয় এবং আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 'নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ'। (৩) হজ্জের নিরাপদ মওসুমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহিরাগত হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। তখন আবু লাহাব তাঁর পিছু নিতেন এবং লোকদের ভাগিয়ে দিতেন এই বলে যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ 'হে লোকসকল! তোমরা এর আনুগত্য করো না। কেননা সে ধর্মত্যাগী, মহা মিথ্যুক'। এমনকি যুল-মাজায (ذو المجاز) নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا 'তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' তখন আবু লাহাব পিছন

থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছিলেন। যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়।[৬]

আবু লাহাবের স্ত্রী :

নাম : 'আওরা (العوراء) অথবা আরওয়া (أروى) বিনতে হারব ইবনে উমাইয়া। **উপনাম :** উম্মে জামীল। কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের বোন। ট্যারাচক্ষু হওয়ার কারণে তাকে 'আওরা' (عوراء) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনুল 'আরাবী তাকে عوراء أم قبيح বা 'ট্যারাচক্ষু সকল নষ্টের মূল' বলেন (কুরতুবী)। কুরায়েশদের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের অন্যতম এই মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চক্রান্তে ও দুষ্কর্মে তার স্বামীর পূর্ণ সহযোগী ছিলেন (ইবনু কাছীর)। সর্বদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে গীবত, তোহমত ও চোগলখুরীতে লিপ্ত থাকতেন। কবি হওয়ার সুবাদে ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তার নোংরা প্রচারণা অন্যদের চাইতে বেশী ছিল। চোগলখুরীর মাধ্যমে সংসারে ভাঙ্গন ধরানো ও সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালানো দু'মুখো ব্যক্তিকে আরবরা حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ইন্ধন বহনকারী বা খড়িবাহক বলত। সে হিসাবে এই মহিলাকে কুরআনে উক্ত নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগে উক্ত মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখতেন। যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কষ্ট পান।

সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে পাথর খন্ড নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা

চত্বরে গমন করেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে দেখতে পাননি। অবশেষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে বলেন, আবুবকর! তোমার সাথী নাকি আমাকে ব্যঙ্গ করেছে? আল্লাহর কসম, যদি আমি তাকে পেতাম, তাহ'লে এই পাথর দিয়ে তার মুখে মারতাম। আল্লাহর কসম! আমি একজন কবি। বলেই তিনি রাগতঃস্বরে কবিতা পাঠ করেন-

مُذَمَّمًا عَصَيْنَا + وأَمْرَهُ أَبَيْنَا + ودِينَهُ قَلَيْنَا

'নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি'। 'তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি'। 'তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি'। উল্লেখ্য যে, কুরায়েশ নেতারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত)-এর বদলে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে আখ্যায়িত করেছিল এবং ঐ নামে তারা তাঁকে গালি দিত।[৭]

আবু লাহাবের পরিণতি :

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের দুঃসংবাদ মক্কায় পৌঁছবার সপ্তাহকাল পরে আবু লাহাবের গলায় গুটিবসন্ত দেখা দেয় এবং তাতেই সে মারা পড়ে। সংক্রমণের ভয়ে তার ছেলেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কুরায়েশরা এই ব্যাধিকে মহামারী হিসাবে দারুণ ভয় পেত। তিনদিন পরে লাশে পচন ধরলে কুরায়েশ-এর এক ব্যক্তির সহায়তায় আবু লাহাবের দুই ছেলে লাশটি মক্কার উচ্চভূমিতে নিয়ে যায় এবং সেখানেই একটি গর্তে লাঠি দিয়ে ফেলে পাথর চাপা দেয়। [৮] অহংকারী যালেমের পতন এভাবেই হয়। কুরআনের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। তার মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসেনি।

তাফসীর :

(১) تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ধ্বংস হৌক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে'। تَبَّ تَبَابًا অর্থ خسر، خاب، هلك 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, নিরাশ হওয়া, ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি। التباب অর্থ الخسار 'ধ্বংস হওয়া'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ 'আর ফেরাঊনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল পুরোপুরি' (গাফের/মুমিন ৪০/৩৭)।

আবু লাহাব যে ভাষায় আল্লাহর রাসূলের ধ্বংস কামনা করেছিল, ঠিক সেই ভাষায় অত্র আয়াতে তার ধ্বংস কামনা করা হয়েছে। আবু লাহাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছিল تَبًّا لَكَ 'তোমার ধ্বংস হৌক'। একইভাবে তাকে বলা হয়েছে تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ 'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে'। এখানে দু'হাত বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ মূলতঃ দু'হাত দিয়েই সব কাজ করে থাকে। তাছাড়া আরবদের পরিভাষায় বস্তুর একটি অংশকে পূর্ণ বস্তু হিসাবে বুঝানো হয় এবং ব্যক্তির দু'হাত দ্বারা মূল 'ব্যক্তি'কে বুঝানো হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ 'এটা তোমার দু'হাতের কর্মফল। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না' (হজ্জ ২২/১০)।
অন্যত্র তিনি বলেন,

-يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَاباً

'যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা তার দু'হাত অগ্রিম প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হ'তাম'! (নাবা ৪০)।

উভয় আয়াতেই দু'হাতকে 'ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও 'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হৌক' অর্থ আবু লাহাব ধ্বংস হৌক!

(২) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 'কোন কাজে আসেনি তার মাল-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে'।

অর্থাৎ যেসব ধন-সম্পদ সে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং যা সে নিজে উপার্জন করেছে, কোন কিছুই তার কাজে আসেনি এবং তার ধ্বংস সে ঠেকাতে পারেনি।

ইবনু আববাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, وَمَا كَسَبَ অর্থ তার সন্তানাদি। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ- 'মানুষ যা নিজে উপার্জন করে সেটাই তার সর্বাধিক পবিত্র খাদ্য। আর তার সন্তান তার উপার্জনের অংশ'।

[৯]অর্থাৎ আবু লাহাবের মাল ও সন্তানাদি তার কোন কাজে আসেনি। শুধু তাই নয়, তার সম্মান ও পদমর্যাদা এবং শক্তি ও ক্ষমতা কোনটাই কোন কাজে লাগেনি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন স্বীয় কওমকে ঈমানের দাওয়াত দেন ও আখেরাতে আযাবের ভয় দেখান, তখন আবু লাহাব তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, إذا كان ما يقول ابن أخي حقا، فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي- 'আমার ভাতিজার কথা যদি সঠিক হয়, তাহ'লে আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার ধন-সম্পদ ও

সন্তানাদির বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নেব'। অত্র আয়াতে তার জওয়াব এসেছে (ইবনু কাছীর)।

উল্লেখ্য যে, মক্কায় গোপন দাওয়াতের তিন বছরে যে ৪০-এর অধিক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন, ইবনু মাসঊদ ছিলেন তাদের অন্যতম। অতঃপর নবুঅতের চতুর্থ বর্ষে ছাফা পাহাড়ে অত্র দাওয়াতের ঘটনা ঘটে। আবু লাহাবের সন্তানদের ইবনু আববাস (রাঃ) الكسب الخبيث বা 'নষ্ট উপার্জন' বলে অভিহিত করেন (কুরতুবী)।

(৩) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ 'সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে'।

অর্থাৎ ভয়ংকর দাহিকাশক্তিসম্পন্ন ও চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত জাহান্নামে সে প্রবেশ করবে। صَلَى يَصْلَى صَلْيًا 'প্রবেশ করা'। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ- 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৬)। إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ 'কেবল তাদের ব্যতীত যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (ছাফফাত ৩৭/১৬৩)। ذَاتَ لَهَبٍ অর্থ ذات اشتعال وتلهّب وإحراق شديد 'জোশ ও স্ফুলিঙ্গওয়ালা এবং প্রচন্ড দাহিকাশক্তি সম্পন্ন' (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)। আয়াতে سَيَصْلَى 'সত্বর সে প্রবেশ করবে' বলা হয়েছে। অথচ তা ক্বিয়ামতের পরে ঘটবে। এখানে س এসে تحقيق বা 'নিশ্চয়তা' অর্থে। অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সে প্রবেশ করবে'। দুনিয়ার হিসাবে ক্বিয়ামত দূরের হলেও আখেরাতের হিসাবে তা খুবই নিকটবর্তী। ঘুমন্ত মানুষ সারারাত ঘুমিয়ে উঠে যেমন বলে এইমাত্র ঘুমালাম। পুনরুত্থান দিবসে মানুষের

ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا 'সেদিন যখন তারা এটা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে, তারা (দুনিয়াতে) একটি রাত্রি বা একটি দিনের অধিক অবস্থান করেনি' (নাযে'আত ৭৯/৪৬)। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا- وَنَرَاهُ قَرِيْبًا- 'তারা ঐ দিনকে (ক্বিয়ামতকে) অনেক দূরে মনে করে'। 'কিন্তু আমরা তা দেখছি নিকটে' (মা'আরিজ ৭০/৬-৭)।

বিদ'আতীরা তাদের আবিষ্কৃত মীলাদুন্নবীর মজলিসে জাল হাদীছ বলে থাকে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণে খুশী হওয়ার কারণে প্রতি সোমবার আবু লাহাবের উপর জাহান্নামের শাস্তি মওকূফ করা হয়। তাছাড়া অন্যদিন জাহান্নামে আযাব হ'লেও তার শাহাদাত অঙ্গুলিটি আযাবমুক্ত থাকে। কেননা সে রাসূল জন্মের খবরে খুশী হয়ে ঐ আঙ্গুলটি উঁচু করে দৌড়ে সবাইকে সুসংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিল'। নিঃসন্দেহে এগুলি বিদ'আতীদের উদ্ভট কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। এবিষয়ে কুফরী অবস্থায় চাচা আববাস-এর একটি স্বপ্নের কথা বলা হয়, যার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

ইবনু কাছীর বলেন, বিদ্বানগণ বলেন যে, সূরাটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুঅতের অন্যতম দলীল। কেননা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী প্রকাশ্যে বা গোপনে মৃত্যু অবধি কখনো ঈমান আনেনি। বরং কাফের অবস্থাতেই উভয়ের মৃত্যু হয়েছে। অত্র আয়াতে যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সূরাটি আবু লাহাবের মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে নাযিল হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরায়েশ নেতাদের নির্যাতিত হাবশী গোলাম বেলাল ইসলামের বরকতে মহা সম্মানিত হ'ল। আর ইসলাম গ্রহণ না করায় সম্মানিত কুরায়েশ নেতা আবু লাহাব অসম্মানিত ও জাহান্নামী হ'ল। ফরয ও নফল ছালাতসমূহে মুসলমান যতবার এই সূরা পাঠ করে, ততবার প্রতি হরফে দশটি করে নেকী পায়। অথচ তাতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ ও ধ্বংসের কথা বলা হয়। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা মর্যাদামন্ডিত করুন-আমীন!

(৪) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 'এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী'। অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে একইভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। حَمَّالَةُ الْحَطَبِ অর্থ 'ইন্ধন বহনকারী'। আগুন জ্বালানোর ইন্ধন হিসাবে যেসব খড়িকাঠ জমা করা হয়। আরবরা দু'মুখো, চোগলখোর ও গীবতকারীদের এই নামে আখ্যায়িত করত। কেননা এর দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে দ্রুত অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। ইবনু আববাস, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ বলেন যে, আবু লাহাবের স্ত্রী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে নিন্দা ও চোগলখুরী করে এই আগুন জ্বালানোর কাজটিই করত' (কুরতুবী)। উক্ত মহিলা 'উম্মে জামীল' উপনামে পরিচিত ছিল। যার অর্থ 'সুন্দরের মা'। অথচ প্রকৃত অর্থে সে ছিল أم قبيح অর্থাৎ 'নষ্টের মূল'। তাই কুরআন তার উপনাম বাদ দিয়ে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 'খড়ি বহনকারিণী' বলে তার চোগলখুরীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে।

ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, সে সর্বদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরিদ্রতাকে তাচ্ছিল্য করত। অথচ প্রচুর ধন-

সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সীমাহীন কৃপণতার কারণে সে নিজে কাঠ বহন করত। ফলে কৃপণ হিসাবে লোকেরা তাকে তাচ্ছিল্য করত। এত ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে কাঁটাযুক্ত ঘাস ও লতাগুল্ম বহন করে এনে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবীদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত (কুরতুবী)। ইবনু জারীর এ বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন (ইবনু কাছীর)।

(৫) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ 'তার গলদেশে খর্জুরপত্রের পাকানো রশি'। অর্থাৎ খেজুরপাতা দিয়ে পাকানো রশি দিয়ে কাঁটাযুক্ত লতাগুল্ম বেঁধে ঘাড়ে করে বা গলায় ঝুলিয়ে সে বহন করে আনত। হাসান বাছরী বলেন, 'মাসাদ' হ'ল ইয়ামনে উৎপন্ন এক প্রকার গাছের পাকানো রশি। আবু ওবায়দা বলেন, পশমের রশি (কুরতুবী)। তানতাভী বলেন, কঠিনভাবে পাকানো রশি, যা গাছের ছালপাতা দিয়ে বা চামড়া দিয়ে বা অন্যকিছু দিয়ে তৈরী হ'তে পারে (তানতাভী)। যাহহাক ও অন্যান্যগণ বলেন, 'ঐ রশিই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের রশি হবে'। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রীর মণিমুক্তাখচিত বহু মূল্যবান একটি কণ্ঠহার ছিল। যেটা দেখিয়ে সে লোকদের বলত, وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى لَأُنْفِقَنَّهَا فِي عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ- 'লাত ও ওযযার কসম! এটা আমি অবশ্যই ব্যয় করব মুহাম্মাদের শত্রুতার পিছনে'। এ কণ্ঠহারই তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আযাবের কণ্ঠহার হবে' (কুরতুবী)।

কুরায়েশ বংশের একজন সম্মানিত ও ধনশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম আচরণ করায় আল্লাহ আবু লাহাবের স্ত্রীকে নিম্নশ্রেণীর 'কাঠ কুড়ানী' মহিলাদের সাথে তুলনা করেছেন' (তানতাভী)।

আবু লাহাবের স্ত্রীর পরিণতি :

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলা একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহনে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে এবং সেখানেই তাকে শেষ করে দেয়' (কুরতুবী)।

বস্তুতঃ আবু লাহাব ও উম্মে জামীলের মত ধনশালী পুঁজিপতি দুশমনরা সে যুগেও যেমন ইসলামের শত্রুতায় তাদের যথাসর্বস্ব ব্যয় করেছে, এ যুগেও তেমনি তারা তা করে যাচ্ছে। সেদিন যেমন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী গীবত-তোহমত ও অপপ্রচারের মাধ্যমে শত্রুতা করেছিল, আজও তেমনি ইসলামের প্রকৃত খাদেমদের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিশ্বব্যাপী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অপপ্রচার চালাচ্ছে। আধুনিক জাহেলী মতবাদসমূহের সাথে আপোষকারী শৈথিল্যবাদী মুসলিম নেতাদের তারা 'মডারেট' বা উদার বলে প্রশংসা করছে। পক্ষান্তরে ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের তারা 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' বা মৌলবাদী বলে গালি দিচ্ছে ও তাদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। সেই সাথে দুর্বল ও নতজানু সরকারগুলোকে দিয়ে দেশে দেশে দ্বীনদার মুসলমানদের উপরে মিথ্যা মামলা ও জেল-যুলুমসহ নানাবিধ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

সেযুগে যেমন আল্লাহর ইচ্ছায় আবু লাহাবদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল, এযুগেও তেমনি ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের বিরুদ্ধে যাবতীয় চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ব্যর্থকাম হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব হে মানুষ! ফিরে এসো প্রকৃত ইসলামের পথে। দীপ্ত শপথ নিয়ে, নির্ভীকচিত্তে। এগিয়ে চল জান্নাতের পানে।

সারকথা :

ইসলামের অভ্রান্ত সত্যকে প্রকাশ করার জন্য যুগোপযোগী মাধ্যম সমূহকে কাজে লাগাতে হবে। যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেযুগের নিয়ম অনুযায়ী ছাফা পাহাড়ে উঠে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেদিনের আবু লাহাবের ও উম্মে জামীলের ন্যায় ইসলামের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রু চিরকাল থাকবে এবং তারা অবশ্যই জাহান্নামী হবে। কিন্তু আল্লাহর নিকটে মযলূম মুমিনরাই প্রকৃত বিজয়ী এবং যালেমরা সর্বদা পরাজিত।

[১]. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪, ২০৬; আহমাদ হা/৮৭১১; মিশকাত হা/৫৩৭৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়-২৬, ‘সতর্ক করা ও ভয় প্রদর্শন করা’ অনুচ্ছেদ-৮।

[২]. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ১/৬৪।

[৩]. বুখারী হা/৪৭৭০, ৪৯৭১; মুসলিম হা/২০৮; তিরমিযী হা/৩৩৬৩; কুরতুবী হা/৬৫১২; মিশকাত আলবানী হা/৫৩৭২।

[৪]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৭৩; আলবানী, ছহীহ সীরাতুন নববিইয়াহ পৃঃ ১৫।

[৫]. আর-রাহীক্বুল মাখতূম পৃঃ ৮৬।

[৬]. আহমাদ হা/১৬০৬৬; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৬৫৬২; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭ সনদ ছহীহ, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়; কুরতুবী হা/৬৫১৩; তাফসীর ইবনু কাছীর; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮২।

[৭]. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৫৫-৫৬; ফাৎহুল বারী ৮/৬১০ প্রভৃতি; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

[৮]. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৪৬; বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত ৩/১৪৫-১৪৬; আল-বিদায়াহ ৩/৩০৯; আর-রাহীক্ব পৃঃ ২২৫-২৬; কুরতুবী।

[৯]. আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯০; মিশকাত হা/২৭৭০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।

বইঃ গঠনতন্ত্র, দেখুন পৃষ্ঠা ১০

সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

আলে-ইমরান-১০৩,

وَاعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِيۡعًا وَّلَا تَفَرَّقُوۡا ۚ وَاذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ كُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِكُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهٖۤ اِخۡوَانًا ۚ وَكُنۡتُمۡ عَلٰى شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَكُمۡ مِّنۡهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَاِلَيالۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِالۡمُنۡكَرِؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُا لۡمُفۡلِحُوۡنَ۝۱۰۴

আলে-ইমরান-১০৪- আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।

আস সফ- ৪

اِنَّا للّٰهَ يُحِبُّالَّذِيۡنَ يُقَاتِلُوۡنَفِيۡسَبِيۡلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمۡ بُنۡيَانٌمَّرۡصُوۡصٌ

বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাঢালা প্রাচীর।

তাহারাত সংক্রান্ত হাদীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ".

৪৩০। মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ননা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারোর উযূ (ওজু/অজু/অযু)

ভেঙ্গে গেলে তার সালাত (নামায/নামাজ) কবুল হয় না উযূ করার পূর্ব পর্যন্ত। (সহীহ মুসলিম- ইফাবা)

মাসয়ালা: ঈদের নামাজ সংক্রান্ত

'ঈদ' (عيد) শব্দটি আরবী, যা 'আউদুন' (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো– উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[১] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[২] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে 'ঈদ' বলা হয়।[৩]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে 'ঈদুল ফিত্বর'-এর সূচনা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু'দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দু'দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং 'ঈদুল ফিত্বর' ও 'ঈদুল আযহা'-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দু'দিনের পরিবর্তে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন– 'ঈদুল আযহা' ও 'ঈদুল ফিত্বর'।[৫]

ঈদের ছালাতের আগে করণীয়:

(১) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকলে নিজের এবং পরিবারের পক্ষ থেকে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। এটা ওয়াজীব।

উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৭] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুমতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবল খুৎবা শ্রবণ এবং দু'আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৮] এখানে দু'আ বলতে সম্মিলিত দু'আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল।[৯]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[১০]

ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়মঃ

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় (আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন।[১২] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ :

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।[১৩] উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১৪]

ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল:

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমানিক ১৫ মিনিটি পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাক। এটাই জমহূর আলেমের মত।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১৬]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১৭] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে ছালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবল মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।[১৮] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাতবিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১৯] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীআতসম্মত নয়।[২১] ঈদের ছালাতের খুৎবা একটি।[২২] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছ সম্মত।

(৫) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[২৩] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেননি।[২৪]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[২৫]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!'[২৬]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে দান করলেন।[২৭]

ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা:

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا 'ঈদুল ফিত্বর-এর প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[২৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া) প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২৯] ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই ঈদের তাকবীর হবে– প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ'।[৩০] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৩১]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ

قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।[৩২] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৩] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী রাহিমাহুমাল্লাহ একে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৫]

ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়মঃ

ঈদের ছালাত দু'রাকআত।[৩৬] নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[৩৭] অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[৩৮] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয়

রাকআতে সূরা আল-ক্বামার পড়তেন।[৩৯] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[৪০]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

তথ্যসূত্রঃ

[১]. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।

[৩]. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।

[৪]. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।

[৫]. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।

[৬]. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।

[৭]. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।

[৮]. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।

[৯]. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।

[১০]. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।

[১১]. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।

[১২]. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।

[১৩]. আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।

[১৪]. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।

[১৫]. ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।

[১৬]. যাদুল মা'আদ।

[১৭]. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।

[১৮]. আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।

[১৯]. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।

[২০]. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।

[২১]. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।

[২২]. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।

[২৩]. ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।

[২৪]. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।

[২৫]. ছহীহ বুখারী, ২/২৩।

[২৬]. তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।

[২৭]. ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।

[২৮]. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।

[২৯]. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।

[৩০]. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।

[৩১]. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।

[৩২]. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।

[৩৩]. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।

[৩৪]. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।

[৩৫]. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।

[৩৬]. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।

[৩৭]. ইবনু খুযায়মা।

[৩৮]. যাদুল মা‘আদ, ১/৪৪১।

[৩৯]. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮ ,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।

[৪০]. যাদুল মা‘আদ, ১/৪২৯।

https://al-itisam.com/article_details/2465

অনুশীলনী- ১০ঃ মে- ৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী - সূরা মু’মেনুন (১-১১ নং আয়াত) (মুমিনের গুনাবলী)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
(4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

(10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

সরল অনুবাদঃ

১. নিশ্চিত ভাবেই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।
২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী ও নম্র।
৩. যারা বাজে বা বেহুদা কথা কাজ থেকে দুরে থাকে।
৪. যারা তাজকিয়া বা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।
৫. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।
৬. তবে তাদের স্ত্রীদের ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।
৭. তবে যদি কেউ তাদের ছাড়া অন্য কাউকে (যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য) কামনা করে তবে তারা হবে সীমালংঘনকারী।
৮. এবং যারা তাদের আমানতসমূহ এবং ওয়াদাচুক্তির (অঙ্গীকার) রক্ষনাবেক্ষন করে।
৯. এবং যারা তাদের নামাযসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষন করে।
১০. তারাই (এসব গুনের অধিকারী) উত্তরাধিকার লাভ করবে
১১. তারা উত্তরাদিকার হিসাবে ফিরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।

নামকরনঃ

সুরার নামকরন দুই ভাবে হয়ে থাকে-

বহুল আলোচিত শব্দ (শব্দ ভিত্তিক). যেমন- নাস, ফালাক

বিষয়ভিত্তিকঃ যেমন- সুরা ফাতেহা, ইখলাস

এ সুরাটি ২য় আয়াতের আল মুমিনুন শব্দ থেকে নামকরন করা হয়েছে

নাযিল হবার সময়কাল ও মূল বিষয়বস্তুঃ

সুরাটি মক্কী, হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে। তবে ঠিক কোন সময়ে নাজিল হয়েছে তা সঠিক ভাবে বলা য়ায় না। বর্ণনাভঙ্গি ও বিষয়বস্তু হতে প্রতিয়মান হয় যে, এ সুরা রাসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়েছিল।

এ সুরার মুল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রসুলের আনুগত্য করার আহ্বান। সুরার প্রথমে এ আলোচনা করা হয়েছে যে, নবীর অনুসারী মুমিনদের কতিপয় গুনাবলী রয়েছে, এই বিশেষ গুণাবলী অর্জনকারীরাই সফলকাম। ইহকালে ও পরকালে তারাই সাফল্য লাভকরবে। পরে এ সুরায় মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি তোমাদেরকে পরকালে তার সামনে হাজির করতেও সক্ষম। তিনি তোমাদের হিসাব-কিতাব নিবেন। এ সুরায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তেমনিভাবে বিভিন্ন উম্মতের কথা উল্লেখ করে তাদের পরিনতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যেন দুনিয়াবাসী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য করে, আল্লার বিধানকে মেনে নেয়, তারই ইবাদত করে। আল্লাহর ও তার রসুলের আনুগত্য না করলে কেউ মুক্তি পাবে না এসব বিষয়গুলিই এ সুরায় আলোচনা করা হয়েছে।

সুরা আল মুমিনুনের ফজিলতঃ

হযরত উমর (রাঃ) বলেন রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি যখন অহি নাজিল হত তখন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ শুনা যেত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা অহি শুনার জন্য থেমে গেলাম। অহির বিশেষ এ অবস্থার শেষ হলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন এবং দোয়া, করতে লাগলেন

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশী দাও কম দিওনা। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর- লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর-বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও অন্যদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ো না, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্ট কর।"(তিরমিজি)

এরপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি সুরা মুমিনুনের প্রথম দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। (আহমাদ)

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াযিদ ইবনে কাবনুস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন তার চরিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ এগুলোই ছিল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চরিত্র ও অভ্যাস। (ইবনে কাসীর)

শানে নুযূল/পটভূমিঃ

অত্র সুরা বিশেষ করে তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো নাজিলের মক্কার কাফেররা যেমন ছিল ইসলামের চরম বিরোধী তেমনি পার্থিব উপকরণ

সব ছিল তাদের হাতের মুঠোয় (বাণিজ্য)। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। (আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানগত)
এই অবস্থায় কাফেররা নিজেদের অধিক সফল এবং মুসলমানদের ব্যর্থ মনে করত। তখন মুমিনদের প্রকৃত সফলতার ঘোষণা দিয়ে এ আয়াতগুলি নাজিল করেন।

প্রকৃত সফলতার অর্থ ঃ তাফসীর কারকগণ ব্যাখ্যা করেছেন কোন একটি সুন্দর দালানে এক ব্যক্তি ৫দিন থাকতে পারবে এবং যদি কুড়েঘরে থাকে তবে সারাজীবন থাকতে পারবে- এক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমান কোনটি বেছে নেবে। অথচ আখেরাতে চিরজীবনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ

অর্থঃ নিশ্চিত ভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।
এখানে মুমিন বলতে তারা যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ঈমান এনে তার আনীত বিধান মেনে নিয়েছে এবং তার দেখানো জীবনপদ্ধতি অনুসরন করেছে।
“নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ।” দিয়ে বাক্য শুরু করার তাৎপর্য বুঝতে হলে নাজিলের পরিবেশকে সম্মুখে রাখা দরকার।

- কাফিরদের ইসলাম বিরোধীতা।
- সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি।
- মুসলমানদের সামাজিক ও আর্থিক পশ্চাতপদতা।
- আল্লাহ যখন এই মুসলমানদেরই সফল বললেন তখন বোঝা যায় আল্লাহর নিকট সফলতার মানদন্ড ঈমান অর্থ নয়। প্রকৃত সাফল্য আখেরাত। (পূর্ব দ্রষ্টব্য)

আল কোরআনে সাফল্যঃ ব্যবস্থা-পত্র

অর্থঃ যে নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র রেখেছে সেই সফল।

সফলতা লাভের জায়গা আখেরাত-

(১৭) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

অর্থাৎ (হে মানুষ) তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছ। অথচ দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের জীবন অতি উত্তম এবং স্থায়ী। (সুরা আ'লা: ১৬,১৭)

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়লা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা করেছেন। যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুনে গুনান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

মুমিনদের সাতটি গুনঃ

সর্বপ্রথম গুন হলো ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় এটাকে এই সাতটি গুনের মধ্যে শামিল না করে পর পর সাতটি গুন বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম গুনঃ

অর্থ্যাৎ 'যারা তাদের নামাযে বিনয়ী ও নম্র।"

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

নামাযে খুশু বলতে বিনয় ও নম্র হওয়া বুঝায়। খশুর আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর মানে অন্তরে স্থিরতা থাকা। অর্থ্যাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনা অন্তরে ইচ্ছাকৃত ভাবে না করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা।

দিলের খুশু হয় তখন যখন কারো ভয়ে বা দাপটে দিল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর দেহের খুশু এভাবে প্রকাশ পায় যে, কারো সামনে গেলে তার মাথা নিচু হয়ে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে চোখের দৃষ্টি নত হয়ে আসে, গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যায়।

হাদীসে হযরত আবু যার (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- নামাযের সময় আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্যদিকে ভ্রুক্ষেপ করে। যখন সে অন্যকোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। (নাসায়ী) (আবু দাউদ)

শরীয়তে বর্ণিত নামাযের নিয়ম নীতি নামাযে খুশু পয়দা করতে সাহায্য করে।

যেসব কাজ নামাযে খুশু সৃষ্টিতে বাধা দেয়ঃ

১. নামাযের মধ্যে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলা করা বা নাড়াচাড়া করা।

হাদীস- একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে মুখের দাড়ী নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন-

لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُه

“যদি এ লোকটির দিলে খুশু থাকত তাহলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরও খুশু থাকত। (বায়হাকী)

২. নামাযে এদিক ওদিক তাকালে নামাযে একগ্রতা বা খুশু নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- এটা নামাযীর (মনোযোগের) উপর শয়তানের থাবা।

৩. নামাযে ছাদ বা আকাশের দিকে তাকালে নামাযের খুশু নষ্ট হয়ে যায়। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

'লোকেরা যেন নামাযে তাদের চোখকে আকাশমুখী না করে। (কেননা তাদের চোখ) তাদের দিকে ফিরে নাও আসতে পারে।'(বুখারী)

৪. নামাযে হেলা-ফেলা করা ও নানাদিকে ঝুকে পড়া।

৫. সিজদায় যাবার সময় বসার জায়গা বা সিজদার জায়গা বার বার পরিস্কার করলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। (তবে ক্ষতিকারক হলে একবার সরানো যাবে)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى

'কোন ব্যক্তি যেন নামাযের অবস্থায় (সিজদার জায়গা হতে) কংকর না সরায়। কেননা আল্লাহর রহমত নামাযী ব্যক্তির উপর প্রসারিত হয়।' (আহমেদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ)

৬. একটানা গর্দান খাড়া করে দাড়ানো এবং খুব কর্কশ স্বরে কোরআন পড়া কিংবা গীতের স্বরে কুরআন পাঠ।

৭. জোরে জোরে হাই এবং ঢেকুর তোলা। ইচ্ছা করে গলা খেকরা বা কাশি দিলে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- নামাযে হাই ওঠে শয়তানের প্রভাব থেকে যদি কারো হাই ওঠে তার উচিত সে যেন সাধ্যমতো হাই প্রতিরোধ করে। (মুসলিম, তিরমিযী)

৮. তাড়াহুড়ো করে নামায আদায় করা। নামাযে রুকু সিজদা কিয়াম সঠিক ভাবে আদায় না করা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِيْ وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِيْهِمْ قَالُوْا اَللہ وَرَسُوْلُه أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ وَأَسْوَأُ السَّرَقَةِ الَّذِيْ يَسْرِقُ صَلَاتَه قَالُوْا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَه يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا يُتِمَّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا

'মদখোর, ব্যভিচারী ও চুরি করা কবীরা গুনাহ এবং তার সাজাও খুব তবে সবচেয়ে জঘন্য চুরি হলো সেই যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে। সাহাবীরা বললেন নামাযে কিভাবে চুরি হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন নামাযে রুকু ও সিজদা ঠিকমতো না করা।' (মালেক, আহমেদ, দারেমী)

৯. নামাযীর সামনে পর্দায় কোন ছবি থাকলে নামাযে খুশু বা একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

নামাযে খুশু সৃষ্টির জন্য যা করতে হবেঃ

১. আল্লাহ তায়ালাকে সবসময় হাজির নাজির জানা।

হাদীসে জীবরীলে ইহসান সম্পর্কে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্ন করলে তার প্রতিউত্তরে তিনি বলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে (নামাযে) যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না হয়। তবে তুমি অবশ্যই মনে করে নেবে যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"

২. নামাযে পঠিত দোয়া, কালাম অন্তর থেকে পড়া।

৩. নামাযে খুশু সৃষ্টি করার জন্য নামাযীর দৃষ্টি সিজদার দিকে থাকবে।
৪. নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য নামাযে যা পড়া হয় তার অর্থ জানা।

দ্বিতীয় গুনঃ

'যারা বেহুদা কাজ ও কথা থেকে দুরে থাকে।'

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

اللَّغْوُ বলা হয় এমন প্রতিটি কাজ এবং কথাকে যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও নিস্ফল। যেসব কথা এবং কাজের কোনই ফল নেই।

اللَّغْوُ "এর অর্থ উচ্চস্তরের গুনাহ যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَالَا يَعْنِيْهِ

"মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে তখন ইসলাম সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।(তিরমিজি)।" আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

অর্থ্যাৎ- "যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" (ফুরকান-৭২)

মুমিনের মাঝে সবসময় দায়িত্বানুভুতি জাগ্রত থাকে।

তার কাছে দুনিয়াটা পরীক্ষাগার। পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট সময়ে সবকিছু করতে হয়। ফুটবল, ক্রিকেট খেলা দেখায় পার্থিব বা আখেরাতের কোন কল্যাণ নেই।

তৃতীয় গুনঃ

“যারা যাকাত বা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

যাকাত দেয়া বা যাকাতের পথে কর্মতৎপর সক্রিয় হওয়ার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিকট পার্থক্য বিদ্যমান।

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কুরআনের বিশেষ ধরনের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা বলার পেছনে তাৎপর্য আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দুটি অর্থ বিদ্যমান

১। বিশুদ্ধতা, পরিশুদ্ধতা, পরিশুদ্ধি।

২। বিকাশ সাধন: কোন জিনিসের সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় সেসব দুর করা এবং তার মৌলবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা।

এই দুটি ধারনা মিলিয়ে যাকাতের পরিপূর্ণ ধারনা সৃষ্টি হয়। তারপর এই শব্দটি, ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ পায়-

১) এমন সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়।

২) পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি-

যদি বলা হয় তবে এর অর্থ হবে তারা সম্পদ পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পদের একটি অংশ নেয়। কিন্তু যদি বলা হয় তবে তার অর্থ হবে তারা পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা তাযকিয়ার কাজ করছে। এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এর অর্থ ব্যাপক হবে। যেমনঃ

- আত্মার পরিশুদ্ধি
- চরিত্রের পরিশুদ্ধি
- জীবনের পরিশুদ্ধি
- তার পারিবারিক পরিশুদ্ধি

- নিজের, সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিশুদ্ধি।
- অর্থের পরিশুদ্ধি।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়া এর অর্থ কেবল নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (১৪) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (১৫)

অর্থ্যাৎ ঃ "কল্যাণ ও সফলতা লাভ করল সে, যে পবিত্রতার কাজ করলো এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়লো।" (সুরা আ'লা:১৪,১৫)

আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (৯) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (১০)

"সফলকাম হলো সে, যে নিজের নফসকে পবিত্র বা তাযকিয়া করলো। আর ব্যর্থ হলো সে যে নিজেকে কলুষিত করল।" (সুরা আশ শামস:৯,১০) এ আয়াতে গোটা সমাজ জীবনের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ গুণঃ

'যারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করেন।'

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

তবে তাদের স্ত্রীদের এবং মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে কেউ যদি এদের ছাড়া অন্য কাউকে কামনা তবে এক্ষেত্রে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

লজ্জাস্থান হেফাজত করার দুটি অর্থ হতে পারে।

১) নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা।

২) যৌন শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না।

এটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" বাক্য থেকে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার জন্য।

লজ্জাস্থানের সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের লোককে বাদ দেয়া হয়েছে।

১. স্ত্রী অর্থাৎ যেসব নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।

২. দাসী অথাৎ এমন বাদী যার উপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। সুতরাং মালিকানাধীন দাসীদের যৌনসম্পর্ক বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয়। কারণ এখানে স্ত্রী ও দাসী আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ বাক্যটি উপরোক্ত দুটি পন্থা ছাড়া কামনা চরিতার্থ করার যাবতীয় পথ অবৈধ করেছে। হারাম উপায়গুলি-

১.যিনা যেমন হারাম তেমনি হারাম নারীকে বিয়ে করাও যিনার মধ্যে গণ্য।

২. স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস হারাম।

৩. পুরুষ, বালক বা জীবজন্তুর সাথে কামনা চরিতার্থ করা হারাম।

৪. অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে হস্তমৈথুন এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. এছাড়া যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল-বই পড়া, ছবি দেখা। উপরোক্ত সবকিছুই সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য হবে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ গুনঃ

'যারা তাদের আমানতসমূহ এবং ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।'

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

আমানত প্রত্যাপর্ন করাঃ

আমানত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আভিধানিক অর্থে এমন একটি বিষয় শামিল যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা রাখা যায় ও ভরসা করা যায়। বিধায় আমানত শব্দটি বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত।

দু'ধরনের আমানত সংক্রান্ত কথা-

১. হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ ২. হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।

১) হক্কুল্লাহঃ

শরীয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয় থেকে দুরে থাকা। মানুষ আল্লাহর খলিফা। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের আমানত রক্ষা করা।

২) হক্কুল ইবাদঃ

১. কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক আরোপিত ধনসম্পদের আমানত।

২. গোপন কথার আমানত

৩. মজুর, শ্রমিক ও চাকরীজীবীদের জন্য যে কার্য সময় নির্ধারন করে দেয়া হয় তা পালন

৪. দায় দায়িত্বের আমানত। সংগঠন, ব্যক্তি, রাষ্ট্র, পরিবার পরিচালক হিসেবে।

৫. গণতান্ত্রিক দেশে ভোটারদের ভোট আমানত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদরে হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। (সূরা নিসা ৫৮)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَه

"তার ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই।" (আহমাদ)
তাছাড়া মোনাফেকের যে চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ১) 'কোন আমানত তার কাছে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে।' (বুখারী)

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অঙ্গীকার পূর্ণ করাঃ

অঙ্গীকার বলতে প্রথমত, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বুঝায় যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরুপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ।
দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয় অর্থ্যাৎ এক তরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেয়ার বা কোন কাজ করে দেয়ার অঙ্গীকার করা।
হাদীসে আছে, "ওয়াদাও এক প্রকার কসম"

সপ্তম গুনঃ

"যারা তাদের নামায সমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে।"

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

এখানে পাঁচওয়াক্ত নামায মুস্তাহাব বা আউয়াল ওয়াক্তে যথাযথভাবে পাবন্দী সহকারে আদায় করা বুঝায়।
এখানে নামায সমূহের সংরক্ষণ বলতে নামাযের বাইরের এবং ভেতরের যাবতীয় নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা। অর্থ্যাৎ আরকান-আহকাম পালন।

১। শরীর, পোশাক, পরিচ্ছদ পাক পবিত্র।

২। সময়মত নামায।

৩। অযু ঠিকভাবে করে নামায আদায়।

৪। জামায়াতের সাথে নামায।

৫। শুদ্ধ, ধীরস্থিরভাবে দোয়া কালাম পাঠ করা।

৬। নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নামাযের হেফাজত করা।

৭। এহসানের সাথে নামায আদায়।

কোরআনে এসেছেঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“নামায নিশ্চয়ই মানুষকে অশ্লীল, অপকর্ম থেকে বিরত রাখে।”(সূরা আনকাবুত:৪৫)

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থঃ তারাই (এসবগুনের অধিকারীগণই) উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে ফেরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। (সুরা আল মুমিনুন-১০)

এখানে উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে এজন্য যে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ যেমন উত্তরাধিকারদের নিশ্চিত প্রাপ্য। এবং গুণের অধিকারীদেরও জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত।

সফলকাম ব্যক্তিদের গুনাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে পূর্ণাঙ্গ সফল জান্নাতী ব্যক্তি।

الْفِرْدَوْس শব্দটি এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারিদিকে পাচিল দেয়া থাকে। বাগানটি বিস্তৃত হয়। মানুষের আবাস গৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সব ধরনের ফল বিশেষ করে আঙ্গুর পাওয়া

যায়। কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে এ কথাও বোঝায় যে এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু পাখি পাওয়া যায়।

কুরআনে বিভিন্ন সমষ্টিকে ফিরদাউস বলা হয়েছে।

"তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলি আছে।"

এ থেকে মনের মধ্যে এ ধারনা জন্মে যে ফিরদৌস একটা বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ বাগিচা উদ্যান রয়েছে।

শিক্ষাঃ

১। সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষনা অথবা নিছক সৎ চরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল।

২। নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালীতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। আখেরাতের স্থায়ী সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য।

৩। খুশু খুযুর সাথে নামায আদায়।

৪। বাজে কথাও কাজে সময় নষ্ট না করা

৫। সর্ববস্থায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া।

৬। অবৈধ পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চিন্তাও না করা।

৭। আমানতের হেফাজত করা এবং অঙ্গীকার বা ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করা।

৮। নামাযে পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহব ওয়াক্তে আদায় করা।

https://islamiclantern.blogspot.com/2015/01/blog-post_30.html

বই নোটঃ 🕮# রুকনিয়াতের আসল চেতনা

লেখক:অধ্যাপক গোলাম আযম;

প্রকাশক: আবু তাহের মুহাম্মমদ মাছুম। বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামী।

#লেখক পরিচিতিঃ

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ছিলেন ১৯৬৯-২০০০ সাল পর্যন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- বি এ,এম এ(রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং কারমাইকেল কলেজে অধ্যপনা করেন। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" আন্দোলনের একজন অগ্রগামী সৈনিক ছিলেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত জি এস ছিলেন, এবং তমুদ্দিন মজলিশ এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা করার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করেন। দ্বীন প্রচারের জন্য অসংখ্য বই লিখেছেন। তিনি ২৩ অক্টোবর ২০14 সালে মৃত্যুবরণ করেন।

#প্রকাশকের কথাঃ

- ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন আম্বিয়ায়ে কেরামদের পরিচালিত আন্দোলনকে অনুসরণ করেই চলেছে।
- মানবিক দুর্বলতার কারণে ব্যক্তির নিস্ক্রিয়তা থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনা মূলক বই এটি।
- কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ ডিসেম্বর জামেয়া ইসলামিয়া (তামিরুল মিল্লাত) টঙ্গীতে- অধ্যাপক গোলাম আযম তৎকালীন আমীর জা.ই.বা প্রদত্ত ভাষন।

#ইসলামী আন্দোলনের মর্মকথাঃ

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বিধান রচনা করেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে তাই পাঠিয়েছেন। এই বিধানসমূহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার প্রতি যারা ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন। যাকে খিলাফতের দায়িত্ব বলা হয়। আল্লাহর পক্ষ তার বিধানকে কায়েম করার চেষ্টাই হলো খলিফার কাজ। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এ কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ/ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হলো নবী-রাসূলগণ।

#আল্লাহর বিধান অন্য সমাজ ব্যবস্থার অধীন হতে পারেনাঃ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধ্য করেননি তার বিধান মেনে চলতে। ফলে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজের মনগড়া বিধান চালু করে। কারণ বিধান শূন্য কোন সমাজ চলতে পারে না। যখনই নবীগণ দেশবাসীকে আল্লাহর বিধান কবুলের দাওয়াত দেন, তখন এই সুবিধাবাদী মহল বিরোধিতা করেছে। হক ও বাতিলের এই সংঘর্ষের নামই ইসলামী আন্দোলন। আইন চালু করতে গিয়ে স্বার্থবাদীদের কে পরাস্ত করতে পারলেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

#জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনঃ

- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নবী রাসূলগনের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহের গতি অনুসরণ করেই চলছে।

- ইসলামী সমাজকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোক তৈরি করেন। যারা তাদের জীবনে ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলতে প্রস্তুত।
- সেই ভাবে জামায়াত ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে লোক তৈরির চেষ্টা করছে।
- যারা জামায়াতের দাওয়াত কবুল করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে এক পর্যায়ে রুকুনিয়াতের শপথ নেন। শপথের সময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে সব ওয়াদা করেন তা সঠিকভাবে পালন করলে মান বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

#রুকনদের মান কমে যাওয়ার কারণঃ

রুকনিয়াতের মান কমার আসল কারণ ২ টি।

১ দুনিয়াবি দাবীর প্রাধান্যঃ বিভিন্ন দূর্বলতার কারণে এটি ঘটে। কিন্তু দ্বীনই মুমিনের জীবনের আসল লক্ষ্য। তাই বেঁচে থাকব দ্বীনের দাবী পূরনের জন্য। আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন এবং সুখ সুবিধা বৃদ্ধি যখন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়,আর দ্বীনের দাবী পিছনে পড়ে থাকে ঠিক তখন রুকনিয়াতের মান কমাই স্বাভাবিক।

২ দারিদ্রতা জান মালের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষাঃ সূরা বাকারাঃ ১৫৫

وَ لَنَبۡلُوَنَّکُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾ - আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

দুনিয়ার জীবনের বিপদা-আপদ, দুঃখ-কষ্ট মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। তবে সকলের পরীক্ষা এক হয় না। যার দুর্বলতা যেদিকে তার পরীক্ষাও সেদিকেই হয়। সচেতন রুকন তা টের পেয়ে সাবধান হয়ে যান। আর আল্লাহর দরবারে ধরণা দেন,যাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। আর অসচেতন রুকনগন মুসীবতকে দ্বীনের কাজ না করার অজুহাত মনে করে। ফলে রুকনিয়াতের নিম্নতম মানও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে ইস্তফা দেন বা বাতিল করা হয়।

#পরীক্ষা নেওয়ার কারণঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে কেন পরীক্ষা করা হয়ঃ

সূরা আন নূরঃ ৫৫

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ كَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪ وَ لَیُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَهُمۡ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِكُوۡنَ بِیۡ شَیۡـًٔا ؕ وَ مَنۡ كَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۵۵﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে

দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।

-খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে যোগ্যতা যাচাই করার জন্য আল্লাহ এ পরীক্ষা নেন।

-মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগন কেও বহু কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাছাই করেছেন।

#পরীক্ষার মাধ্যমে রুকনিয়াতের মান বাড়েঃ

পরীক্ষায় যারা টিকে তাঁরাই আন্দোলনের যোগ্য বিবেচিত হয়। যারা ছাটাই হয় তাঁরা অযোগ্য। রুকনিয়াত মূলতবী করে ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। সংশোধন না হলে ইস্তফা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় অথবা বাতিল করা হয়।

ত্রুটি মুক্ত থাকার গুরুত্ব উপলব্ধির তাগিদ এভাবে দেয়া হয়। আমানতদারীর দাবী পূরণে অক্ষম হলেও ছাটাই করা হয়।

#রুকনিয়াতের আসল চেতনাঃ

রুকনিয়াতের আসল চেতনার অভাবেই রুকনিয়াতের মান কমে যায়।

আসল চেতনা ৫ টিঃ

- ✓ দ্বীনি যিন্দেগী তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়।
- ✓ মান কমার মূল কারণ সম্পর্কে সতর্কতা।
- ✓ আল্লাহর বাছাই ও ছাটাই নীতি সম্পর্কে সাবধানতা।
- ✓ জনগণের নিকট সত্যের সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব।
- ✓ আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দা।

#দ্বীনি যিন্দেগী তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায়ঃ

ফরজ,ওয়াজিব মানা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা মুমিনের সর্বনিম্ন স্তর এটি। যা রুকন হওয়ার শর্ত। সুতরাং রুকনের মানকে বড়জোড় **কামিল মুমিনের নিম্নতম মান** বলা যায়। অনেকের নিকট রুকন হওয়া অনেক কঠিন বিষয় হলেও প্রকৃত পক্ষে তা কামিল মুমিনের সর্বনিম্ন স্তর মাত্র।

দ্বীনি জিন্দেগীর তরক্কী ও উন্নতিকে একটি সিঁড়ির সাথে তুলনা করলে এ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ হলো সাহাবায়ে কেরামদের মান। এ দীর্ঘ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পৌঁছে দেয় জামায়াত রুকন হওয়ায় মাধ্যমে দ্বীনি জিন্দেগীকে উন্নত করার সাধনা রুকনেরই দায়িত্ব।

আত্বগঠনের জন্য ইলম বৃদ্ধি করা,ইবাদতের অভ্যাস করা, ওয়াদা করা, সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়া, নিজের মনের তাগিদে যারা করে তাদের দ্বীনি জিন্দেগীর উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক।

ব্যক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো ও যারা কবুল করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দান করলে আল্লাহর সন্তুষ্ট আশা করা যায়।

আল্লাহ তাদের আনসারুল্লাহ মর্যাদা দেন। নিষ্ঠার সাথে দু-দফা কাজ করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

#মান কমার মূল কারণ সম্পর্কে-সতর্কতাঃ

আত্ম সমালোচনার সময় খেয়ালে আনতে হবে যে, আমার যাবতীয় কর্মকান্ডে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে দ্বীনকে প্রাধান্য দিচ্ছি কিনা। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে দায়িত্বশীল, দ্বীনি ভাইদের জানিয়ে দোয়া চাইতে হবে। পরীক্ষায় সবর করতে হবে, আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। ইখলাসের সাথে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতে হবে।

#আল্লাহর বাছাই ও ছাটাই নীতি সম্পর্কে সাবধানতাঃ
মৃত্যু পর্যন্ত হেদায়েতের পথে টিকে থাকার জন্য চেষ্টা ও দোয়া করতে হবে। যখন কাউকে দ্বীনের পথে চলার তাওফিক দেন তখন তাকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ তাঁকে বাছাই করেছেন।
পরীক্ষায় ফেল করে ধৈর্য ও সাহসের অভাবে দ্বীনের পথে চলার হিম্ম ত হারায়। তখন বুঝতে হবে সে ছাঁটাই হয়ে গেছে।
সূরা হজ্জঃ শেষ আয়াত-

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ڏ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ ښ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝ۧ ٧٨

আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

সূরা নিসা আয়াত ৫৯

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓااَطِيْعُوااللّٰهَوَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَوَ اُولِيالْاَمْرِمِنْكُمْۚ فَاِنْتَنَازَعْتُمْ
فِيْشَيْءٍفَرُدُّوْهُاِلَياللّٰهِوَالرَّسُوْلِاِنْكُنْتُمْتُؤْمِنُوْنَبِاللّٰهِوَالْيَوْمِالْاٰخِرِؕ ذٰلِكَ خَيْرٌوَّاَحْسَنُتَاْوِيْلًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

যারা ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা বিপদকে অগ্রাহ্য করে ইসলামী আন্দোলনের পথে মজবুত হয় টিকে থাকে তারা আল্লাহর বাছাইয়ে গন্য। যারা দুর্বলতার শিকার তারা ছাঁটাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাছাইয়ের চেতনা জাগ্রত থাকলে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে না নিশ্চয়। তাই ছাটাই থেকে হেফাজতের দোয়া করতে হবে।

#জনগণের নিকট সত্যের সাক্ষ্য বহনের দায়িত্বঃ

কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহর বান্দাদের যে সব গুনের বিবরণ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা এক দিকে সর্বসাধারনকে চিন্তার আহবান করা হয়েছে। যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে এমন গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে তাঁদের প্রশংসা করতে বাধ্য তোমরা।

মানবিক গুণাবলীর অধিকারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। রুকনদের মান এ পর্যায়ে পৌছালে জনগণের আশা,আস্থার সঞ্চার হবে

যে, জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত।

#আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দাঃ

আল্লাহর ব্যাংকে যা জমা হবে সে টুকু শুধু তারই। এ জন্য রুকনদের ধান্দা হবে জমার পরিমাণ বাড়ানো। ইয়ানত ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে দিতে হবে যাতে কুরবানির অনুভূতি জাগ্রত হয়। আল্লাহর জন্য খরচ করলে আল্লাহ বরকত দেবেন। বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এই অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

 # চেতনার সুফলঃ

উপরের এই ৫ টি চেতনা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আগানো সহজ হবে। এ তরক্কীর শেষ নেই। রোকন এর দায়িত্ব নিজ চেষ্টায় অবিরাম উন্নত করার সাধনা করা। অনেক লোককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উদাহরণ : ইঞ্জিন ও বগি। চেতনা জাগ্রত থাকলে উভয় দায়িত্বই যোগ্যতার সাথে পালন করা সম্ভব।

#কর্মীদের জন্য আদর্শ হতে হবেঃ

রুকনদের মান উন্নত হলে তারা হবে কর্মীদের আদর্শ। অন্যথায় কর্মীদের অগ্রগতির পথে বাধা বলে গন্য হবে। রুকন সংগঠনের সম্পদে পরিনত হলেই আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভব। রুকনিয়াতেরমান সম্পর্কে সচেতন থাকলেই সংগঠনের জন্য সময়,শ্রম ও অর্থব্যয় যথার্থ ভাবে সফল হবে।

 # চেতনার অভাবঃ

জামায়াতে ইসলামীতে রোকন হওয়ার জন্য দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ফলে কেউ আবেগের বশবর্তি হয়ে নয় বরং স্বজ্ঞানে চেষ্টার মাধ্যমে

রোকন হতে হয়। এ অব্যাহতি চাওয়ার অর্থ হল এর দায়িত্ববোধ, মর্যাদা, চেতনাবোধ থেকে বঞ্চিত। আবার আল্লাহর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে তারা ছাঁটাই হন। ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের জন্য এই সংগঠনে যোগদান করে কিন্তু যদি কেউ এই কাজের জন্য আরও উন্নত সংগঠনে যোগদানের জন্য পদত্যাগ করলে তা দোষের না হলেও ব্যক্তিগত দুর্বলতা থেকে সংগঠন ত্যাগ করা হাদিসের মত অনুযায়ী তিনি ইসলামের রশি গলা থেকে ছুড়ে ফেলেন।

#আল্লাহর দরবারে ধরনাঃ

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আমরা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের শরিক আছি। তাই আমাদের শুকরিয়া আদায় করতে হবে, আর দোয়া করতে হবে এই পথে অবিচল থাকার জন্য।

সংগঠন সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-ইমরান-১০৩,১০৪, আস সফ- ৪, ও ১টি হাদীস মুখস্ত- পৃ ২২০

তাহারাত সংক্রান্ত মাসআলা

ক- ত্বহারাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়:

ত্বহারাতের শাব্দিক অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। আর পরিভাষায় শরীরে বিদ্যমান যেসব অপবিত্রতার কারণে সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত পালন করা নিষিদ্ধ, তা দূর করাকে ত্বহারাত বলে।

পানি

খ- পানির প্রকারভেদ: পানি তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার পবিত্র পানি: আর তা হলো পানি তার সৃষ্টিগত স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকা। আর তা হলো যে পানি দ্বারা অপবিত্রতা ও

শরীরের পবিত্র অঙ্গের আপতিত নাজাসাত দূর করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

"এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন।" [সূরা আনফাল, আয়াত: ১১]

দ্বিতীয় প্রকার পবিত্র পানি: যে পানি নাজাসাত ছাড়াই রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ ধরণের পানি নিজে পবিত্র; তবে এর যে কোনো একটি গুণাবলী পরিবর্তন হওয়ার কারণে এর দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা যাবে না।

তৃতীয় প্রকার অপবিত্র পানি: যে পানি অল্প বা বেশি নাজাসাতের কারণে এর যে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

অপবিত্র পানি পবিত্র হয়ে যাবে, তার পরিবর্তনের কারণ নিজে নিজে দূর হলে বা উক্ত পানি শুকিয়ে ফেললে অথবা এর সাথে এতটুকু পরিমাণ পানি মিশানো; যাতে পরিবর্তনের কারণ দূরীভূত হয়ে যায়।

যখন কোনো মুসলিম পানির অপবিত্রতা বা পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে তখন সে তার নিশ্চিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর তা হলো, পবিত্র বস্তুসমূহের আসল হচ্ছে পবিত্র থাকা।

যখন কোনো পানি, যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় আর যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না এমন কোনো পানির সাথে সন্দেহে নিপতিত করবে তখন তা বাদ দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

যখন কোনো পবিত্র কাপড়, অপবিত্র বা হারাম কাপড়ে সাথে সন্দেহে নিপতিত করবে তখন ইয়াকীনের ওপর ভিত্তি করবে এবং সে কাপড় দ্বারা কেবল একটি সালাত আদায় করবে।

পবিত্রতার প্রকারভেদ

শরী'আতে পবিত্রতা দু'প্রকার। অপ্রকাশ্য বা আত্মিক এবং প্রকাশ্য বা বাহ্যিক পবিত্রতা। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছোট বড় নাপাকী ও নাজাসাত থেকে পবিত্র করাকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে। আর পাপ-পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পবিত্র করাকে অপ্রকাশ্য বা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলে।

প্রকাশ্য পবিত্রতাই ফিকহের বিষয়; যা সালাতে বাহ্যিকভাবে উদ্দেশ্য। এটি আবার দু'প্রকার: হাদাস (অদৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা ও খাবাস (দৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা। হাদাস থেকে পবিত্রতা তিনভাবে অর্জিত হয়: ১. বড় পবিত্রতা, তা গোসলের মাধ্যমে। ২. ছোট পবিত্রতা, তা অযুর মাধ্যমে। ৩. আর এ দু'টি ব্যবহার করতে অক্ষম তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অনুরূপভাবে খাবাস থেকে পবিত্রতাও তিনভাব অর্জিত হয়: গোসল, মাসেহ ও পানি ছিটানো।

পানির পাত্র সংক্রান্ত বিধি-বিধান

পানির পাত্রের পরিচয়:

ক. শাব্দিক পরিচিতি:

পানির পাত্রকে আরবীতে (الآنية) 'আনিয়া' বলা হয়। যে শব্দটি (إناء) 'ইনা' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ আহার কিংবা পান-পাত্র। শব্দটির

বহুবচনের বহুবচন হলো (أوان)। আরবী ভাষায় এর কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে, (ظرف) 'যারফ' ও (ماعون) মা'উন।

ফকীহগণ শাব্দিক অর্থেই এটাকে ব্যবহার করেছেন।

খ- পাত্রের প্রকারভেদ:

সত্তাগত দিক থেকে পাত্র কয়েক প্রকার। যথাঃ

১- সোনা ও রূপার পাত্র।

২- রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র।

৩- কাঁচের পাত্র।

৪- মূল্যবান ধাতুর পাত্র।

৫- চামড়ার পাত্র।

৬- হাড়ের পাত্র।

৭- উপরে বর্ণিত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য পাত্র। যেমন, চীনামাটির পাত্র, কাঠের পাত্র, পিতলের পাত্র ও সাধারণ পাত্র।

গ- পাত্রের শর'ঈ হুকুম:

সোনা, রূপা ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য সব পাত্র ব্যবহার করা বৈধ; চাই তা মূল্যবান হোক বা অল্প মূল্যের হোক। কেননা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَتَشْرَبُوافِيآنِيَةِالذَّهَبِوَالفِضَّةِ،وَلاَتَأْكُلُوافِيصِحَافِهَا،فَإِنَّهَالَهُمْفِيالدُّنْيَاوَلَنَافِيالآخِرَةِ

“তোমরা সোনা ও রুপা পাত্রে পান করবে না। আর এসব পাত্রে খানা খাবে না। এগুলো দুনিয়াতে তাদের (অমুসলিমের) জন্য আর আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে।”[১]

যে সব পাত্র ব্যবহার করা হারাম তা অন্যান্য উদ্দেশ্যে গ্রহণ করাও হারাম। যেমন, বাদ্যযন্ত্র গানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। কেননা হাদীসটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এটা জানা আবশ্যক যে, সন্দেহের কারণে কোনো পাত্র অপবিত্র হবে না; যতক্ষণ নিশ্চিতভাবে অপবিত্র হওয়া জানা না যাবে। কেননা মূল হলো পবিত্র হওয়া।

ঘ- অমুসলিমের পাত্রঃ

অমুসলিমদের পাত্র বলতে বুঝানো হচ্ছেঃ

১- আহলে কিতাবীদের পাত্র।

২- মুশরিকদের পাত্র।

- ✓ এসব পাত্রের শর‘ঈ হুকুম হলো এগুলো অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত না হলে তা ব্যবহার করা জায়েয। কেননা মূল হলো পবিত্র হওয়া।
- ✓ অমুসলিমের জামা কাপড় পবিত্র, যতক্ষণ তা অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত না হয়।
- ✓ যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ সেসব মারা গেলে সেসবের মৃত চামড়া দাবাগাত (প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার উপযোগী) করলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

- ✓ আর যেসব প্রাণীর জীবিত অবস্থায় কোনো অংশ বিচ্ছেদ করা হয়েছে তা মৃত-প্রাণীর মতোই অপবিত্র। তবে জীবিত অবস্থায় পশম, পালক, চুল ও লোম নেওয়া হলে তা পবিত্র।

খাবার ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখা সুন্নত। জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَ أَوْكِسِقَاءَكَوَ اذْكُرِ اسْمَاللَّهِ،وَخَمِّرْ إِنَاءَكَوَ اذْكُرِ اسْمَاللَّهِ،وَ لَوْتَعْرُضُعَلَيْهِشَيْئًا

"তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম স রণ করো। সামান্য কিছু দিয়ে হলেও তার উপর দিয়ে রেখে দাও।"[২]

[১] সহীহ বুখারী, আল-আত'ঈমা, হাদীস নং ৫১১০; সহীহ মুসলিম, লিবাস ওয়ায-যিনা, হাদীস নং ২০৬৭; তিরমিযী, আশরিবা, হাদীস নং ১৮৭৮; নাসাঈ, আয-যিনা, হাদীস নং ৫৩০১; আবু দাউদ, আল-আশরিবা, হাদীস নং ৩৭২৩; ইবন মাজাহ, আশরিবা, হাদীস নং ৩৪১৪; আহমদ, ৫/৩৯৭; আদ-দারেমী, আল-আশরিবা, হাদীস নং ২১৩০।

[২] সহীহ বুখারী, বাদউল খালক, হাদীস নং ৩১০৬; সহীহ মুসলিম, আল-আশরিবা, হাদীস নং ২০১২; তিরমিযী, আল-আত'ঈমা, হাদীস নং ১৮১২; আবু দাউদ, আল-আশরিবা, হাদীস নং ৩৭৩১; আহমদ, ৩/৩০৬; মালেক, আল-জামে', হাদীস নং ১৭২৭।

ইস্তিঞ্জা ও পেশাব পায়খানার আদবসমূহ

ইস্তিঞ্জা: ইস্তিঞ্জা হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা।

ইস্তিজমারঃ আর ইস্তিজমার হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা কাগজ বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দূর করা।

- পেশাব পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দো'আ পড়া, بسماللّه،أَعُوذُبِاللهِمِنَالْخُبْثِوَالْخَبَائِثِ
- বিসমিল্লাহ, আমি মন্দকাজ ও শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি" ।[১]
- আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়ে বের হওয়া এবং এ দো'আ পড়া,

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُلِلَّهِالَّذِيأَذْهَبَعَنِّيالْأَذَىوَعَافَانِي

- " হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন" ।[২]
- পেশাব-পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা মুস্তাহাব, তবে খালি জায়গায় পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের দৃষ্টির বাহিরে নির্জন স্থানে বসা। পেশাব করার সময় নরম স্থান নির্বাচন করা, যাতে পেশাবের ছিটা থেকে পবিত্র থাকা যায়।
- অতি প্রয়োজন ছাড়া এমন কোনো কিছু সাথে নেওয়া মাকরূহ যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে। তাছাড়া জমিনের কাছাকাছি না হওয়ার আগে কাপড় তোলা, কথা বলা, গর্তে পেশাব করা, ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ডান হাত দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা মাকরূহ।

- উন্মুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরিয়ে বসা হারাম, আর ঘরের মধ্যে বসা জায়েয, তবে না বসা উত্তম।
- চলাচলের রাস্তা, বসা ও বিশ্রামের জায়গায়, ফলদার ছায়াদার গাছ ইত্যাদির নিচে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।
- পবিত্র পাথর দিয়ে তিনবার শৌচকর্ম করা মুস্তাহাব। এতে ভালোভাবে পবিত্র না হলে সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যাবে। তবে বেজোড় সংখ্যা তিন বা পাঁচ বা ততোধিক বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা দ্বারা কাজটি শেষ করা সুন্নাত।
- হাড়, গোবর, খাদ্য ও সম্মানিত জিনিস দ্বারা ঢিলা করা হারাম। পানি, টিস্যু ও পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢিলা করা জায়েয। তবে শুধু পানি ব্যবহার করার চেয়ে পাথর ও পানি একত্রে ব্যবহার করা উত্তম।
- কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলে তা পানি দিয়ে ধৌত করা ফরয। আর যদি অপবিত্র স্থান অজ্ঞাত থাকে তবে পুরো কাপড় পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। বসে পেশাব করা সুন্নাত, তবে পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়।

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৫।

[২] হাদীসের প্রথম অংশটুকু আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর দ্বিতীয় অংশটুকু ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩০১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ‘য়ীফ বলেছেন।

স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ

পরিচিতি: সরল পথ, সৃষ্টিগত স্বভাব। যেসব গুণাবলী মানুষের জীবনে থাকা অত্যাবশ্যকীয় সেগুলোকে স্বভাবজাত সুন্নাত বলে।

১- মিসওয়াক করা: এটা সব সময় করা সুন্নাত। মুখের পবিত্রতা ও রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করা হয়। অযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদে ও গৃহে প্রবেশ, ঘুম থেকে জাগ্রত হলে ও মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে মিসওয়াক করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২- নাভির নিচের লোম কামানো, বগলের লোম উপড়ানো, নখ কাটা ও আঙ্গুলের গিরা ধৌত করা।

৩- মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা করা ও ছেড়ে দেওয়া।

৪- মাথার চুলের সম্মান করা, এতে তেল দেওয়া এবং আঁচড়ানো। চুলে গোছা রাখা অথাৎ মাথার এক অংশ কামানো আর বাকী অংশ না কামানো মাকরূহে তাহরীমী; কেননা এতে স্বাভাবিক সৃষ্টিগত সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

৫- মেহেদী বা অনুরূপ উদ্ভিদ দিয়ে চুলের সাদা অংশ পরিবর্তন করা।

৬- মিসক বা অন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৭- খৎনা করা। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ঢেকে থাকা চামড়া কর্তন করা যাতে এতে ময়লা ও পেশাব জমে থাকতে না পারে।আর মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গের উপরিভাগে পুংলিঙ্গ প্রবেশদ্বারের চামড়ার কিছু অংশ কেটে ফেলা, এটা বিচির মতো বা মোরগের চূড়ার (বৌল) মতো। খৎনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এটি জানেন। খৎনা মূলত পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করা হয়। এতে অনেক ফযীলত রয়েছে। পুরুষের জন্য খৎনা করা সুন্নাত আর নারীর জন্য এটা করা সম্মানজনক।

অযু: অযুর পরিচিতি:শরী‘আতের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী পবিত্র পানি চার অঙ্গে ব্যবহার করা।

খ- অযুর ফযীলত: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস অযুর ফযীলত প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন,

:مَامِنْكُمْمِنْأَحَدٍيَتَوَضَّأُفَيُسْبِغُالْوَضُوءَثُمَّيَقُولُ

أَشْهَدُأَنْلَاإِلَهَإِلَّااللهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَهُوَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّدًاعَبْدُهُوَرَسُ

ولُهُإِلَّافُتِحَتْلَهُأَبْوَابُالْجَنَّةِالثَّمَانِيَةُيَدْخُلُمِنْأَيِّهَاشَاءَ

" তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অযু করে এ দো'আ পাঠ করবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্ম াদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।"[১]

অযুতে অপচয় না করে উত্তমরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করলে কিয়ামতের দিন অযুকারীর হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকা আবশ্যক করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّأُمَّتِييُدْعَوْنَيَوْمَالقِيَامَةِغُرًّامُحَجَّلِينَمِنْآثَارِالوُضُوءِ،فَمَنِاسْتَطَ

اعَمِنْكُمْأَنْيُطِيلَغُرَّتَهُفَلْيَفْعَلْ

"কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, অযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।"[২]

গ- অযুর শর্তাবলী: অযুর শর্তাবলী দশটি। সেগুলো হলো:

১- ইসলাম।

২- জ্ঞান বা বিবেক।

৩- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৪- নিয়ত করা এবং পবিত্রতা অর্জন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ত অবশিষ্ট থাকা।

৫- যেসব কারণে অযু ফরয হয় সেসব কারণ দূর হওয়া।

৬- ইস্তিঞ্জা করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা) ও ইস্তিজমার করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা পাতা বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দুর করা)।

৭- পানি পবিত্র হওয়া।

৮- পানি বৈধ হওয়া।

৯- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।

১০- যে ব্যক্তির সর্বদা অপবিত্র হওয়ার সমস্যা থাকে তার ক্ষেত্রে ফরয সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

ঘ- অযু ফরয হওয়ার কারণ:

হাদাস বা সাধারণ অপবিত্রতা পাওয়া গেলে অযু ফরয হয়।

ঙ- অযুর ফরযসমূহ: অযুর ফরয ছয়টি:

১- মুখমণ্ডল ধৌত করা আর মুখ ও নাক মুখমণ্ডলেরই অংশ।

২- কনুইসহ দুহাত ধৌত করা।

৩- মাথা মাসেহ করা আর দু'কানও মাথারই অংশ।

৪- দু'পা ধৌত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ٦ ﴾ [المائدة: ٦]

" হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

৫- ধৌত অঙ্গের মধ্যে পরস্পর ক্রমবিন্যাস বজায় রাখা। কেননা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং দু অঙ্গ ধোয়ার মধ্যে একটি মাসেহ করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। (যা ক্রমবিন্যাস আবশ্যক হওয়া বুঝায়)।

৬- অযু করার সময় এক অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথেই বিলম্ব না করে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন।

চ- অযুর সুন্নতসমূহ: অযুর সুন্নতসমূহের অন্যতম হলো:

১- মিসওয়াক করা।

২- হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৩- কুলি ও নাকে পানি দেওয়া।

৪- ঘন দাড়ি ও হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

৫- ডান দিক থেকে শুরু করা।

৬- দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা।

৭- কান ধোয়ার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করা।

৮- অযুর পরে দো'আ পড়া।

৯- অযুর পরে দু'রাকাত সালাত আদায় করা।

ছ- অযুর মাকরূহসমূহ: অযুর মাকরূহসমূহের অন্যতম হলো:

১- অপবিত্রতা ছিটে অযুকারীর দিকে আসতে পারে এমন অপবিত্র স্থানে অযু করা।

২- অযুতে তিনবারের অধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার ধৌত করেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ "অতঃপর যে ব্যক্তি এর অধিক করে সে অবশ্যই জুলুম ও অন্যায় করে।"[৩]

৩- পানি ব্যবহারে অপচয় করা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে অযু করেছেন। আর মুদ হলো এক মুঠো। তাছাড়া যেকোনো কিছুতে অপচয় করা নিষেধ।

৪- অযুতে এক বা একাধিক সুন্নত ছেড়ে দেওয়া; কেননা সুন্নত ছেড়ে দিলে সাওয়াব কমে যায়। তাই সুন্নতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিৎ, ছেড়ে দেওয়া অনুচিত।

জ- অযু ভঙ্গের কারণসমূহ:

অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি, সেগুলো হলো:

১- পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।

২- শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ থেকে কোনো কিছু বের হওয়া।

৩- পাগল, বেহুশ বা মাতাল ইত্যাদি কারণে জ্ঞানশূণ্য হওয়া।

৪- পুরুষ বা নারী কর্তৃক তাদের লজ্জাস্থান পর্দা ব্যতীত সরাসরি স্পর্শ করা।

৫- পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করা।

৬- উটের গোশত খাওয়া।

৭- যেসব কারণে গোসল ফরয হয় সেসব কারণে অযুও ফরয হয়, যেমন ইসলাম গ্রহণ ও বীর্য বের হওয়া, তবে মারা গেলে শুধু গোসল ফরয হয়, অযু ফরয হয় না।

[১] সহীহ মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৩৪; তিরমিযী, ত্বহারাত, হাদীস নং ৫৫; নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪৮; ইবন মাজাহ, তাহারাত ও এর সুন্নাতসমূহ, হাদীস নং ৪৭০; মুসনাদ আহমদ, ৪/১৫৩।
[২] সহীহ বুখারী, অযু, হাদীস নং ১৩৬; সহীহ মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৪৬; ইবন মাজাহ, যুহুদ, হাদীস নং ৪৩০৬; মুসনাদ আহমদ, ২/৪০০; মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৬০।
[৩] সুনান নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪০; আবু দাউদ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৩৫।

গোসল

ক- গোসলের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতিঃ দম্মা যোগে (الغُسل) গুসল অর্থ পানি, ফাতহা যোগে (الغَسل) গাসল অর্থ গোসল করা আর কাসরা যোগে (الغِسل) গেসল অর্থ পরিস্কার করার উপাদান।শরী'আতের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাথার অগ্রভাগ থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত সারা শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করা। এতে নারী ও পুরুষ সবাই সমান, তবে হায়েয ও নিফাসের গোসলের সময় রক্তের চিহ্ন পরোপুরিভাবে দূর করতে হবে যাতে রক্তের দুর্গন্ধ দূর হয়।

খ- গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ:

গোসল ফরয হওয়ার কারণ ছয়টি:

১- নারী বা পুরুষের কামভাবের সাথে সজোরে বীর্য বের হওয়া।

২- পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করলে।

৩- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যতীত অন্যসব মুসলিম মারা গেলে গোসল ফরয।

৪- প্রকৃত কাফির বা মুরতাদ ইসলাম গ্রহণ করলে।

৫- হায়েয হলে।

৬- নিফাস হলে।

গ- ইসলামে মুস্তাহাব গোসলসমূহ:

১- জুমু'আর দিনের গোসল।

২- ইহরামের গোসল।

৩- মাইয়্যেতকে গোসলকারী ব্যক্তির গোসল।

৪- দুই 'ঈদের গোসল।

৫- কারো পাগল বা বেহুশ অবস্থা কেটে গেলে।

৬- মক্কায় প্রবেশের গোসল।

৭- সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য গোসল।

৮- মুস্তাহাযা তথা প্রদররোগগ্রস্তা নারীর প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য গোসল।

৯- সব ধরণের ভালো সম্মেলনের জন্য গোসল।

ঘ- গোসলের শর্তাবলী: গোসলের শর্তাবলী সাতটি:

১- যে কারণে গোসল ফরয হয় তা শেষ হওয়া।

২- নিয়ত করা।

৩- ইসলাম।

৪- আকল বা বুদ্ধি-বিবেক।

৫- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৬- পবিত্র ও বৈধ পানি।

৭- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।

ঙ- গোসলের ওয়াজিবসমূহ:

গোসলের ওয়াজিব হলো বিসমিল্লাহ বলা, ভুলে গেলে এ ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়, ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে ওয়াজিব ছুটে যাবে।

চ- গোসলের ফরযসমুহ:

নিয়ত করা, সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা, মুখ ও নাকে পানি প্রবেশ করানো। পানি পৌঁছল কিনা এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হলেই যথেষ্ট হবে। কেউ সুন্নাত বা ফরয গোসলের নিয়ত করলে এক নিয়ত অন্য নিয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। জানাবাত ও হায়েযের গোসল একই নিয়াতে যথেষ্ট হবে।

ছ- গোসলের সুন্নাতসমুহ:

১- বিসমিল্লাহ বলা।

২- গোসলের শুরুতে শরীরে বিদ্যমান অপবিত্রতা বা ময়লা দূর করা।

৩- পাত্র হাত ঢুকানোর পূর্বে দুহাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৪- গোসলের শুরুতে অযু করা।

৫- ডান দিক থেকে শুরু করা।

৬- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

৭- সারা শরীরে হাত মর্দন করা।

৮- গোসল শেষে দুপা অন্য স্থানে সরে ধৌত করা।

জ- গোসলের মাকরূহসমূহ:

গোসলে নিম্নোক্ত কাজ করা মাকরূহ:

১- পানির অপব্যয় করা।

২- অপবিত্র স্থানে গোসল করা।

৩- দেয়াল বা পর্দা ছাড়া খোলা জায়গায় গোসল করা।

৪- স্থির পানিতে গোসল করা।

ঝ- জুনুবী বা বড় অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ করা হারাম:

১- সালাত আদায় করা।

২- বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।

৩- গিলাফ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা ও বহন করা।

৪- মসজিদে বসা।

৫- কুরআন পড়া।

নাজাসাত তথা নাপাকীর বিধিবিধান ও তা দূর করার পদ্ধতি

ক- নাজাসাত (নাপাকী) এর শাব্দিক ও শর'ঈ অর্থ: নাজাসাতের শাব্দিক অর্থ ময়লা, যেমন বলা হয় نجسالشيءنجسا বস্তুটি ময়লা হয়েছে। আবার বলা হয়, تلطخبالقذر :صارنجسا :تنجسالشيء অর্থাৎ ময়লা মাখিয়ে দেওয়া।শরী'আতের পরিভাষায় 'নাজাসাত' হলো, নির্দিষ্ট পরিমাণ ময়লা যা সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, পেশাব, রক্ত ও মদ।

খ- নাজাসাতের ধরণ:

নাজাসাত দু'ধরণের: ১- সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত। ২- হুকমী তথা বিধানগত নাজাসাত।

সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত হলো কুকুর ও শূকর ইত্যাদি। এসব নাজাসাত ধৌত করা বা অন্য কোনো উপায়ে কখনো পবিত্র হয় না। আর **হুকমী** তথা বিধানগত নাজাসাত হলো ঐ নাপাকী যা পবিত্র স্থানে পতিত হয়েছে।

গ- নাজাসাতের প্রকারভেদঃ

নাজাসাত তিন প্রকার। যথা:

১- এক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

২- আরেক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

৩- আরেক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার পরও ক্ষমার পর্যায়ে। অর্থাৎ কোনো ক্ষতি হয় না। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১- যেসব নাজাসাত অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, সেগুলো হলোঃ

ক- সব স্থলচর মৃতপ্রাণী। জলচর মৃতপ্রাণী পবিত্র এবং খাওয়া হালাল।

খ- প্রবাহিত রক্ত, যা স্থলচর প্রাণী জবেহ করার সময় প্রবাহিত হয়।

২- শূকরের মাংস।

৩- মানুষের পেশাব।

৪- মানুষের পায়খানা।

৫- মযী বা কামরস[১]।

৬৭- অদী[২]।

৭- যেসব প্রাণী খাওয়া হালাল নয় তার গোশত।

৮- জীবিত প্রাণীর কর্তিত অংশ। যেমন, জীবিত ছাগলের বাহু কেটে ফেললে।

৯- হায়েযের রক্ত।

১০- নিফাসের রক্ত।

১১- ইস্তেহাযা বা প্রদরগ্রস্ত নারীর রক্ত।

২- যেসব জিনিস অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন তা হলো:

১- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর প্রস্রাব।

২- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর গোবর।

৩- বীর্য।

৪- কুকুরের লালা।

৫- বমি।

৬- রক্তহীন মৃতপ্রাণী, যেমন মৌমাছি, তেলাপোকা, পাখাবিহীন ক্ষুদ্র কীট ইত্যাদি।

৩- যেসব নাজাসাত অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মার্জনা করা হয়েছে, অর্থাৎ দোষমুক্ত। সেগুলো হলো:

১- রাস্তার মাটি।

২- সামান্য রক্ত।

৩- মানুষ বা গোশত খাওয়া যায় এমন হালাল প্রাণীর বমি ও পুঁজ।

নাজাসাত পবিত্র করার পদ্ধতি: গোসল, পানি ছিটিয়ে দেওয়া, ঘর্ষণ ও মুছে ফেলার মাধ্যমে নাজাসাত পবিত্র করা যায়।

অপবিত্র কাপড় পবিত্রকরণ: যদি নাজাসাত আকার ও আয়তন বিশিষ্ট দৃশ্যমান বস্তু হয় তবে প্রথমে তা ঘষে তুলে ফেলতে হবে অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি নাজাসাত ভেজা হয় তবে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

শিশুর পেশাব পবিত্রকরণ: যেসব শিশু আলাদা খাদ্য খায় না সেসব শিশুর পেশাব পানি ছিটিয়ে দিলে পবিত্র হয়ে যায়।

জমিনে লেগে থাকা নাজাসাত আকার আয়তন বিশিষ্ট দৃশ্যমান নাজাসাত দূর করার মাধ্যমে পবিত্র করা হবে। আর যদি জমিনের সাথে থাকা

নাজাসাত তরল বস্তু হয় তবে তাতে পানি ঢেলে পবিত্র করতে হবে। আর জুতা মাটিতে ঘর্ষণ বা পবিত্র জায়গায় হাটলে পবিত্র হয়ে যায়। মসৃণ জিনিস যেমন, কাঁচ, চাকু, প্রস্তরফলক ইত্যাদি মুছে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়। কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে, তবে একটিবার মাটি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

[১] মযী হলো, স্বচ্ছ, পাতলা, পিচ্ছিল পানি, যা যৌন উত্তেজনার শুরুতে বের হয় কিন্তু চরম পুলক অনুভব হয় না, তীব্র বেগে বের হয় না ও বের হওয়ার পর কোনো ক্লান্তি আসে না। অনেক সময় এ পানি বের হওয়ার বিষয়টি অনুভব করা যায় না। -অনুবাদক।

[২] পেশাবের আগে পরে নির্গত রস। -অনুবাদক।

তায়াম্মুম

১- তায়াম্মুমের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

ক- তায়াম্মুমের শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা, কামনা করা, মনস্থ করা।

খ- তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থ: পবিত্র মাটি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুখ ও দু হাত মাসাহ করা।

আল্লাহ এ উম্মতের জন্য যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন তায়াম্মুম সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এটি পানির পরিবর্তে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম।

২- কার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ:

ক- পানি পাওয়া না গেলে বা পানি দূরে থাকলে।

খ- কারো শরীরে ক্ষত থাকলে বা অসুস্থ হলে এবং সে পানি ব্যবহার করলে ক্ষত বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।

গ- পানি অতি ঠাণ্ডা হলে এবং গরম করতে সক্ষম না হলে।

ঘ- যদি মজুদ পানি ব্যবহারের কারণে নিজে বা অন্য কেউ পিপাসায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা করে।

৩- তায়াম্মুম ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

ক- বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

খ- মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

গ- অপবিত্রতা নষ্টকারী কোনো কিছু ঘটা।

৪- তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

ক- ইসলাম।

খ- হায়েয বা নিফাসের রক্ত শেষ হওয়া।

গ- আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

ঘ- পবিত্র মাটি পাওয়া।

৫- তায়াম্মুমের ফরযসমূহ:

ক- নিয়ত।

খ- পবিত্র মাটি।

গ- একবার মাটিতে হাত মারা।

ঘ- মুখমণ্ডল ও হাতের তালু মাসাহ করা।

৬- তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ:

ক- বিসমিল্লাহ বলা।

খ- কিবলামুখী হওয়া।

গ- সালাতের আদায়ের ইচ্ছা করার আগে করা

ঘ- দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারা।

ঙ- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

চ- এক অঙ্গের সাথে বিরতিহীন অন্য অঙ্গ মাসাহ করা।

ছ- আঙ্গুল খিলাল করা।

৭- তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহঃ

ক- পানি পাওয়া গেলে।

খ- উল্লিখিত অযু ও গোসল ভঙ্গের কারণসমূহ পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তায়াম্মুম হলো অযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত, আর মূল পাওয়া গেলে তার স্থলাভিষিক্তের কাজ শেষ হয়ে যায়।

৮- তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃপ্রথমে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে দুহাত মাটিতে মারবে, অতঃপর এর দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে মাসাহ করবে।

৯- ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুমঃ কারো হাড় ভেঙ্গে গেলে বা শরীরে ক্ষত বা জখম হলে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করলে ও কষ্ট হলে তবে ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম করবে এবং বাকী অংশ ধুয়ে ফেলবে। কেউ পানি ও মাটি কোনটিই না পেলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নিবে। তাকে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

মোজা ও বন্ধ ফলকের উপর মাসাহঃ

১- ইবন মুবারক বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে আমার অন্তরে কোনো সংশয় নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে। পা ধোয়ার চেয়ে মোজার উপর মাসাহ করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উত্তমটিই তালাশ করতেন।

২- সময়সীমা: মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিনরাত মাসাহ করা জায়েয। মোজা পরিধান করার পরে প্রথম বার অপবিত্র হওয়া থেকে সময়সীমা শুরু হয়।

৩- মোজার উপর মাসাহর শর্তাবলী: পরিধেয় মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া। ফরয পরিমাণ অংশ ঢেকে থাকা এবং মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা।

৪- মোজার উপর মাসাহর পদ্ধতি: পানিতে হাত ভিজিয়ে পায়ের উপরিভাগের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নলা পর্যন্ত একবার মাসাহ করা। পায়ের নিচে ও পিছনে মাসাহ নয়।

৫- মোজার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণসমূহ:

নিচের চারটির যে কোনো একটি কারণে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়:

১- পায়ের থেকে মোজা খুলে ফেললে।

২- মোজা খুলে ফেলা অত্যাবশ্যকীয় হলে, যেমন গোসল ফরয হলে।

৩- পরিহিত মোজা বড় ছিদ্র বা ছিড়ে গেলে।

৪- মাসাহের মেয়াদ পূর্ণ হলে। সব ধরণের পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে না ফেলা পর্যন্ত তার উপর মাসাহ করা জায়েয, এতে মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক বা জানাবত তথা বড় নাপাকী লাগুক।

সুত্রঃ

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=81&section=1120

অনুশীলনী -১১ (জুন- ২য় সপ্তাহঃ)

দরসে কুরআনঃ সুরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯-২২

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন, জীবন বিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দ্বীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে। আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।৩:১৯

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

এখন যদি এ লোকেরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বলে দাওঃ “আমি ও আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি।” তারপর আহলি কিতাব ও অ-আহলি কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো, “তোমরাও কি তাঁর বন্দেগী কবুল করেছো?” যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তোমার ওপর কেবলমাত্র পয়গাম পৌঁছিয়ে

দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদের অবস্থা দেখবেন।৩:২০

إِنَّٱلَّذِينَيَكۡفُرُونَبِـَٔايَٰتِٱللَّهِوَيَقۡتُلُونَٱلنَّبِيِّۦنَبِغَيۡرِحَقّٖوَيَقۡتُلُونَٱلَّذِينَيَأۡمُرُونَبِٱلۡقِسۡطِمِنَٱلنَّاسِفَبَشِّرۡهُمبِعَذَابٍأَلِيمٍ

যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও। ৩:২১

أُوْلَٰٓئِكَٱلَّذِينَحَبِطَتۡأَعۡمَٰلُهُمۡفِيٱلدُّنۡيَاوَٱلۡأٓخِرَةِوَمَالَهُممِّننَّٰصِرِينَ

এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৩:২২

দরস

মোট আয়াত সংখ্যা ২০০

নামকরণঃ এই সূরার এক জায়গায় "আলে ইমরানের" কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহ ঃ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু' আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটি

إِنَّاللَّهَاصْطَفَىٰآدَمَوَنُوحًاوَآلَإِبْرَاهِيمَوَآلَعِمْرَانَعَلَىالْعَالَمِينَ

(আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ অব্দি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলী

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে।

<u>একটি দল হচ্ছে</u>, আহলী কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল। সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্মপর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দ্বীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত দিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দ্বীন। এই দ্বীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো

তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মাত তদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তাঁর মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্মপর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

নাযিলের কার্যকারণ

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছেঃ

একঃ এই সত্য দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সূরা বাকারায় পূর্বাহ্নেই যেসব পরীক্ষা, বিপদ আপদ ও সংকট সম্মপর্কে সতর্ক করে

দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ মাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি যেন ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। এ প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষটি আরবের এমন সব শক্তিগুলোকে অকস্মাত নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। সবদিকে ফুটে উঠছিল ঝড়ের আলামত। মুসলমানদের ওপর একটি নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, চারপাশের সারা দুনিয়ার আক্রমণের শিকার মদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেয়া হবে। মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এ পরিস্থিতির অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। মদিনা ছিল তো একটি ছোট্ট মফস্বল শহর। জনবসতি কয়েক শ' ঘরের বেশী ছিল না। সেখানে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মুহাজিরের আগমন। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার এই যুদ্ধাবস্থার কারণে বাড়তি বিপদ দেখা দিল।

দুইঃ হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশপাশের ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তারা সেই চুক্তির প্রতি সামান্যতমও সম্মান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধকালে এই আহলি কিতাবদের যাবতীয় সহানুভূতি তাওহীদ ও নবুয়াত এবং কিতাব ও আখেরাত বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে ছিল। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবদের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বনী নাযির সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ তো এ ব্যাপারে নিজের বিরোধমূলক প্রচেষ্টাকে অন্ধ শত্রুতা বরং নীচতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মদিনাবাসীদের সাথে এই ইহুদীদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক

চলে আসছিল তার কোন পরোয়াই তারা করেনি। শেষ যখন তাদের দুষ্কর্ম ও চুক্তি ভংগ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এই ইহুদী গোত্রগুলোর সবচেয়ে বেশী দুষ্কর্মপরায়ণ 'বনী কাইনুকা' গোত্রের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে মদীনার শহরতলী থেকে বের করে দেন। কিন্তু এতে অন্য ইহুদী গোত্রগুলোর হিংসার আগুন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তারা মদিনার মুনাফিক মুসলমান ও হিযাজের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চার দিকে অসংখ্য বিপদ সৃষ্টি করে। এমনকি কখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নাশের জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালানো হয় এই আশংকা সর্বক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সশস্ত্র থাকতেন। নৈশ আক্রমণের ভয়ে রাতে পাহারা দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও চোখের আড়াল হতেন সাহাবায়ে কেরাম উদ্বেগ আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হতেন।

তিনঃ বদরে পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদীরা তার ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দিল। ফলে এক বছর পরই মক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মদীনা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধটি হলো ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাই ওহোদের যুদ্ধ নামেই এটি পরিচিত। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মদীনা থেকে এক হাজার লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু পথে তিন'শ মুনাফিক হঠাৎ আলাদা হয়ে মদীনার দিকে ফিরে এলো। নবীর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে যে সাত'শো লোক রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ছোট দল ছিল। যুদ্ধ চলা কালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার সম্ভাব্য

সব রকমের প্রচেষ্টা চালালো। এই প্রথমবার জানা গেলো, মুসলমানদের স্বগৃহে এত বিপুল সংখ্যক আস্তীনের সাপ লুকানো রয়েছে এবং তারা এভাবে বাইরের শত্রুদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

চারঃ ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিকদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই সবেমাত্র গঠিত হয়েছিল, যার নৈতিক প্রশিক্ষণ এখনো পূর্ণ হতে পারেনি এবং নিজের বিশ্বাস ও নীতি সমর্থনে যার লড়াই করার এই মাত্র দ্বিতীয় সুযোগ ছিল তার কাজে কিছু দুর্বলতা প্রকাশ হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই যুদ্ধের পর এই যাবতীয় ঘটনাবলীর ওপর বিস্তারিত মন্তব্য করা এবং তাতেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে একথাটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার উপযোগীতা রাখে যে, অন্য জেনারেলরা নিজেদের যুদ্ধের পরে তার ওপর যে মন্তব্য করেন এ যুদ্ধের ওপরে কুরআনের মন্তব্য তা থেকে কত বিভিন্ন!

৩:১৮ এই আয়াতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের অবিশ্বাস ও মুশরিকদের অংশীবাদিতা যেন তোমাদেরকে নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান না করে। কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষেরা আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এছাড়াও তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এ ক্ষেত্রে

কোনো বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়না। আর এ বিষয়টি নিজেই আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। অর্থাৎ আল্লাহ এ বিশ্ব জগতের যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যেমন- আকাশ,ভূমি,পাহাড়,নদী,সাগর,উদ্ভিদ,পশু-পাখী ইত্যাদি-সবই একই ব্যবস্থার অধীনে পরিচালনা করছেন। আর এসবই কার্যত আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং ফেরেশতারাও আল্লাহর কর্মীবাহিনী হিসেবে জগত পরিচালনায় নিয়োজিত থেকে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ অর্থাৎ যে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টিথেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই-এটি তাঁর সাক্ষ্য এবং তাঁর চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোন সত্ত্বা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত নয়। আর কোন সত্ত্বা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারোর খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।

ফেরেশতাদের সাক্ষ্যঃ আল্লাহ্র পর সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে ফেরেশতাদের। কারণ তারা হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্বরাজ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না এবং পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আর কোন সত্ত্বা এমন নেই যার কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের পরে এই সৃষ্টি জগতে আর যারাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কম বেশী কিছুটা জ্ঞান রাখে, সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে

আজ পর্যন্তকার তাদের সবার সর্বসম্মত সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ একাই এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, পরিচালক ও প্রভু।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো,

প্রথমত : বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় আল্লাহর একত্বের সুস্পষ্ট এবং সবোর্ৎকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান তখনই উপকারী বা কল্যাণকর হয়,যখন তা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। আর ঈমান তখনই গুরুত্ব পায় যখন তা হয় জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক।

৩:১৯ঃ১. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবনবিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত। সেটি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্মপূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজে আবিষ্কার করবে না। বরং তিনি নিজের নবী-রসূলগণের মাধ্যমে যে হিদায়ত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোনো প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম" আর বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার ও প্রভুর নিজের সৃষ্টিকুল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্যকোন কর্মপদ্ধতির বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। মানুষ তার নির্বুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে নিয়ে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও যে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ্ব-জাহানের প্রভুর দৃষ্টিতে এগুলো নিছক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. আল্লাহর পক্ষথেকে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে যে কোন যুগে যে নবীই এসেছেন, তাঁর দ্বীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন জাতির ওপর যে কিতাবই নাযিল হয়েছে, তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দ্বীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্ম ও উদ্ভবের কারণ ও ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের বৈধ সীমা অতিক্রম নিজেদের খেয়াল খুশী মতো আসল দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও বিস্তারিত বিধান পরিবর্তন করে ফেলেছে। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আঃ)'র যুগে,কিংবা অন্যান্য নবীদের যুগে মানুষের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তাদের বিশ্বাস করা, তাদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের কাছে অবতীর্ণ বইয়ের প্রতিও ঈমান আনা। কিন্তু পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার পর ইসলামের নবীর প্রতি বিশ্বাস আনা ও এই ধর্মের বিধান মেনে চলা সবার দায়িত্ব হয়ে পড়ে। অথচ ধর্মীয় ও বর্ণ-বিদ্বেষের কারণে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হয়নি এবং এই ধর্মকে সত্য বলে স্বীকারও করেনি।

৩. এই আয়াতে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যদি তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করতে চায়, তাহলে তারা যেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। কারণ,যে আল্লাহ তাদের কাছে ঈসা ও মুসা নবীকে পাঠিয়েছেন, তিনিই এখন মোহাম্ম দ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবী মনোনীত করে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে জানার পরও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর শাস্তির জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ যে তাদের ধারণার চেয়েও দ্রুত সময়ে

মানুষের কর্মতৎপরতার হিসাব নেবেন সেটাও তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো,

প্রথমত : অধিকাংশ মতবিরোধের উৎস হল হিংসা ও বিদ্বেষ। অজ্ঞতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে না জানার কারণে খুব কমই মতভেদ দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। তাই অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের অনুসারী হবার দাবিদাররা যদি সত্যই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত হতে চায় তাহলে তাদেরকে এখন থেকে শুধু ইসলাম ধর্মই মেনে চলতে হবে।

৩:২০ অন্য কথায় এ বক্তব্যটিকে এভাবে বলা যায়, যেমন - "আমি ও আমার অনুসারীরা তো সেই নির্ভেজাল ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছি, যেটি আল্লাহর আসল দ্বীন ও জীবন বিধান। এখন তোমরা বলো, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা দ্বীনের মধ্যেযে পরিবর্তন সাধন করেছো তা বাদ দিয়ে এই আসল ও প্রকৃত দ্বীনের দিকে কি তোমরা ফিরে আসবে?

এরপর ইসলামের নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন,কাফের ও মুশরিকদের ঈমানদার করার জন্য অনর্থক তাদের সঙ্গে ঝগড়া ও দ্বন্দ্বে যাবার মত কষ্ট করার দরকার নেই। কারণ,আপনার দায়িত্ব হল শুধু আল্লাহর বাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে মানুষ সত্যকে বুঝতে পারে। তাই যার ইচ্ছা হবে সে নিজেই সত্যকে গ্রহণ করবে এবং যারা জেনে শুনেও যে কোন কারণে সত্য ধর্ম গ্রহণ করবে না তাদের সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আল্লাহ তার সৃষ্টির অবস্থা ভালভাবে দেখেন।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো,

প্রথমত : উদ্ধত বা গোঁড়াপন্থী লোকদের সাথে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করা নয়,বরং যুক্তি তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত : ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন এবং জোর করে কারো ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য যারাই যে পথই বেছে নিক না কেন ঐ পথের ভালো বা মন্দ পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

৩:২১-২২

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের হিংসা ও বিদ্বেষের স্বরূপ তুলে ধরার পর এই দুই আয়াতে সত্য গোপন ও অবিশ্বাসের করুণ ও নোংরা পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আসলে মানুষ তাদের চিন্তা ও বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে। যারা চিন্তাগত ক্ষেত্রে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়,তারা সত্যের পক্ষে কাজ তো করেই না,বরং যারা সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে কাজ করছে তাদের সাথে বিরোধিতা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করে। এদের হাত নিরাপরাধ লোকদের রক্তে রঞ্জিত এবং এরা ন্যায় বিচারকামী মানুষের নেতাদেরকে হয় হত্যা করে কিংবা তাদের হত্যা করার অনুমতি দেয় অথবা তারা নিহত হলে খুশি হয়। এটা স্পষ্ট যে সত্যের বিরুদ্ধে চিন্তায় ও কাজে তাদের এই বিরোধীতার ফলে তারা যদি জীবনে কোন ভালো কাজ করেও থাকে তবুও তা হবে নিস্ফল। এদের অবস্থা হচ্ছে এমন লোকের মতো যে কিছুকাল কোন ব্যক্তির সেবকের কাজ করার পর ঐ ব্যক্তির সন্তানকেই হত্যা করে। নিঃসন্দেহে এমন নোংরা কাজ তার অতীতের সমস্ত ভালো কাজকে অর্থহীন ও নিস্ফল করে দেয়।

এই আয়াতের শিক্ষণীয় দিক গুলো হলো,

প্রথমত : সত্যকে গোপন রাখার জন্য কোন কোন মানুষ নবীকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। তাই আমাদেরকেও বিকৃত চিন্তাধারার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। কারণ বিপজ্জনক কাজের মূল উৎস হলো বিকৃত বিশ্বাস ।

দ্বিতীয়ত : ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যের পক্ষে আহবান জানানো এবং জাগরণ জরুরী। যদিও এর ফলে শহীদ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। যেমন ইমাম হোসাইন বিন আলী (রাঃ) ও তার সন্তানেরা সত্যের আহবানের কারণে শহীদ হবেন এটা নিশ্চিতভাবে জেনেও সত্যের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন ।

তৃতীয়ত : কোন কোন পাপ বজ্রপাতের মতোই মানুষের পূণ্যের বাগানের সমস্ত গাছকে এক মুহূর্তের মধ্যেই ভস্মীভূত করে দেয়। তখন দুঃখ করার মতো অবকাশও থাকে না। #

সুত্রঃ তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য তাফসীর।

বই নোটঃ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

লেখকঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রা:),

অনুবাদ-মাওলানা আব্দুর রহীম।

ইসলামী আন্দোলনঃ

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ হতে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব উৎখাত করে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সর্বাত্বক চেষ্টা ও প্রচেষ্টা তাকে ইসলামী আন্দোলন বলে।

নৈতিকতাঃ নীতি মানার যেটি অনুভূতি সেটি নৈতিকতা। মানবীয় চরিত্রের যে গুন যা তাকে সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে।

ভিত্তিঃ যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু সংস্থাপিত হয়।

মানব সমাজে অশান্তির মূল কারণঃ-

১. বর্তমান সমাজের নেতৃত্ব সৎ নয়

২. এ মূল সমস্যা জনগন উপলদ্ধি করতে পরেনা

৩. অনৈক্য ও ভাঙ্গন

৪. সত্য ও সত্যপ্রিয় মানুষ অনেক, কিন্তু আসল সত্য প্রিয় মানুষের সংখ্যা কম

৫. সত্যপ্রিয় লোক থাকলেও ক্ষমতায় নেই।

নেতৃত্বর গুরুত্বঃ

১. নেতা হচ্ছে যে কোন কার্যের প্রকৃত ভূমিকা পালনকারী।

২. নেতাই ভাঙ্গা ও গড়ার মৌলিক পরিকল্পনাকারী।

৩. নেতা তার অধীনস্ত কর্মীদের অনুসরনীয় ব্যক্তি।

৪. নেতা অসৎ হলে পাপ পঙ্কিলতা দূর হয়ে সৎ পথে চলা হয়।

৫. নেতা সৎ হলে খোদাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার দরুন পাপ নি:শেষ না হলে সমাজ সহজে বিকশিত হতে পারে না।

নেতার ব্যাপারে খোদার নির্দেশ/ ইসলামের মূল লক্ষ্যঃ

১. সব মানুষ আল্লাহর গোলামী করবে।

২. খোদারপ্রদত্ত বিধানই কর্মীদের চলার পথ।

৩. দুনিয়া হতে সকল অশক্তি ও বিপদ দূর করতে হবে।

৩. উপরোক্ত কাজের নিয়ামক নেতার, কর্মী বা জনশক্তির নয়।

৪. কাজটি পারে ত্রকমাত্র ইসলামী নেতৃত্ব।

৫. ইসলামী নেতৃত্ব প্রতির্ষ্ঠিত না থাকলে সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার বাতিল নেতৃত্ব উৎখাত করে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. সুতরাং ইসলামের মূল লক্ষ্য নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন।

মানবিক বা নৈতিক দিকঃ ২টি

* ১. মৌলিক মানবীয় গুনাবলী/চরিত্রঃ

ক) ইচ্ছা শক্তি ও সিদ্বান্ত গ্রহন শক্তি

খ) প্রবল বাসনা

গ) উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস

ঘ) সহিষুতা ও দৃঢ়তা

ঙ) তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনা

চ) বীরত্ব ও বীর্যবত্তা

ছ) সহনশীলতা ও পরিশ্রমপ্রিয়তা

জ) উদ্দেশ্যের আকর্ষন ও সে জন্য সব কিছুর উৎসর্গ করার প্রবনতা

ঝ) সর্তকতা

ঞ) দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা

ট) ইচ্ছাবাসনা

ঠ) স্বপ্ন সাধনা ও উত্তেজনার সংযমশক্তি ত্রবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা।

২. ইসলামী চরিত্রঃ

এটি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশুদ্ধরূপ। তরবারী সাধারন অবস্থায়, মৌলিক মানবীয় চরিত্র + তরবারী মুজাহিদের হাতে + ইসলামী নৈতিক চরিত্র।

নেতৃত্ব বন্টনে খোদার নীতির সারকথাঃ

১. মৌলিক মানবীয় গুনাবলী যার যত বেশী সে নেতৃত্ব পাবে।

২. ইসলামী নৈতিকতার উপস্থিতি মৌলিক মানবীয় গুনাবলী কম হলেও নেতৃত্ব পাবে।

৩. উপরোক্ত দুইটির সমন্বয় হলে নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী তবে নেতৃত্ব ফেরেশতা দিয়ে যাবে না। ময়দানে দ্বন্দ সংঘাত পেরিয়ে তা অর্জন করতে হবে

৪. মৌলিক মানবীয় চরিত্র +১০০% জড়শক্তি=সাফল্য।

৫. ইসলামী নৈতিক চরিত্র+২৫% জড়শক্তি = সাফল্য।

ইসলামী নৈতিকতার পর্যায়ঃ ৪ টি

১. ঈমানঃ মৌলিক তিনটি (মু,মিন)

ক. আল্লাহর উপর ঈমানঃ অস্তিত্ব, নাম ও গুনাবলী, ক্ষমতা, হুকুম আহকাম।

খ. রাসূলের উপর ঈমানঃ তার নবুয়্যাত ও রিসালাত স্বীকার, তার সমগ্র আদর্শপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়াও ভালো।

গ) আখরাতের উপর ঈমানঃ পুনরুস্থান ও হাশরে বিশ্বাস, সে কেন্দ্রিক জীবন গঠন।

২. ইসলাম (মুসলমান)

ঈমানের বাস্তবরূপ, বৃক্ষ থেকে বীজ নির্ধারণ, আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্ণ অনুসরনই ইসলাম।

৩. তাকওয়া (মুত্তাকী): এর অর্থ ভয় করে বেঁচে থাকা। মনের সে অনুভূতি যা আল্লাহর প্রবল ভীতির সাথে সাথে দায়িত্বানুভূতি, জবাবদিহির যাবতীয় কাজে হালাল-হারাম বাছাই ও অনুভূতি জাগ্রত করবে।

তাকওয়া ৩প্রকার :যথা-

ক) তাকওয়ায়ে খাস: যাবতীয় শিরক থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর হুকুম পালন করা।

খ) তাকওয়ায়ে আমঃ যাবতীয় শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

গ) তাকওয়ায়ে আখাচ্ছল: শিরক থেকে বেঁচে থাকা নয় কুফরীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

৪. ইহসান (মুহসীন);

ইসলামী জীবনপ্রাসাদের সর্বোচ্চ পর্যায় আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রতি এমন ভালাবাসা যা নিজেকে তাদের জন্য উৎসর্গ করতে শিখায়:" তাকওয়া-সরকারী কর্মচারীর যথার্থ দায়িত্ব পালন।

ইহসানঃ শুধু দায়িত্ব পালন নয়, দেশের জন্য কষ্ট, ত্যাগ, কুরবানী স্বীকার, ইসলামের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুহসিনপ্রয়োজন মারফাতের পথ-এ চার পর্যায় অতিক্রম করে তারপর অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটবে।

ইসলামী আন্দালনের নৈতিক ভিত্তির ১০ টি পর্যায়ঃ

নেতৃত্বের গুরুত্ব, ২. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য, ৩. নেতৃত্বর ব্যাপারে খোদার নিয়ম, ৪. মানুষের মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ, ৫. ইসলামী নেতিকতা, ৬. নেতৃত্বের ব্যাপারে খোদায়ী নীতির সারকথা, ৭. মৌলিক মানবীয় চরিত্র ৮. ইসলামী নৈতিকতা শক্তির তৎপরতা, ৯. ইসলামী নৈতিকতার ৪ টি পর্যায়, ১০. ভুল ধারনার অপনোদন

তাকওয়া সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

আল-বাকারাহঃ১৭৭

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚوَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙوَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى
الرِّقَابِ ۚوَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚوَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚوَ

الصّٰبِرِيۡنَ فِى الۡبَاۡسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيۡنَ الۡبَاۡسِؕ اُولٰٓـئِكَ الَّذِيۡنَ صَدَقُوۡاؕ وَ

اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۷﴾

১৭৭ - তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্মপদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচ্ঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া‘দা করার পর স্বীয় ওয়া‘দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। (তাইসিরুল)

আল-বাকারাহঃ২৫৫

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَىُّ الۡقَيُّوۡمُۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِؕ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖؕ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۚ وَلَا يُحِيۡطُوۡنَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَۚ وَلَا يَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ الۡعَلِىُّ الۡعَظِيۡمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা।

তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী) আল-বায়ান

আলে ইমরান: ১০২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। আল-বায়ান

তাক্বওয়া সংক্রান্ত হাদিস

-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু' (বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)।

তাহারাত সংক্রান্ত মাসআলা (দেখুন পৃষ্ঠা ২৬৭)

মাসয়ালাঃ ঈদের নামাজ সংক্রান্ত। ২৩৩

অনুশীলনী -১২ (জুন- ৪র্থ সপ্তাহঃ)

দারসুল কুরআন , সূরা বাকারা (১৫৩-১৫৬ নং আয়াত)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ

وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ

১৫৩. 'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, সবর ওসালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ইআল্লাহ সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে আছেন।
১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়,তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। তারা তোআসলে জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবনকরতে পার না।
১৫৫. এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভীতিপ্রদপরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জানও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়ে পরীক্ষাকরবো। এমতাবস্থায় যারা সবর অবলম্বন করবে,তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

নামকরণঃ আল বাকারা নামে সুরাটির নামকরন করা হয়েছে অর্থাৎ এটি ঐ সুরা যাতে বনী ঈসরাইলের গাভি কুরবানীর ঘটনা বর্ণনাকরা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তিরপর তের বছর মাক্কায় ইসলামের দাওয়াত পেশকরেন তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সত্য-সন্ধানী কিছু লোক তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়কিন্তু মুশরিক নেতাদের অত্যাচারের ভয়েমক্কার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি।অন্য দিকে ইয়াসরিবের নেতৃত্বস্থানীয়ব্যক্তিবর্গের একটি বড়ো অংশ ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াসরিবে ইসলামী দাওয়াতের প্রসারঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এমনি অবস্থায় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহ রাব্বুল'আলামীন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদেরইয়াসরিবে হিজরাত করার নির্দেশ দেন।তিনি ইয়াসরিব পৌঁছে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন আর সেই রাষ্ট্রের নাম হয় তখন থেকেআল মাদিনা।

মাদানী যুগের একেবারে শুরুর দিকে সূরাবাকারার অধিকাংশ আয়াত নাজিল হয়।মাদানী যুগের শেষ দিকে যে আয়াতগুলোনাজিল হয়েছিলো সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এইআয়াতগুলোকেও এই সূরায় শামিল করা হয়। আবার, যেই আয়াতগুলো দিয়ে এই সূরাটির সমাপ্তিটানা হয়েছে সেই আয়াতগুলো মাক্কী যুগের শেষভাগে মিরাজের সময় নাজিল হয়েছিলো।

বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সেইআয়াতগুলো এই সূরায় সংযুক্ত করা হয়।হিজরাতের পূর্বে দাওয়াতি তৎপরতাপরিচালিত হয়েছে মুশরিকদের মধ্যে।হিজরাতের পর দাওয়াতি তৎপরতা পরিচালিতহয়েছে ইয়াহুদিদের মধ্যে।ইসলামী দাওয়াত মাদানী যুগে প্রবেশ করার পর মুনাফিকদের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এদের কেউ কেউ ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো,কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে দ্বন্দ্ব-

প্রতিদ্বন্দ্বে নিয়োজিত হতে তারা প্রস্তুতছিলো না। এদের কেউ কেউ ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায়ছিলো। এদের কেউ কেউ আসলে ইসলামকেঅস্বীকারই করতো, কিন্তু ফিতনা সৃষ্টিরউদ্দেশ্যে মুসলিমদের দলে প্রবেশ করতো। এদের কেউ কেউ একদিকে মুসলিমদের সাথে ভালোসম্পর্ক বজায় রাখতো, অন্যদিকে ভালো সম্পর্ক রাখতো ইসলামের দুশমনদের সাথে। শেষাবধি যারাই বিজয়ী হোক না কেন, এতে যেনোতাদের স্বার্থ হানি না ঘটে সেই বিষয়ে তারা ছিলো খুবই সজাগ।

ব্যাখ্যাঃ

১৫৩ নাম্বার আয়াতঃ "ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই আল্লাহ সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে আছেন।" সমাজ-সভ্যতার ইসলাহ করতে অগ্রসর হলে যে বড়ো রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে সেই কথা জানিয়ে দেন। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার আহ্বান জানান। সবর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। মুমিনদেরকে এই গুণ গুণান্বিত হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বারবার তাকিদ করেছেন। আল হাদিসেও এই বিষয়ে তাকিদ রয়েছে।

রোগ-ব্যাধির কষ্ট সহ্য করার নাম সবর। দুঃখ-বেদনায় ভেঙে না পড়ার নাম সবর। রূঢ় ও আচরণে উত্তেজিত না হওয়ার নাম সবর। মিথ্যা প্রচারণার মুখে অবিচলিত থাকার নাম সবর।ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতেও সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকার নাম সবর। লক্ষ্য হাসিলের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার নাম সবর। লক্ষ্য অর্জন বিলম্বিত হচ্ছে দেখে হতাশ নাহওয়ার নাম সবর, ইত্যাদি।

মুদ্দাস্‌সিরের ২ ও ৩ নম্বর আয়াতে ঃ

قُمْ فَاَنْذِرْ ۝﴿٢﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝﴿٣﴾

(উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন।-২; ৩. আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।)

মুযাম্মিলের ১০ নম্বর আয়াতেঃ

وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾

১০. আর লোকে যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।)

মা'আরিজের ৫ নম্বর আয়াতেঃ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾ -. কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন পরম ধৈর্য।

ইউনুসের ১০৯ নম্বর আয়াতেঃ وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

তা-হা-এর ১৩০ নম্বর আয়াতেঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى

১৩০. কাজেই তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে আপনার রব-এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

আহকাফের ৩৫ নম্বর আয়াতেঃ

فَاصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِلۡ لَّهُمۡ ؕ كَاَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوۡعَدُوۡنَ ۙ لَمۡ يَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنۡ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।

এ হচ্ছে সবর অবলম্বনের তাকিদ সংবলিত বহুসংখ্যক আয়াতের মাত্র কয়েকটি। আবু সায়িদ আল খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সবরের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আরকিছু কাউকে দেয়া হয়নি।"(সহীহ বুখারী মুসলিম)

সূরা আয যুমারের ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুলআ'লামিন বলেন,

قُلۡ يٰعِبَادِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ لِلَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوۡا فِيۡ هٰذِهِ الدُّنۡيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرۡضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَهُمۡ بِغَيۡرِ حِسَابٍ

১০. বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে।

"সবর অবলম্বনকারীদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেয়া হবে।" এই

আয়াতের শেষাংশে-। إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ কথাটি জুড়ে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সবর নামক গুণটির মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। অন্য দিকে এই বাক্যাংশের মাধ্যমে তিনি মুমিনদের মনে নিশ্চিন্ততার আমেজ সৃষ্টি করেছেন।

আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার অনুশীলন মুমিনদের মাঝে অনুপম নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে। সেই জন্য নবুওয়াত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই জিবরিল (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। বহু আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন সালাতের তাকিদ দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতটিতেও আমরা একই রূপ তাকিদ দেখতে পাই।

আল বাকারা- ১৫৪ নম্বর আয়াতঃ

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। তারা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার
না।"

আল্লাহর পথে নিহত হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় শাহাদাত বলা হয়। যিনি আল্লাহর পথে নিহত হন, তাঁকে বলা হয় শহীদ। শাহাদাতবরণ মৃত্যু বটে, কিন্তু অসাধারণ মৃত্যু, মহিমান্বিত মৃত্যু। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন শহীদদেরকে 'মৃত' বলে আখ্যায়িত করতে নিষেধ করেছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ - ১৭১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন শহীদদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ
يُرۡزَقُونَ ١٦٩ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ
لَمۡ يَلۡحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٧٠ ۞
يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত। তাদের রবের কাছ থেকে তারা রিজিক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তারা খুশি ও তৃপ্ত। আর তারা এই বিষয়েও নিশ্চিত, যেই সব মুমিন তাদের পেছনে এখনো দুনিয়ায় রয়ে গেছে, তাদেও জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত এবং তারা জানতে পেরেছে, অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"

শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,"জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার সমস্তসামগ্রী তার জন্য নির্ধারিত হলেও কোনব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদ এর ব্যতিক্রম। তাকে যেই মর্যাদা দেয়া হবে তা দেখে সে দশবার পৃথিবীতে এসে শহীদ হওয়ার আকাংক্ষা ব্যক্ত করবে।"শাহাদাত লাভের পর পরই যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল'আলামিনের সান্নিধ্যে এমনভাবে সমাদৃত হন,তাঁদেরকে 'মৃত' বলা আসলেই শোভনীয় নয়।

আল বাকারা ১৫৫ নম্বর আয়াত

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٍ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ
ٱلصَّٰبِرِينَ

“এবং আমি অবশ্যই ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা
করবো। এমতাবস্থায় যারা সবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।
”এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিন তাঁরএকটি শাশ্বত বিধানের কথা মুমিনদেরকে স্মরণকরিয়ে দিয়েছেন। আর সেটি হচ্ছে : যাঁরা
আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিনের প্রতি নিখাদ ঈমান আনার ঘোষণা দেবেন, তাঁদেরকে তিনি অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। এ ছাড়াও-

সূরা আনকাবুতের ২ ও ৩ ঃ

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢
وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ٣

১. মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে?তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।

সূরা মুহাম্মাদের ৩১ ঃ

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ ۙ وَ نَبْلُوَاۡ اَخْبَارَكُمْ

আমি তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ আর ধৈর্যশীলদেরকে, আর তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি।

সূরা আলে ইমরানের ১৪২ ঃ

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا یَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَ یَعۡلَمَ الصّٰبِرِیۡنَ

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?

সূরা আত্ তাওবা-র ১৬ ঃ-

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تُتۡرَكُوۡا وَ لَمَّا یَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَ لَمۡ یَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوۡلِهٖ وَ لَا الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَلِیۡجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

- নিশ্চয় তিনিই আল্লাহ, আসমান ও যমীনের মালিকানা তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

সূরা আল বাকারার ২১৪ ঃ

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا یَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِیۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰی یَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰی نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِیۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

(২১৪) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনি এমনিই বেহেশতে প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালাই তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?'জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

সূরা আলে ইমরানের ১৪৬ ঃ

وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ نَّبِیٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّیُّوۡنَ كَثِیۡرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوۡا لِمَاۤ اَصَابَهُمۡ فِیۡ

سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوۡا وَ مَا اسۡتَكَانُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۴۶﴾

(১৪৬) কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রববানী (আল্লাহভক্ত) লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।

এ হচ্ছে পরিক্ষা সম্পর্কিত বহুসংখ্যক আয়াতের মাত্র কয়েকটি।

" ঈমানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিতহওয়া এবং এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে যত প্রকারের বাধাই আসুক না কেন তার মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে মুমিনদেরকে অনিবার্য ভাবে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, কখনো কখনো অবস্থা এমন সঙ্গিন হতে পারে যে, অনাহারে থাকতে হবে, কখনো কখনো বাগ-বাগিচা, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, ঘরদোরের ওপরহামলা হতে পারে, কখনো কখনো ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে আপনজন ও সহকর্মীদের কেউ কেউ প্রাণ হারাতে পারেন এবং কখনো

কখনো আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমন সব কঠিন পরিস্থিতিতেও যাঁরা সবর অবলম্বন করতে পারবেন, তাঁদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষাঃ

১. সমাজ ও সভ্যতার ইসলাহ বা পরিশুদ্ধি করতে গেলে মুমিনদেরকে অবশ্যই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকতে হবে।

২. আল্লাহর পথে যাঁরা শহীদ হন তাঁদেরকে 'মৃত'বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

৩. আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের লোকসান ঘটিয়ে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করবেন। এমতাবস্থায় যাঁরা দৃঢ়তা-

অটলতা-অবিচলতা অবলম্বন করবেন,তাঁদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহ ও রাহমাত।

বই নোটঃ ইসলাম ও জাহেলিয়াত

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)

বই পরিচিতি ঃ ১৯৪১ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে ইসলামী কলেজের মসলিসে ইসলামীয়াতে প্রদত্ত ভাষণ-

ভূমিকাঃ আচরনের সাধারন নীতি: -

৯= কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, আচরন, ব্যবহারের পূর্বেই তার সম্পর্কে ধারনা নেয়া।

= ব্যক্তি বা বস্তুর অভ্যন্তরীন নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা সম্ভব না হলে বাহ্যিক নিদর্শন সমূহ থেকে ধারনা গ্রহন করতে হবে।

= নির্ধারিত ধারনার ভিত্তিতে ভালবাসা, ভয়, সম্মান, উপেক্ষা, রক্ষনাবেক্ষন, পরিত্যাগ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

=প্রাপ্ত জ্ঞান বা ধারনা যত নির্ভুল হবে আচরন বা ব্যবহার তত নির্ভুল হবে।

জ্ঞানের সাধারন উৎস (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভের উৎস- ৩ টি।

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষন,

২. আন্দাজ, অনুমান বা অমূলক ধারনা, ৩. নির্ভূল বিজ্ঞান

মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা:

<u>১. মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন:</u>

ক) নিজ সত্ত্বা সম্পর্কিত প্রশ্ন। খ) মানব সমাজ সম্পর্কিত প্রশ্ন। গ) বিশ্ব প্রকৃতি ও বস্তু জগৎ সম্পর্কিত প্রশ্ন।

<u>২. মানব মান ও প্রশ্নের উত্তর:</u>

= সকল মানুষের মনে এর উত্তর বিদ্যমান তবে সকলের কাছে এর দার্শনিক উত্তর নাও থাকতে পারে।

= চিন্তা সংগঠিত বা অসংগঠিত হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদিত হয়।

= মানুষের সকল কর্ম তার একটি চিন্তা বা দর্শনের প্রতিফলন।

৩. উত্তরের গুরুত্ব:

= উত্তরের গুরুত্ব ব্যক্তি, দল বা জাতির জন্যে সমান।

= এর ভিত্তিতে সমাজ,রাষ্ট্র বা সভ্যতার জন্য বিধান কর্মসূচী রচিত হয়।

=এর ভিত্তিতে নৈতিক মূল্যায়ন নির্ধারন জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তব রুপ হবে।

= চিন্তা ও দর্শন থেকে যেমন বাস্তব রুপায়ন হয় তেমনি বাস্তব আচরন থেকে চিন্তা বা দর্শন পাওয়া যায়।

৪. প্রশ্নপত্রের উত্তরের উৎস

=যেহেতু প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে নয় এ কারনে কোথাও উত্তর সুনির্দিষ্টভাবে লেখা নেই যে জন্মের পরপর পড়ে নিজ যোগ্যতা বলে বুঝে নিবে।

= উত্তর এমন সহজ ও সুস্পষ্ট নয় যেপ্রত্যেকে তা সহজেই জেনে যাবে।

= এ সকল পন্থায়প্রাপ্ত উত্তরসমূহ কি কি?

৫. উত্তর নির্ধারনের উপায়:

= নিজের বাহ্যন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করা এবং তদব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে উত্তর নির্ধারন।

= ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষন এবং এর সাথে অনুমান ধারনা যোগ করে একটি নীতি ঠিক করা।

= আল্লাহ প্রেরিত নবীগন প্রকৃত সত্য জানা দাবী করে উক্ত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিয়েছের তা গ্রহন করা।

উত্তরের বিভিন্নতার প্রভাবঃ

উত্তর লাভের জন্য আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত পন্থা তিনটি।

প্রত্যেকটির উত্তর স্বতন্ত্র আচরন নীতি, নৈতিক আদর্শ স্বতন্ত্র, সাহিত্য সাংস্কৃতির ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র।

নির্ভেজাল ও শিরক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের পার্থক্যঃ

= শিরকে পূজা মানত অর্ঘ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আধিক্য নির্ভেজালে এসবের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নৈতিক চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে কোন তফাৎ নেই।

= শিরকের শিক্ষা, শিক্ষাদর্শন, সাহিত্য রাজনীতির জন্য পৃথক কোন মূলনীতি নেই। তাই নির্ভেজাল থেকে তা গ্রহন করে।

= মুশরিক কল্পনা বিলাসী। নির্ভেজাল বাস্তব কর্মী।

= শিরকের রাজ্যে রাজা ও ধর্মীয় নেতাগন খোদার আসনে। বংশ এবং শ্রেণী প্রধানের উপর এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

= নির্ভেজালের রাজত্বে পরিবার পূজা, বংশপূজা, জাতি পূজা, একনায়কতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ শ্রেণী সংগ্রামে পরিগ্রহ হয়।

বৈরাগ্যবাদঃ বাস্তব পর্যবেক্ষনের সাথে আন্দাজ অনুমানের সংমিশ্রনে মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের যে সব উত্তর ঠিক হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল বৈরাগ্যবাদ।

বৈশিষ্ট্যঃ

১. পৃথিবী এবং মানুষের শারীরিক স্বত্ত্বা স্বয়ং মানুষের জন্য একটি শাস্তি কেন্দ্রবিশেষ আর মানুষের আত্নাকে দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

২. ঈন্দ্রিয়ের সকলপ্রয়োজন ও বাসনা বন্দী খানার শৃংখলের ন্যায়।

৩. মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় প্রকৃতিগত বিভিন্ন প্রয়োজনকে কঠোরভাবে অবদমিত করা, স্বাদ আস্বাদন পরিহার করা এবং দেহ মনের কঠোর কৃচ্ছ সাধন।

৪. স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অন্যান্য মৌলিক ব্যাপারে এর সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই কার্যত নিরব।

সর্বেশ্বরবাদঃ অবাস্তব আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক পর্যবেক্ষন ও অনুশীলনের ফলে তৃতীয় যে মতটির সৃষ্টি হচ্ছে তা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ।

বৈশিষ্ট্যঃ ১. বিশ্বপ্রকৃতির আলাদা কোন সত্তা নেই। মূলত একটি সত্তাই সমস্ত বস্তুজগতের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান।

ইসলাম: মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নসমূহের যে জওয়াব আল্লাহ প্রেরিত নবীগন দিয়েছেন তা আন্তরিকতা সহকারে পূর্ণ রুপে গ্রহন করার নামই ইসলাম।

নির্ভুল পথ লাভের সাধারন নিয়ম:

১. পথ অনুসন্ধান:

= কোন অপরিচিত স্থানে পরিভ্রমন।

= কোন রুপ অভিজ্ঞতা না থাকলে অন্য কারো নিকট হতে জিজ্ঞাসা।

= পথ নির্দেশ লাভ ও সে স্থানে ভ্রমন।

২. বৈজ্ঞানিক পন্থা: এক্ষেত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতার পূর্ন দাবীদার খোজা।

= দাবীদার বিশ্বাসযোগ্য ও নিভরযোগ্য কিনা তা যাচাই করা।

= দাবীদারের নেতৃত্বে পথ চলা।

= বাস্তব অভিজ্ঞতার দাবীপ্রমাণ।

মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে নবীর মত:

১. বিশ্বজাহান সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন মহান আল্লাহ।

২. মানব সৃষ্টি ও তার অবস্থান।

৩.মানুষের পারস্পরিক আচরন ও বস্তুসামগ্রী ব্যবহার নীতি।

৪. আল্লাহর বিধান প্রদর্শনের দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

৫. মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ব।

৬. পরকালীন জীবন ও জবাবদিতা।

মানুষের তৎকালীন সাফল্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল:

১. মানুষ নিজের বুদ্ধি, বিবেক,প্রতিভার নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত ও একমাত্র ব্যবস্থাপক ও আইন রচয়িতা এবং তার নিকট হতেপ্রাপ্ত শিক্ষা ও বিধানকে যথার্থ আল্লাহর বিধান হিসেবে জানতে পারলো কি না?

২. এ নিগূঢ় সত্য জেনে নেওয়ার পর পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্বেও মানুষ নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ তায়ালার বাস্তব প্রভূত্ব ও শরীয়তী বিধানের কাছে মাথা নত করলো কিনা?

ইসলামী মতবাদঃ

১. বৈজ্ঞানিক, নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

২. ফিতরাতের বিধান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা উত্তরন।

৩. পার্থিব জীবনে এর ফলাফল:

ক) ব্যক্তিগত জীবনে দায়িত্বশীলতা ও উন্নত নৈতিকতা।

খ) বৈষম্যহীন ও নিরপরাধ সমাজ ব্যবস্থা।

গ) ইসলামের সার্বজনীনতা ও সরলতা।

ঘ) রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদ মানবপ্রভুত্বের উপর নয়, আল্লাহর প্রভুত্বের উপর।

ঙ) সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মপূজার পরিবর্তে আনুগত্য।

চ) বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আহবান।

= নবীদের উপস্থাপিত পথে পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং নবীদের আনীত পথ তথা ইসলাম সঠিক পথ এবং এটাই একমাত্র অনুসরনীয়।

তাকওয়া সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল- বাকারাহ:১৭৭ ও ২৫৫, আল ইমরান: ১০২

(দেখুন পৃষ্ঠা-৩০৬)

তাক্বওয়া সংক্রান্ত হাদীস

عَنْسُلَيْمَانَبْنِبُرَيْدَةَعَنْأَبِيْهِقَالَكَانَرَسُوْلُاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَإِذَاأَمَّرَأَمِيْرًاعَلَىجَيْشٍأَوْسَرِيَّةٍأَوْ
خَيْرًا صَاهُفِيْخَاصَّتِهِبِتَقْوَىاللهِوَمَنْمَعَهُمِنَالْمُسْلِمِيْنَ

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন’ (মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮)।

ঈদ এর নামাজ সম্পর্কিত মাসায়েলঃ **দেখুন পৃষ্ঠা ২৩৩**

অনুশীলনী -১৩(**জুলাই- ২য় সপ্তাহঃ**)

দারসুল কুরআনঃ সুরা আল ইনফিতার

1) إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ

2) وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ

3) وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ

4) وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

5) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

6) يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

7) ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ

8) فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ

9) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ

10) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ

11) كِرَامًا كَٰتِبِينَ

12) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

13) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ

14) وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ

15) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ

16) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ

17) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

18)ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

19)يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ

১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,

৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,

৪) এবং যখন কবরসমূহ উম্মে ।চিত হবে,

৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্মপর্কে বিভ্রান্ত করল?

৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।

৮) যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর।

১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

১১) সম্ম ।নিত আমল লেখকবৃন্দ।

১২) তারা জানে যা তোমরা কর।

১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে।

১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে;

১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।

১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না।

১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি?

১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি?

১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব ক্ষমতা হবে আল্লাহর।

সূরা আল-ইনফিতার (سورة الانفطار) হলো পবিত্র কোরআনের ৮২তম সূরা, যার অর্থ "বিদীর্ণ হওয়া"। এই সূরায় কিয়ামত বা বিচার দিবসের বিভীষিকা এবং আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও মানুষের অবাধ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নামকরণ : প্রথম বাক্যের ইনফিতার শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ ফেটে যাওয়া। সাধারণত অধিকাংশ সূরার মত এখানে চিহ্নস্বরূপ এই নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল : মক্কী সূরা এবং প্রাথমিক অবস্থায় অবতীর্ণ। মক্কাবাসীদেরকে আখিরাত সম্পর্কে সচেতন করা প্রথম যুগের অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : সূরাটির বিষয়বস্তু আখিরাত। হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদিস, 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।'

এই সূরায় প্রথমে কিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সে সময়ে দুনিয়ায় কৃত ভালো ও মন্দ সকল কর্ম প্রত্যেকেই দেখবে। তারপর মানুষের সৃষ্টি এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান-যোগ্যতা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বদানের পরও তার রবকে ভুলে থাকার কারণ যে আখিরাতে অবিশ্বাস সেটি ব্যক্ত করা হয়েছে।

মানুষকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, সম্মানিত লেখকবৃন্দ তার গতিবিধি, চালচলন ও কর্মকান্ড সব লিপিবদ্ধ করছেন এবং নেককারদের শুভ পরিণতি ও বদকারদের কঠিন শাস্তির কথা এই সূরায় বলা হয়েছে। সেদিনে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিয়ামতের বিভীষিকা:এই সূরার শুরুতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে এবং সমুদ্রগুলো উত্তাল হয়ে উঠবে।

আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব:সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন।

মানুষের অবাধ্যতা:সূরাটিতে মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে অবাধ্যতা করে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রতিদান ও শাস্তি: কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার কর্মফল অনুযায়ী প্রতিদান বা শাস্তি দেওয়া হবে, এই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

শুভ ও অশুভ পরিণাম: সূরাটিতে ভালো ও মন্দের দুটি পথ এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যারা সৎকর্ম করে, তারা পুরষ্কার লাভ করবে এবং যারা অসৎকর্ম করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

সারসংক্ষেপে, সূরা আল-ইনফিতার কিয়ামত ও বিচার দিবস, আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের অবাধ্যতা এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়ে আলোকপাত করে।

ব্যাখ্যা : প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামত দিনের প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কুরআন মজিদে বিভিন্ন জায়গায় কিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। বর্তমানে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে এ বিশ্বজাহান পরিচালিত হচ্ছে, আল্লাহপাক নিজেই একদিন তা ভেঙ্গে দেবেন।

হাদিসে সিঙ্গায় তিনটি ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ফুৎকারে এক প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প, তা কোন এক নির্দিষ্ট এলাকায় নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হবে। এখানে বলা হয়েছে যে আকাশ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং সমুদ্রসমূহ ফেটে যাবে, কোথাও বলা হয়েছে সমুদ্রসমূহে আগুন জ্বলতে থাকবে।

কোথাও বলা হয়েছে পাহাড়সমূহ ধূলা পশমের মত উড়তে থাকবে। মোট কথা পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে

এবং এ জমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। মনে হবে যেন একটি দস্তরখানা বিছায়ে দেয়া হয়েছে।

পরবর্তী ফুৎকারে সব মানুষ কবর থেকে উঠে আসবে এবং সে তখন সামনের ও পেছনের ঘটে যাওয়া সকল কৃতকর্ম জানতে পারবে। অর্থাৎ সে তার জীবদ্দশায় ভালো-মন্দ যা করেছে তা যেমন জানতে পারবে তেমনি মৃত্যুর পরে তার রেখে আসা আমলের দ্বারা অন্যান্যরা প্রভাবিত হলে তারও ছওয়াব ও গুনাহের সে ভাগীদার হবে।

৬-১২ আয়াতে মানুষের সুন্দর গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সুসামঞ্জ্যকরণ ও বিভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করে তার মধ্যে অনুভুতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ময়ের গর্ভে পিতার শুক্রকীট নিক্ষেপ এবং ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানবশিশুর জন্ম আল্লাহর এক বিষ্ময়কর সৃষ্টি। মানবশিশুর বেড়ে উঠা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন, প্রাণের সঞ্চার আল্লাহর ইচ্ছার ফলেই সম্ভব হয়।

তারপর মানুষের আকার-আকৃতি, চেহারা, কন্ঠস্বর, এমন কী বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের ভিন্নতাসহ প্রত্যেককে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি আল্লাহপাকের অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়ায় আসবে কারো সাথে কারো কোন মিল হবে না; সবাই স্বতন্ত্র দৈহিক কাঠামো, রুচি-পছন্দ নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করবে-এ সব চিন্তা করলে আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত না হয়ে উপায় থাকে না।

কিন্তু মানুষ উল্টো তাঁর নাফরমানিতেই লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহর ভাষায় এর মূলে কারণ একটিই এবং তা হলো আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস। অথচ মানুষের ভালো-মন্দ সকল কাজই আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা কর্তৃক রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে এবং তাঁরা

হলেন সম্মানিত, অর্থাৎ তাঁরা এমন নন যে, কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা ঘুষ-দুর্নীতির বিনিময়ে মিথ্যা লেখার মত তাঁরা নন।

তাঁদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা দুনিয়ার সরকার সমূহের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের মত নন যারা হাজারো চেষ্টা করেও অনেক সময় প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হন। আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা সকল বিষয়ে জ্ঞাত; কোন কিছুই তাঁদের অগোচরে নয়।

পৃথিবীতে মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কর্মকান্ডে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি আখিরাতে তাদের পরিণতিও ভিন্ন হবে। এখানে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করেছেন যে, বর্তমান দুনিয়ায় যারা নেক কাজ করবে তারা আখিরাতে পরমানন্দে থাকবে; পক্ষান্তরে পাপীদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব। যারা জাহান্নামে যাবে কখনই সেখান থেকে তারা সরে পড়তে পারবে না। সেদিনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আল্লাহপাক বলেছেন, আখিরাতে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না।

অতীতকালে মানুষের একটি ধারণা ছিল যে, নবী-রসূল বা আল্লাহর নেক বান্দারা বা তাদের উপাস্য দেবতারা সুপারিশ করে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিবে। এ ভ্রান্তি বর্তমানেও রয়েছে, যার কারণে মানুষ বিভিন্ন মাজার ও দরবারে ঘুরাঘুরি করে। এখানে বলা হয়েছে, কারোর জন্য কোন কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না। ফয়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

অবশ্য শিরকমিশ্রিত শাফায়াতের পরিবর্তে ইসলাম আমাদের সম্মুখে তাওহীদভিত্তিক সুপারিশের ধারণা প্রদান করেছে। সুপারিশ প্রসঙ্গে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য সুপারিশ পছন্দ করবেন কেবল তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন। আল্লাহর ওপর প্রভাব বিস্তার করে বা সুপারিশের মাধ্যমে কাউকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়ার ক্ষমতা সেদিন কারো থাকবে না।

আল্লাহপাকের ক্ষমা করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সেদিন কিছু লোককে তিনি সুপারিশ করার সুযোগ দান করবেন (নবী-রসূল ও নেক বান্দারা) এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর নেক বান্দাদের মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরবেন ও কিছু গোনাহগার বান্দাকে শাস্তি থেকে রেহাই দান করবেন।

শিক্ষা : আখিরাতের প্রতি ঈমান আনায়নই এই সূরার মৌলিক শিক্ষা। সমাজে জুলুম-নির্যাতন ও নানাবিধ পাপাচারের মূল কারণ আখিরাতে অবিশ্বাস। প্রথমত কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে; এরপর মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে, আল্লাহর নাফরমানির পেছনে পরকাল অবিশ্বাস ছাড়া আর কোন কারণ নেই। আল্লাহপাক আমাদেরকে পরকাল বিশ্বাসের মাধ্যমে সকল পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে নেক আমল করার তাওফিক দান করুন।

বইনোটঃ সত্যের সাক্ষ্য,

লেখকঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)

সাক্ষ্যঃ নিজে যা জানে তা অন্যের কাছে বলা বা যথাযথভাবেপ্রকাশ করার নামই সাক্ষ্য।

সত্যের সাক্ষ্যঃ আল্লাহর পক্ষথেকে যে সত্য এসেছে, উদ্ভাসিত হয়েছে, তার সত্যতা দুনিয়ার সামনে এমনভাবেপ্রকাশ করা যাতে দ্বীনের যথার্থতাপ্রমানিত হয়, এটাই সত্যের সাক্ষ্য।

সত্যের সাক্ষ্য দানের গুরুত্বঃ

১. সাক্ষ্যদানের ভিতিত্তেই হাশরের ময়দানে ফয়সালা হবে।

২. সাক্ষ্যদান সকল নবীর সুন্নাত।

৩. সত্যের সাক্ষী না হলে যালেমদের অন্তভূক্ত হবে।

৪. সাক্ষ্য না দিলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা, অপমান, অধঃপতন চেপে বসবে।

৫. সাক্ষ্য দান আল্লাহর পক্ষথেকে দেয়া দায়িত্ব।

সাক্ষ্যদানেরপ্রকারভেদ: ২ প্রকার

১. মৌখিক সাক্ষ্য: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য এসে পৌছেছে তা বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে সহজবোধ্য করাকে মৌখিক সাক্ষ্য বলে। দাওয়াতের সকল পদ্ধতিপ্রয়োগ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল উপাদান ব্যবহার করে ইসলামকে একমাত্র সঠিক পরিপূর্ণ বিধান হিসাবেপ্রমান এবংপ্রতিষ্ঠিত বাতিল মতাদর্শের দোষ ক্রটি তুলে ধরা।

২. বাস্তব সাক্ষ্য: যা মুখে বলা হয় তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের সামনে তার সত্যতা প্রমান। সৌন্দর্য্য ও কল্যানকারীতা প্রদর্শন করা নয়।

সাক্ষ্য দানের পূর্ণতা: আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারলেই দ্বীনের পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রদান হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকলে দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। সুতরাং শুধুমাত্রদ্বীনপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা সম্ভব।

সত্য গোপনে শাস্তি:

১. দুনিয়ার শাস্তি:

= গোটা দুনিয়ায় মুসলমানরা নির্যাতিত।

= পূর্বে ইসলামপ্রতিষ্ঠিত স্থানগুলো মুসলমানদের স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়া।

২. আখেরাতের শাস্তি: সত্যের সাক্ষ্য না দিলে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। দায়িত্ব পালন না করার কারনে পরকালে কঠিনতম শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মুসলমানদের সমস্যা:

চিন্তার ক্রটি: অন্যান্য জাতি পার্থিব যেসব সমস্যাকে মূল সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব দেয় আমরাও সেসব বিষয়কে একই ভাবে গুরুত্ব দিই।

যেমন: সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলিম।

সঠিক চিন্তা: যাবতীয় সমস্যার উৎস মূল দায়িত্ব তথা সত্যের সাক্ষ্যদান হতে বিমুখতার পরিনতি। কারন এ দায়িত্ব পালন না করার কারনেই অন্যেরা এসব সমস্যার সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে।

যেমন: আর যে সংখ্যালঘু মুসলিম জাতি সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সংখ্যাগুরুত্ব এ পরিনত হয়েছে।

সমস্যার সমাধান:

যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ হচ্ছে যথাযথভাবে সত্যের সাক্ষ্য পেশ করা।

আসল সমস্যা: দুনিয়ায় মুসলিম হিসাবেপ্রতিনিধিত্বের দাবী ইসলামের, বাস্তবে ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করি।

ফলাফল:

= দুনিয়ার মানুষ ইসলাম সম্মপর্কে ভুল তথ্য জানছে।

= মানুষ আমাদের কারনে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারছে না।

মুসলমানদের দুনিয়ায় ব্যর্থতার কারণ: ইসলামের লেবেল খুলে দিয়ে কুফরী গ্রহন করলে দুনিয়াবী জিন্দেগী চাকচিক্যময় হত। কিন্তু নাম ও কর্ম সংঘাত হওয়ায় উন্নতিও বন্ধ।

আমাদের কর্মপদ্ধতি:

= মুসলমানদের ইসলাম সম্মপর্কে মৌলিক জ্ঞানপ্রদান এবং তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা।

= শুধু ব্যক্তিজীবন নয় ইসলামকে মানা এবংপ্রতিষ্ঠার জন্য সামষ্টিক বা সংগঠনিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটা বুঝিয়ে দেয়া।

কাজের পথ:

= আমাদের নিয়ম, শৃংখলা, কর্মনীতি, আকীদা ভাল লাগলে আমাদের সাথে যোগদান করা।

= অন্যদলকে আমাদের চেয়ে খাঁটি মনে হলে সে দলে যোগ দেয়া।
= কোন দল খাঁটি মনে না হলে নিজের উদ্যোগে দল গঠন করা।

দ্বীনের একাধিক দল গঠনের আশংকা: আপাতত দৃষ্টিতে ইসলামী দল বেশি হলে বিশৃংখলা দেখা দিবে।

একাধিক দল গঠনের কারণ:
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচালিত সংগঠনই শুধুমাত্র "আল জামায়াত" হিসাবে দাবী করতে পারে। অন্য কোন দলকে "আল জামায়াত" বলা যাবে না। সুতরাং দ্বীনের জন্য একাধিক দল গঠনে বাধা নেই।
ফলাফল: নিষ্ঠার সাথে সবাই কাজ করলে লক্ষ্য যেহেতু একই সেহেতু মাঝপথে মিলিত হবে।

বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

সুরা আত তাওবা -১১১

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ ؕ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی التَّوۡرٰىةِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِکُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۱۱﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং

তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।

সুরা আল আনআম- ১৬২

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۶۲﴾

বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।

আল-ফাতহ: ১০

اِنَّ الَّذِیۡنَ یُبَایِعُوۡنَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُوۡنَ اللّٰهَ ؕ یَدُ اللّٰهِ فَوۡقَ اَیۡدِیۡهِمۡ ۚ فَمَنۡ نَّکَثَ فَاِنَّمَا یَنۡکُثُ عَلٰی نَفۡسِهٖ ۚ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِمَا عٰهَدَ عَلَیۡهُ اللّٰهَ فَسَیُؤۡتِیۡهِ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ﴿۱۰﴾

আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।

আল-ফাতহ: ১৮

لَقَدۡ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ یُبَایِعُوۡنَکَ تَحۡتَ الشَّجَرَۃِ فَعَلِمَ مَا فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ فَاَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ عَلَیۡهِمۡ وَ اَثَابَهُمۡ فَتۡحًا قَرِیۡبًا ﴿۱۸﴾

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।

মুমতাহিনা: ১২

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ
بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ
لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাইয়াত সংক্রান্ত হাদিস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ

ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করতাম যে, আমরা তাঁর কথা শুনব এবং আমল করব। আর তিনি আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে তোমরা তোমাদের সাধ্যমত দীনের কাজ করবে। (আবু দাউদ, ইসলামি ফাউন্ডেশন ২৯৩০)

একাধিক বার বাইয়াত নেওয়া প্রসঙ্গেঃ

عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ. قَالَ " وَفِي الثَّانِي ".

সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়আত (বায়আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেনঃ হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তো প্রথমবার বায়আত গ্রহন করেছি। তিনি বললেনঃ দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর। (বুখারী, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৬৭১৫)

মাসআলাঃ নামায সংক্রান্ত (পৃষ্ঠা-২০

অনুশীলনী -১৪(**জুলাই-৪র্থ সপ্তাহঃ)**

দারসুল কুরআন : সুরা আল ইনফিতার - পৃষ্ঠা-৩২২

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

লেখকঃ আব্বাস আলী খান

প্রকাশকঃ আবু তাহের মুহম্মদ মাসুম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রকাশনা বিভাগ

প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৮৬

বইটি ১৫ টি অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে।

ভুমিকাঃ দশ বছর পূর্বে ১৯৮৬ সালে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। যাঁরাই জামায়াতে ইসলামীর সাথে সঠিকভাবে পরিচিত হতে চান এবং যাঁরা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত হতে চান, তাঁদের অবশ্য অবশ্যই জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস মন দিয়ে পড়া উচিত। জামায়াতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ এবং আদর্শিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে এ ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য। ইতিহাস ও কাল পরিক্রমায় দেখা যায়, কোন একটি আন্দোলন অথবা জাতি যুগের পর যুগ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে কিছু বিকৃতি বা আদর্শচ্যুতি শুরু হয়। এমন সময়ে তার প্রতিরোধ করতে না পারলে অথবা প্রতিরোধের চেষ্টা না করলে অবশেষে তার পতন ঘটে। ঠিক তেমনি জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটি

দ্বীনি আন্দোলনের সম্ভাব্য বিকৃতি অথবা পতন রোধ করতে হলে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস দৈনন্দিন পাঠ্য তালিকায় রাখতে হবে।
এ ইতিহাস যদিও তার প্রাথমিক যুগের সাত বছরের ইতিহাস, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে জামায়াত গঠনের পটভূমি, উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথা একজাতীয়তার ভিত্তিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প, সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একাকার করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র প্রভৃতি।

এ ইতিহাসে জামায়াতের আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি, ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের সহজ সরল ব্যাখ্যা, যা নিয়ে ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে, আন্দোলনের নেতাকর্মীদের অপরিহার্য গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়গুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জামায়াত গঠনকালে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্মেলনে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা যেসব অমূল্য ভাষণ দিয়েছেন, পাঠক অবশ্যই তার থেকে একামতে দ্বীনের প্রেরণা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মনমানসিকতা ও রূহের খোরাক এবং এ সব হতে তাঁর এ কঠিন পথে চলার মূল্যবান পাথেয় লাভ করতে পারবেন।
সূচিপত্র

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস- ১৯৪১-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী কি?
ইসলামী আন্দোলনের সূচনা
মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ
খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন
খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন
ভারতে ইসলামী আন্দোলন

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল-জিহাদু ফিল ইসলাম গ্রন্থ

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতি স্তর

তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা

তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন

দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে

দল গঠনের পটভূমিকা রচনা

দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ

চতুর্থ অধ্যায়

দারুল ইসলাম পরিকল্পনা ও মাওলানা মওদূদী

মাওলানার বক্তব্য

দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু কথা

দারুল ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা

দারুল ইসলামের গঠনতন্ত্র

কাজের চিত্র

ইসলামী সীরাত

আর্থিক উপায়-উপকরণ

উদ্দেশ্য হাসিলের পথ

প্রতিরোধ

গঠনমূলক কাজ

তাত্ত্বিক বিভাগ

ব্যবহারিক বিভাগ

কাজের প্রসার

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মওদুদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা
তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা বলেন
মাওলানা জিজ্ঞেস করেন
ইসলামী জাতীয়তা
মাওলানা বড় সত্য কথা বলেন
ধর্মহীন সংবিধান সম্পর্কে মাওলানা বলেন
বৃটিশ পূজারী বলে যারা গালি দেয় তাদের জবাবে মাওলানা বলেন
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে মাওলানা বলেন
মুসলিম জাতীয়তা
মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (প্রথম খণ্ড)
অভাব কিসের?
মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (দ্বিতীয় খণ্ড)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব
একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের সমালোচনা
পাশ্চাত্য জাতীয়তা, ইসলামী জাতীয়তা ও একজাতীয়তা
প্রথম প্রস্তাব
দ্বিতীয় প্রস্তাব
তৃতীয় প্রস্তাব
জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা
জামায়াতে ইসলামীর কাজ
জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুমোদন
জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত
আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর
জামায়াত দফতর স্থানান্তর
মাওলানার বিশেষ হেদায়েত

মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন (১৯৩৯-৪২)

সপ্তম অধ্যায়

জামায়াত সংকটের সম্মুখীন

আন্দোলনের বিরোধিতা

মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক

অস্থায়ীভাবে দারুল ইসলামে কেন্দ্র স্থানান্তরিত

নতুন কেন্দ্রে নতুন পরিকল্পনা

মতপার্থক্য ও তার সমাধান

সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা

মহাযুদ্ধ আন্দোলনের বিরাট প্রতিবন্ধক

সংগঠন ও প্রশিক্ষণের স্তর

তিনটি আঞ্চলিক সম্মেলন

মধ্যভারতের সম্মেলন

ইসলামী দাওয়াতের রিপোর্ট ও তার পর্যালোচনা

একটি অর্থনৈতিক স্কীম

সংগঠন, তরবিয়ত ও তাকিয়া

সমাজ স্বয়ং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

তরবিয়তী ব্যবস্থা খানকাহী নয়- আন্দোলনমূলক

যাহের ও বাতেনের সংশোধনের কাজ

উত্তর ভারতীয় সম্মেলন

রুকনিয়াতের শপথ ও স্থবিরতা

দিল্লী সম্মেলন।

কর্মীদের গুণাবলী

মুবাল্লিগের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ

কাইয়েমে জামায়াত নিয়োগ

হায়দরাবাদ সম্মেলন

মাওলানার উদ্বোধনী ভাষণ

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী সম্মে লন

আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণ

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত

নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্যঃ নবী মুস্তাফার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে উদ্দেশ্য পূরণের পদ্ধতি

নবম অধ্যায়

সম্প্রসারণ ও উন্নতির যুগ

দ্বিতীয় নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মে লন

জামায়াতে ইসলামীর

শূরায়ী নিযামের (পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার) ক্রমোন্নতি

জামায়াতে সমালোচনার নিয়মিত ব্যবস্থা

সমাজের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার

উলামায়ে কেরামের মধ্যে দাওয়াতের প্রভাব

আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব

জামায়াতে ইসলামী ও তাগুতী শাসন

অন্যান্য মহলে জামায়াতের প্রভাব

বিভিন্ন মহলে প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা

মহিলাদের মধ্যে কাজ

বহির্বিশ্বে জামায়াতের প্রভাব

দাওয়াতী সাহিত্য প্রণয়ন

তরজমার ব্যবস্থাপনা

দশম অধ্যায়

চারটি ঐতিহাসিক সম্মে লন

মাদ্রাজ সম্মেমলন (২৫ শে ও ২৬ শে এপ্রিল)
ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচি
পাটনা সম্মেমলন (২৫ শে ও ২৬ শে এপ্রিল ১৯৪৭)
পাঠানকোট সম্মেমলন (৯ই ও ১০ই মে- ১৯৪৭)
জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্যে বক্তার মান নির্ণয়
প্রশ্নমালা

একাদশ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
শাহওলী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)
সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ)

দ্বাদশ অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য
ইসলামী আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলন
ইসলাম আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
মাওলানা একজন নওমুসলিম
আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ
আন্দোলনের পতনযুগ
ইসলামের বর্তমান অবস্থা
ইসলাম ও তার দাবী
একটি ইসলামী জামায়াতের দাবীসমূহ
যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা
পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে কিরূপ হওয়া উচিত
অখণ্ড ভারতের পজিশন
কুরআন কি বলে

আমাদের সম্পর্ক
আমাদের পদমর্যাদা
প্রকৃত ইসলামী লক্ষ্য
এ লক্ষ্যে পৌঁছুবার সোজাপথ
পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত
মুসলিম ও অমুসলিমদের সামনে ইসলামের দাওয়াত
মানুষের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ
মানুষের কল্যাণ কিভাবে হতে পারে?
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা
রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ
ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
ইসলামী বিপ্লবের পথ
নবী পাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে আহ্বানের প্রতিক্রিয়া
হিজরতের পর আন্দোলন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জনসেবা
জামায়াতে ইসলামী ও জনসেবা
দারুল ইসলাম, পাঠানকোট
দারুল ইসলাম বস্তির অতি বেদনাদায়ক দৃশ্য
কেন্দ্রীয় জামায়াত লাহোরে স্থানান্তরিত
জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত

চতুর্দশ অধ্যায়

জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি
জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

পঞ্চদশ অধ্যায়

কাজের মূল্যায়ন
বারো দফা আলোচ্য বিষয়
সার্বভৌমত্বের ধারণা ও খেলাফতের মতবাদ
স্বাধীনতার ধারণা
নেতৃত্বের ধারণা
গুণগত সদস্যপদ
গণতন্ত্রের ধারণা
সংগঠনের ধারণা
জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর সভাপতির মধ্যে পার্থক্য
ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের ধারণা
জাতীয়তার ধারণা
ইসলামের ধারণা
মৌলিক অধিকারের ধারণা
শাসনব্যবস্থা ও সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে পার্থক্য
জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ
জামায়াত এক নতুন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ
সত্য কি শুধু জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেই সীমিত?
দ্বীন ইসলামকে আন্দোলন হিসেবে পেশ করা
একামতে দ্বীনের ধারণা একটা পাগলামি
জামায়াতের বাইরে কি ইসলাম নেই?
রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লালসা
ব্যক্তি সংস্কারের পরিবর্তে সমষ্টির সংস্কারের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে
জামায়াতে ইসলামীর থিওক্র্যাসির (এ্যবড়পৎধপু)
পতাকাবাহী
জামায়াতে ইসলামী একটি নতুন ফের্কা

উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ

পরিশিষ্ট-

একখানা পত্র

পরিশিষ্ট- জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সার্কুলার

পরিশিষ্ট- এক নজরে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ সম্মে লনসমূহ

পরিশিষ্ট- তর্জুমানুল কুরআনের কিছু মূল্যবান কথা

পরিশিষ্ট- জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা:

দল গঠনের আবশ্যকতা

তবলীগ ও বিপ্লব

ইকামতে দ্বীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য

হুকুমতে ইলাহিয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

সত্য পথের দাবী

পরিশিষ্ট- সন্দেহ-সংশয় নিরসন

মাওলানার জবাব

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস- ১৯৪৭-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়ঃ

জামায়াতে ইসলামী কী

ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা লাভ

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী

পাকিস্থান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

দ্বি-জাতিতত্ব ও মাওলানা মওদূদী

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ
স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২৮
দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জামায়াতে ইসলামী ২৯
পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন যেভাবে শুরু
ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্ম দ আলী জিন্নাহ
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা ৪৩
ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন ৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা আব্দুর রহীম ৪৭
পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ইউনিট
ঢাকায় কাজের সূচনা
স্বাধীনতা উত্তর পাকিস্তানের নেতৃত্ব
জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ২য় খণ্ড ৭
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে স্মারক লিপি প্রদান
সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা
মাওলানা আব্দুর রহীমকে প্রাদেশিক জামায়াতের সেক্রেটারি নিয়োগ
পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াত প্রতিনিধিদের সফর
পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রথম আমীর
প্রথম প্রাদেশিক অফিস
মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ
ফাঁসির কক্ষে মাওলানা মওদূদী

চতুর্থ অধ্যায়

জনাব আব্দুল খালেকের জামায়াতে যোগদান

অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে যোগদান

অধ্যাপক গোলাম আযমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কারাগারে অধ্যাপক গোলাম আযমের রুকনিয়াতের শপথ

রংপুরে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাংগঠনিক তৎপরতা

অঞ্চলভিত্তিক সাংগঠনিক দায়িত্ব বণ্টন

জনাব আব্বাস আলী খানের জামায়াতে যোগদান

সংগঠনের নির্দেশে আব্বাস আলী খান সাহেবের চাকরি থেকে ইস্তফা

পঞ্চম অধ্যায়

করাচি রুকন সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল
প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন
মাওলানা মওদূদীর প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর
ঢাকায় মাওলানার অবস্থান
মাওলানা মওদূদীর ৪০ দিনের সফর সূচি
সভা-সম্মে লনে মাওলানার আলোচনার বিষয়
মাওলানা মওদূদীর সফরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
মাওলানা মওদূদীর সফরের পর
আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা

বাইয়াত সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আত-তওবা: **১১১**, আন'আম: **১৬২**, আল-ফাতহ: **১০ ও ১৮**, মুমতাহিনা: **১২** দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩১

১টি হাদীস মুখস্ত, দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩৩

মাসয়ালা: নামাজ সংক্রান্ত। দেখুন পৃষ্ঠা ২০

অনুশীলনী -১৫(আগষ্ট-২য় সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী -সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত)

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ٭ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

অর্থঃ (১) আলিফ লাম মীম [এর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না]। (২) এই তো কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, আছে মোত্তাকীদের (অন্যায় পরিহারকারী, আল্লাহভীরু, সৎকর্মশীল ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের) জন্য পথনির্দেশ; (৩) যারা অদৃশ্য সত্যকে বিশ্বাস করে, নামায আদায় করে, আর আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে; (৪) যারা তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে (অন্য নবীদের কাছে) যা নাযিল করা হয়েছিল তা বিশ্বাস করে; আর পরকালের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রভুর সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফলকাম।

নামকরণ ঃ সূরা আল-বাকারার নামকরণ হয়েছে 'আল-বাকারাহ' (গাভী) শব্দটি থেকে। এই নামকরণটি এই সূরার ৬৭ থকে ৭৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের গাভী জবাই করার ঘটনা থেকে এসেছে।

শানে নুযুলঃ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার ফলে ইসলাম প্রচার ব্যাপক হতে থাকে। তখন কুরাইশদের সাথে সাথে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান এবং মুনাফিকরা ইসলামের গতিরোধ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা ইসলামের প্রতি অমূলক নানারকম অপবাদ প্রচার করতে থাকে। এমনকি তারা পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নানারূপ সন্দেহমূলক উক্তি করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি,

খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সেই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে সূরা আল-বাকারা নাযিল করেন। এ সূরায় ইসলাম বিদ্বেষীদের সমস্ত অপবাদের জবাব দেওয়া হয়। কুরআন যে একান্ত আল্লাহ তা'আলারই সত্য বাণী, ইসলাম যে বিশ্বমানবতার একমাত্র দিশারী তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। (তাফসীরে হাক্কানী)

তাফসীরে নুরুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- এ সূরার শানে নুযুল হল এই যে, মালিক ইবন সাইফ নামক এক ইয়াহুদি কুরআনের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালাতো যে-এটা সেই পবিত্র গ্রন্থ নয়, যার নাযিল হওয়ার সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে দেওয়া হয়েছিল। তখন পবিত্র কুরআন সম্মপর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করার জন্য এ সূরা নাযিল করা হয়। এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়- এটা সেই কিতাব, যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিষয়বস্তু ঃ আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। এ সূরাটি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬ এবং এতে ৪০টি রুকু রয়েছে।

- সূরা আল-বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- হযরত আদম আ. ও হাওয়ার আ. সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল করার কথা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।
- মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদিদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহ এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে।

- মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে মাসজিদুল হারাম নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।
- সবশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরায়।

সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মদীনা জীবনের সূচনাতে এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

- সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় সূরা আল-বাকারায় অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় সেসব আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টি প্রধান ধারা। একটি হল- মদীনায় অবস্থিত ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিক শ্রেণির ইসলামের বিরোধিতার জবাব ও তাদের অসারতা প্রমাণ করা। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে- পথিবীতে তাওহীদের একমাত্র ধারক-বাহক জাতি হিসেবে মুসলমানদের গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দেওয়া। এ দুটো ধারাই সূরা আল-বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।
- কুরআনের নির্ভুলতা এ সূরার প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে- "এ কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই"। পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে- এটা কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়।
- মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র সূরার শুরুতে মু'মিন-মুত্তাকিদের গুণ-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মু'মিনগণ কীভাবে আল্লাহর আদেশ মান্য করে এবং তাদের জীবন-ই যে সাফল্যময়-তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কাফির-নাস্তিকদের ব্যর্থতা নাস্তিক-কাফিরদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা সত্য-সুন্দরকে সব সময় প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে বলে দেওয়া হয়েছে কাফিরদের অন্তর সত্য গ্রহণের উপযুক্ত নয়। এদের জীবন চরমভাবে ব্যর্থ।

- মুনাফিকদের পরিণতি মুনাফিকরা সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু এ চক্রটি ইসলাম ও মুসলমানের ভীষণ ক্ষতি করে। তাদের জঘণ্য আচরণ, তাদের জীবনের পরিণতির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- মানব সষ্টির উদ্দেশ্য মানব সষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে- পথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে মানুষকে।
- আদম (আ) সৃষ্টির কাহিনী হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী, পথিবীতে প্রেরণ ও দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।
- ইয়াহুদি জাতির মুখোশ উন্মোচন বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাদের অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে যে, কীভাবে তারা পথিবীর নেতৃত্বে এসেছিল এবং দুষ্কর্মের কারণে কীভাবে তারা নেতত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে অভিশপ্ত হয়।
- ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরোধ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে আহলে কিতাবের লোকেরা নিজেদের ধর্মের বিরোধিতা করেছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিশ্রুত আখেরী নবী হিসেবে অস্বীকার করে তাদের স্বার্থহানির ভয়ে তারা যেসব কথা বলেছে, সে কথাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।
- কুরআনের মুজিযা আল-কুরআন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর চিরন্তন মুজিযা। এটা মানব রচিত নয় বরং মহান আল্লাহ প্রেরিত। এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ আকারে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- হযরত ইবরাহীম (আ) ও কাবা ঘর প্রসঙ্গ এ সূরায় মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরহীম (আ)–এর প্রসঙ্গ এবং ইসমাইল-ইসহাক ও কাবা ঘর

নির্মাণ-একে পবিত্রকরণ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে বিশ্ব মুসলিমের কিবলা নির্ধারণ এবং একে কেন্দ্র করে ইবাদাতানুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্ম াহকে পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ইসলামি শরীআতের প্রবর্তন ইসলামি শরীআতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, খাদ্য-পানীয়, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতিম, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আর এসব শরীআতের বিধান সমাজে প্রবর্তন করা হয়েছে।
- তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলগণের পরস্পর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম-নমরুদ বিরোধ তুলে ধরে তাওহীদের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা মানব জীবনের সফলতা নির্ভর করছে আল্লাহর মর্জির উপর। কাফির-নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সফল ও বিজয়ী হওয়ার জন্য এবং জীবনের সফলতার জন্য সবর্তোভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

(১) الم আলিফ লা-ম মী-ম।

ব্যাখ্যাঃ এ গুলোকে আরবীতে 'হুরূফে মুক্বাত্ত্বাআত' (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা) বলা হয়। অর্থাৎ, একটি একটি ক'রে পঠনীয় অক্ষর। এগুলোর অর্থের ব্যাপারে কোন

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। কুরআনে মোট উনত্রিশটি সূরার শুরুতে এইগুলো এসেছে মোট চৌদ্দটি হরফে।

আলিফ-লা- মিম (الم) এসেছে সূরা বাকারা; আলে ইমরান, আনকাবুত, রূম, লুকমান, সাজদাতে

আলিফ লাম মিম সোয়াদ (المص)এসেছে সূরা আরাফে।

আলিফ-রা (الر) এসেছেঃ সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, ইবরাহিম, হিজর।

আলিফ-লাম-মিম-রা (المر): সূরা রা'দ

কাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ (كهيعص): সূরা মারইয়াম।

ত্বাহা (طه) : সূরা ত্বাহা

ত্ব-সিন-মিম(طسم): সূরা শোয়ারা, আল-কাসাস।

ত্ব-সিন(طس): সূরা নামল।

ইয়া-সিন(يس): সূরা ইয়াসিন।

সোয়াদ(ص) সূরা সোয়াদ

হা-মিম(حم): সূরা গাফির, ফুসসিলাত, যুখরূফ, দুখান, জাসিয়া, আহকাফ।

হা-মিম-আইন-সিন-কফ(حم عسق):সূরা শুরা

ক্বফ(ق): সূরা ক্বাফ

নুন(ن): সূরা আল-কলম।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, আমি এ কথা বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে একটি করে নেকী হয়। আর একটি

নেকীর প্রতিদান দশটি করে পাওয়া যায়। (সুনানে তিরমিযী, পরিচ্ছেদঃ ক্বুরআনের ফযীলত, অধ্যায়ঃ যে ক্বুরআনের একটি অক্ষর পড়ে)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(২)এই সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন।

ব্যখ্যা: এ কিতাবের অবতরণ যে আল্লাহর নিকট থেকে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা সাজদা ২) অথবা এটা একটা যে হেদায়েতের কিতাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুত্তাকী বা পরহেযগারদের জন্য এই কিতাব পথ-প্রদর্শনকারী। মুত্তাকীর বর্ণনায় আল্লাহ পরবর্তীতে বলছেন-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে

ব্যখ্যা: অদেখা বিষয়সমূহ হল এমন সব জিনিস যার উপলব্ধি জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহর সত্তা, তাঁর অহী (প্রত্যাদেশ), জান্নাত ও জাহান্নাম, ফিরিশতা, কবরের আযাব এবং মৃত দেহের পুনরুত্থান ইত্যাদি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত এমন কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের অংশ যা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আর তা অস্বীকার করা কুফরী ও ভ্রষ্টতা।

যথাযথভাবে নামায পড়া বা নামায কায়েম করার অর্থ হল, নিয়মিতভাবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা অনুযায়ী নামায আদায়ের প্রতি যত্ন নেওয়া। নচেৎ নামায তো মুনাফিকরাও পড়তো।

'ব্যয় করা' কথাটি ব্যাপক; যাতে ফরয ও নফল উভয় প্রকার (ব্যয়, খরচ, দান বা সদকা)ই শামিল। ঈমানদাররা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী উভয় প্রকার সদকার ব্যাপারে কোন প্রকার কৃপণতা করে না। এমনকি পিতা-মাতা এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করাও এই 'ব্যয় করা'র মধ্যে শামিল এবং তাও নেকী লাভের মাধ্যম।

والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

ব্যখ্যা: পূর্ববতী নবী-রাসূলদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সর্বশেষ কিতাব (আল কুরআন) অনুযায়ী জীবন চালাতে হবে।

أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(৫)তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

ব্যখ্যা: উপরে বর্ণিত গুণাবলীর লোকেরাই সফলকাম এবং পথপ্রাপ্ত। তারাই নাযাতের পথে।

শিক্ষাঃ সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মু'মিন ও মুত্তাকির পরিচয় ঃ

মু'মিন মানে বিশ্বাসী। আর মুত্তাকি অর্থ হল পরহেযগার ও আল্লাহভীরু, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবীরা গুণাহ, অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর হুকুমআহকাম পালন করে, তারাই মুত্তাকি। প্রকৃত মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হল-

➢ তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী মু'মিন-মুত্তাকির প্রথম গুণটি হল তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে। ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয়-সংস্কৃতি এবং আদর্শের মৌলিক বিষয় এটাই। এ বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে : "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ২) অদৃশ্যের বিষয়াবলির মধ্যে আছে- মহান প্রভু আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, ওহী, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি। অদৃশ্যে বিশ্বাস মু'মিন-মুত্তাকি হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তু বাদীরা এ অদৃশ্যে বিশ্বাস না করে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

➢ তারা সালাত কায়েম করে সালাত প্রতিষ্ঠা করা মু'মিন-মুত্তাকির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন- "তারা সালাত কায়েম করে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ২) সালাতের মধ্য দিয়ে তারা এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু গায়েবে বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থেকে 'জপ' করলেই মুত্তাকি হওয়া যায় না। আনুগত্যের বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে সালাতের মাধ্যমে। দিবা-রাত্র পাঁচবার ফরয সালাত ও সিজদার মাধ্যমে তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

➢ তারা আল্লাহর দেওয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে মু'মিন-মুত্তাকির ততীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- "তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ২) যা কিছু ধন সম্পদ আছে তা মহান আল্লাহর দান। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ বিশ্বাস অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে। কাজেই মু'মিন-মুত্তাকি অর্থের পূজারী হয় না। তার ধন-সম্পদে আল্লাহ ও অন্যান্য মানুষের যে অধিকার আছে সে তা থেকে ব্যয় করে।

➢ তারা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে মু'মিন-মুত্তাকিদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- "এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ৩) মানব

জাতির পথ নির্দেশনার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে সব আসমানি কিতাব যুগেযুগে নাযিল করেছেন- মু'মিন-মুত্তাকিগণ তা স্বীকার করে।

➢ তারা আখিরাত জীবনে সুদঢ় বিশ্বাসী মু'মিন-মুত্তাকির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- "এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকারা ২ঃ৩) এ বিশ্বাস কর্মকে কর্মফলের সাথে এবং সূচনাকে পরিণতির সাথে যুক্ত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে এ চেতনা দান করে যে, পথিবীতে তার সৃষ্টি, তার কর্মকাণ্ড, তৎপরতা, বিশ্বাস, জীবনাচার কিছুই বৃথা যাবে না। সে নিরর্থক সষ্টি নয়। তাকে তার কর্মের জন্যে মহাবিচারকের নিকট হাযির হতে হবে। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মু'মিন-মুত্তাকির জীবনই সাফল্যময় হবে ইহজগতে ও পরজগতে।

বিষয়ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে হাদিসের পবিত্রতা রক্ষা এবং কুরআনে বিশদ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার জন্য হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। যার ফলে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর যুগে হাদিস সংকলনের শুভসূচনা হয় এবং আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের যুগে তা পূর্ণতা লাভ করে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে হাদিস সংকলনের ইতিহাসকে মোট পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে হাদিস সংকলন।

খ. সাহাবায়ে কেরামের যুগে হাদিস সংকলন।

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগে হাদিস সংকলন।

ঘ, আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে হাদিস সংকলন।

ঙ. সিহাহ সিত্তাহ প্রণয়ন।

ক. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে হাদিস সংকলন :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআনের সাথে হাদিসের সংমিশ্রণের আশঙ্কা থাকায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণকে হাদিস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেন-

لا تكتبوا عنى غير القران ومن كتبه فليمحه

কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লেখার মাধ্যমে হাদিস সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করলে সাহাবীগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করেন। যেমন-

১) মদিনা সনদঃ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরত করে মদিনায় গমন করার পর সেখানে সকল ধর্মের লোকদের সাথে সহাবস্থানের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এটাই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।

২) ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকাঃ মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নব মুসলিমদের নামের তালিকা করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা) বলেন

وكتبنا له الفا وخمس مائة رجل-

৩) হযরত আবু যার (রা)-এর লেখাঃ হাফেয ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন।

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات

والفرائض والسنن بعمرو بن حزم وغيره-

অর্থাৎ, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমর ইবনে হাযম ও অন্যান্যকে সদকা, দিয়াত এবং ফরয ও সুন্নাত সম্পর্কে এক দস্তাবেজ লিখে দিয়েছিলেন।

৪) সন্ধিপত্রঃ বনু সাকীফের সাথে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন, যা নিম্নোক্ত শিরোনামে শুরু করেছিলেন

-هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيفٍ

৫) অন্যান্য: বিভিন্ন গোত্রে ও সম্প্রদায়ের প্রতি বিভিন্ন সময় লিখিত ফরমান, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে লিখিত ইসলামের দাওয়াত সংবলিত চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণ করা হয়।

খ. সাহাবায়ে কেরামের যুগে হাদিস সংকলন :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাহাবীগণ হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে কিছুসংখ্যক হাদিস সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন-

১) হযরত আলী (রা) কর্তৃক সংরক্ষিত হাদিস সংকলন 'সহীফায়ে আলী'।

২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সংকলন সহীফায়ে সাদেকাহ'।

৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সংকলন 'সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেক'।

৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফায়ে ইবনে আব্বাস'।

৫) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফায়ে ইবনে মাসউদ'।

৬) হযরত আবু হোরায়রা (রা) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফায়ে আবু হুরায়রা'।

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগে হাদিস সংকলন :

উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর যুগেই সরকারিভাবে হাদিস সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১) খলিফার নির্দেশ জারি: দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ইসলামি রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায় এ নির্দেশ জারি করেন-

أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء-

এ সময় খলিফার নির্দেশ মোতাবেক মদিনার গভর্নর হযরত আবু বকর ইবনে হাযম বিপুল সংখ্যক হাদিস সংগ্রহ করে হাদিসের কয়েকটি খণ্ড গ্রন্থ সংকলন করেন।

২) মুহাদ্দিসগণের হাদিস সংকলনে আত্মনিয়োগ সে সময় ইসলামি রাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে হাদিস বিশারদগণ হাদিসে নববী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন- ইবনে জুরাইজ, আওযায়ী, যুহরী, সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, মাকতুল, হিশাম, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে হাদিসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।

ঘ. খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে হাদিস সংকলন :

আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগ হলো হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের সোনালি যুগ। এ যুগ তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম শতাব্দীতে শেষ হয়।

১) মুতাওয়াক্কিলের উদ্যোগে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের মতবাদ প্রমাণ ও ইসলামি সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার নিমিত্তে মিথ্যা হাদিস প্রচার শুরু করে। তখন খলিফা মুতাওয়াক্কিল সরকারিভাবে হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনে উদ্যোগী হন। তিনি হাদিস শিক্ষাদানের জন্য অনেক মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

২) রিওয়ায়াত ও দিরায়াত: মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদিস ও জাল হাদিসের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করার জন্য রিওয়ায়াত ও দিরায়াত নামে দুটি হাদিস পরীক্ষণ

পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা অত্যন্ত যাচাইবাছাই করে সহীহ হাদিসসমূহ নিজেদের সংকলিত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন।

৬. সিহাহ সিত্তাহ প্রণয়ন :

এ যুগে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ৬টি হাদিসগ্রন্থ সংকলন হয়।

গ্রন্থগুলো হলো-

১. ইমাম বুখারী (র) সংকলিত 'সহীহ বুখারী'।

২. ইমাম মুসলিম (র) সংকলিত 'সহীহ মুসলিম'।

৩. ইমাম তিরমিযী (র) সংকলিত 'জামে তিরমিযী'।

৪. ইমাম আবু দাউদ (র) সংকলিত 'সুনানে আবু দাউদ'।

৫. ইমাম নাসায়ী (র) সংকলিত 'সুনানে নাসায়ী'।

৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (র) সংকলিত 'সুনানে ইবনে মাজাহ'।

হাদিস সংকলনের সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়ে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ও আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল (র) যে অবদান রেখেছেন মুসলিম জাতির নিকট তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুত্রঃ https://www.senaninews.com/

আয়াত মুখস্ত ঃ

আল-বাকারা: ২৬১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

আলে-ইমরান: ৯২

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।

আল-হাদীদ: ১১

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجْرٌ كَرِیْمٌ

এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত হাদিস

عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْفَحِي - أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي - وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি ছড়িয়ে দাও অথবা বিলিয়ে দাও অথবা ব্যয় কর। গুণে গুণে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুনে দিবেন। আর গুটিয়ে রেখ না তবে আল্লাহ ও তোমার থেকে গুটিয়ে রাখবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-২২৪৮)

মাসয়ালা: তাহারাত সংক্রান্তঃ দেখুন পৃষ্ঠা ২৬৭

অনুশীলনী -১৬ (আগষ্ট-৪র্থ সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী - সূরা নাস,

দয়াময়, পরম করুনাময় আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
(১) কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। (অর্থ: বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার।)	(1) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
(২) মালিকিন নাস। (অর্থ: যিনি মানুষের অধিপতি।)	(2) مَلِكِ النَّاسِ
(৩) ইলাহিন নাস। (অর্থ: যিনি মানুষের উপাস্য।)	(3) إِلَٰهِ النَّاسِ
(৪) মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্না-স। (অর্থ: কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।)	(4) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
(৫) আল্লাযি ইউয়াস ডিসু ফি সুদুরিন নাস। (অর্থ: যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।)	(5) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
(৬) মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। (অর্থ: জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।) [১, ২]	(6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

নামকরণঃ সূরা আন-নাস (আরবিঃ سورة الناس) নামকরণ করা হয়েছে "নাস" (الناس) শব্দটি থেকে, যার অর্থ "মানুষ"। এই সূরাটিতে মানুষের প্রতিপালক, শাসক ও উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য। এটি কোরআনের সর্বশেষ সূরা এবং মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা আন-নাস এর নামকরণ "নাস" শব্দটি থেকে এসেছে, যা আরবি ভাষায় "মানুষ" অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই সূরাটিতে মানুষের প্রতিপালক, মালিক ও উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য।

সূরা আন-নাস এর নামকরণ এর মূল কারণ হলো, এখানে বারবার "নাস" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি "মানুষ" বা "মানবজাতি" অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সূরা আন-নাস এর নামকরণঃ

- সূরাটির নামকরণ "নাস" শব্দটি থেকে হয়েছে, যার অর্থ "মানুষ"।
- এটি কোরআনের ১১৪তম ও সর্বশেষ সূরা।
- এই সূরায় ৬টি আয়াত রয়েছে।
- এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।
- সূরাটিতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শানে নুযুল

এই সুরার শানে নুযুল হলো- সূরা ফালাক ও সুরা নাস একসঙ্গে নাজিল হয়েছে। এই দুই সুরা নাজিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল হল, হুদাইবিয়ার ঘটনার পর লাবীদ ইবনে আসাম এবং তার কন্যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি কিছুটা কষ্ট অনুভব করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাদুকরের নাম এবং কোথায়, কিভাবে যাদু করা হয়েছে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। চিরুনী ও চুলের সাহায্যে যাদু করা হয়, যা যারওয়ান কূপের তলদেশে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এ সুরাটি নাজিল হওয়ার পর ফেরেশতাদের বিবরণ অনুযায়ী ওই কূপ থেকে তা তুলে আনা হয়। অতপর ওই সূরাটি পড়ে গিরা খুললে তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সূরাটি পড়লে অনিষ্ট ও যাদু থেকে হেফাজতে থাকা যায়।

সূরা আন-নাস (আরবি: سورة الناس) হলো মক্কায় অবতীর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, যাতে ৬টি আয়াত রয়েছে। এটি কোরআন শরীফের **১১৪**তম এবং সর্বশেষ সূরা। সূরাটিতে মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই সূরা এবং এর আগের সূরা আল-ফালাক একত্রে মুআউযাতাইন নামে পরিচিত, যা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটি সূরা হিসেবে পরিচিত।

সূরা আন-নাস এর প্রধান **বিষয়বস্তু হলো:** আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

কুমন্ত্রণার উৎস: এই সূরায় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। শয়তান জীন এবং মানুষের রূপেও এসে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: সূরাটিতে বারবার "রব্বিন নাস" (মানুষের প্রতিপালক), "মালিকিন নাস" (মানুষের রাজা), এবং "ইলা-হিন নাস" (মানুষের উপাস্য) শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি: সূরাটিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং আত্মিক সুরক্ষা কামনা করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয্‌যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে , ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরুনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন – যাদের বন্দেগী তোমরা করছো আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না , কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথ ও আলাদা – তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী , ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকরীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদু টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জিন মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকেরা মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের

ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ , আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় : " আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা । তারা মানুষকে আহার করিয়েছে , আমরা ও আহার করিয়েছি । তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে , আমরা ও দিয়েছি। তারা দান করেছে , আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান মর্যাদার দৌঁড়ে সামনে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি , আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে , তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছা , এখন কি এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি ? আল্লাহর কসম , আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না। " (ইবনে হিশাম , প্রথম খণ্ড , ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে : এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের , সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে , রাতের আঁধার থেকে যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দৃষ্কৃতি থেকে । আর এদেরকে বলে দাও , আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব , সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে । তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে , আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেন

وَ قَالَ مُوْسٰى اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾

“ আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। ” (আল মু'মিন (গাফির), ২৭)

ۚ وَاِنِّیۡ عُذۡتُ بِرَبِّیۡ وَرَبِّکُمۡ اَنۡ تَرۡجُمُوۡنِ

“ আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি। ” (আদ দুখান, ২০)

ফজিলত

হাদীস শরীফে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তা পড়ার গুরুত্ব এসেছে। এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস ও এই দুই সূরা পড়বে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (জামে তিরমিজি, হাদীস : ২৯০৩; সুনানে আবু দাউদ,হাদীস : ১৫২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৯২৬৬; সুনানে নাসাঈ ২/১৫৪; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৯১৭)

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন নিজের উভয় হাত এক সঙ্গে মিলাতেন। তারপর উভয় হাতে ফুঁক দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়তেন। তারপর দেহের যতটুকু অংশ সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন। -(সহি বুখারি ৫০১৭, সুনানে আবু দাউদ : ৫০৫৮, জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৪০২)

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ওপর কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে, যা আমি এর মতো অনুরূপ দেখিনি। কুল আয়ুজু বি রাব্বিল ফালাক ও কুল আয়ুজু বি রাব্বিন নাস। -(জামে তিরমিজি, হাদিস নং-২৯০২)

নির্দেশনা

১. আশ্রয় কামনা একমাত্র আল্লাহর নিকট করা, তিনি এ মহাবিশ্বের প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা।

২. আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কিছু কিছু সৃষ্টিতে অনিষ্ট রয়েছে। কিংবা সেগুলোকে অবলম্বন করে কুচক্রীমহল শত্রুপক্ষকে ক্ষতি সাধন করতে পারে। এ জন্য এজাতীয় ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৩. এ সূরায় অন্ধকার রাত ও জাদুকারিণীদের অনিষ্টের কথা ফুটে উঠলেও এ ছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যার মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করা হয়ে থাকে। সে সকল বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বস্তুত মানুষের ক্ষতি করা, কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা অনেক বড় পাপ। মানুষ মানুষের ক্ষতি করে থাকে প্রধানত তিনটি বিষয়ে- জানের ক্ষতি, ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং ইজ্জত-আব্রু, মান-সম্মানের ক্ষতি সাধন। এই তিন ধরনের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয়ের পদ্ধতি এ সূরায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । হাদীসে রাসূল বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।' অর্থাৎ তার মাধ্যমে কেউ কোনোরূপ ক্ষতি বা অনিষ্টের শিকার হয় না। (সহীহ বুখারী-১০, সহীহ মুসলিম-৪০)

৪. হিংসা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ। হিংসা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হিংসুকের হিংসা কেবল তাকেই পোড়ায় না বরং যাবতীয় পুণ্যকেও ভস্ম করে দেয়।

৫. শয়তান দৃশ্যমান নয়, মনুষ্য চোখে তাকে দেখা না গেলেও সে বিদ্যমান ও মানুষের শত্রু তা সত্য। সে মানুষকে বিপথগামী করার ক্ষমতা রাখে। এক হাদীসে এসেছে, 'নিশ্চয়ই শয়তান বলেছে, হে রব! আমি তোমার ইজ্জত-সম্মানের কসম করে বলছি, আমি তোমার বান্দাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরে রূহ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী করব। আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার ইজ্জত ও মহত্ত্বের শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ততক্ষণ

পর্যন্ত আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব।' (মুসনাদে আবী ইয়ালা-২/৪৫৮, হা. ১৩৬৯, মুসতাদরাকে হাকেম-৪/২৯০, হা. ৭৬৭২ সহীহ)

৬. শয়তানের অস্তিত্ব সত্য। সে মানুষকে আড়ালে থেকে ধোঁকা দেয়, মনে কুমন্ত্রণা দেয় । কতিপয় মানুষ এমন রয়েছে, যাদের মাঝে শয়তানী কূটচাল বিদ্যমান। তারা সরল-সত্য পথ থেকে বিচ্যুত । এরা মানুষরূপী শয়তান। তারাও মানুষদের কুমন্ত্রণা দেয় । জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

উল্লেখ্য যে, আপন আপন ভাষায় আল্লাহর কাছে শয়তান ও অনিষ্টকারী মানুষ এবং অনিষ্টকারী জীবজন্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া যায়। আউযুবিল্লাহ পড়ে অথবা রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত আশ্রয় প্রার্থনা করা সম্পর্কিত কোনো দোয়া পড়ে আশ্রয় চাওয়া যায়। এ ছাড়া সূরা ফালাক্ব ও নাস ইত্যাদি পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া যায়।

বইঃ ইকামাতে দ্বীন,

লেখকঃ মরহুম অধ্যাপক গোলাম আজম

প্রাথমিক কথাঃ

১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন' নামে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৮১ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" নামে লেখা পুস্তিকার দ্বিতীয় সিরিজ হিসেবে প্রকাশিত 'ইকামাতে দ্বীন'।

দ্বীনি দায়িত্ব পালনের দুটি দিক রয়েছে।

১. খিদমাতে দ্বীন,

২. ইক্বামাতে দ্বীন।

মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়াজ, তাবলীগ, ইসলামী সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের যে, বিরাট খেদমত হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করা

হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রকার খেদমতই অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সকলের খেদমত মিলেই ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে এবং এ খেদমতগুলোকে পরস্পর পরিপূরক মনে করা প্রত্যেক মুসলিম খাদেমে দ্বীনের কর্তব্য।

যারা নিজেদের দ্বীনি খেদমতকেই শুধু মূল্যবান মনে করে এবং অন্যদের খেদমতের কদর করে না, তাদের দ্বারা উম্ম াতের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে।

'ইকামাতে দ্বীন' পুস্তকটিতে খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে।

★ এ বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় ২ টিঃ

১. 'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যা,

২. "ইকামাতে দ্বীনের" মর্ম,

★ 'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যাঃ

১. দ্বীন শব্দের অর্থ ৪ টি।

২. দ্বীনের ব্যাপকতা,

৩. রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনই দ্বীন ইসলামের বাস্তব নমুনা

 # দ্বীন শব্দের অর্থ ৪ টি।

১. প্রথম অর্থ প্রতিদান বা বদলা, যেমন- مالك يوم الدين (সূরা ফাতেহা)

অর্থ: "প্রতিদান দিবসের মালিক।"

২. দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য, যেমন- "আল্লার প্রতি আনুগত্যকে নিরংকুশ (খাস) করে তার দাসত্ব কর। " -(সূরা আয যুমার: ২)

৩. তৃতীয় অর্থ আনুগত্যের বিধান বা পদ্ধতি, যেমন- "নিশ্চয় আল্লার নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) "-(সূরা আলে ইমরান: ১৯)

৪. চতুর্থ অর্থ আইন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা, যেমন- "ফিরাউন বললো, আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করবো। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলিয়ে দেবে অথবা (অন্ততপক্ষে) দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। "-(সূরা মুমিনঃ ২৬)

 # দ্বীনের ব্যাপকতাঃ

আল্লার আনুগত্যের যে বিধান হিসেবে দ্বীন ইসলামকে পাঠানো হয়েছে তা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। ব্যাক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যাতে মানুষ একমাত্র আল্লার সঠিক আনুগত্য করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক স্বয়ং ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন। সব দেশ, সব কাল ও সব জাতির উপযোগী জীবন বিধান রচনার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না।

 # রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনই দ্বীন ইসলামের বাস্তব নমুনাঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿۲۱﴾

- "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লার (সন্তুষ্টি) ও শেষ দিনের (মুক্তির) আকাংখা করে তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। "-(সূরা আল আহযাবঃ ২১)

- দ্বীন ইসলাম কতটা ব্যাপক তা শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাস্তব জীবন থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবেই সব কাজ করতেন।

- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শামিল।

- একদল "ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে" বিশ্বাসী আর অন্যদল "রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মে" বিশ্বাসী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনীত দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় দলই ভুল পথে আছেন।

★ "ইকামাতে দ্বীন"

১."ইকামাতে দ্বীনের" মর্ম,
২. ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি,
৩. হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?
৪. দ্বীনি খেদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন?
৫. ওলামায়ে কেরাম সবাই "ইকামাতে দ্বীনে" সক্রিয় নন কেন?
৬. উপমহাদেশের বড় বড় ওলামা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করেন নি কেন?
৭. জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব,
৮. জামায়াতের বৈশিষ্ট্য,
৯. বাংলাদেশে এ জাতীয় জামায়াত আছে কি?
১০. জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রঃ)
১১. জামায়াত বিরোধী ফতোয়া,
১২. মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিরোধী ফতোয়া
১৩. ওলামা ও মাশায়েখে কেরামের খেদমতে।

 # "ইকামাতে দ্বীনের" মর্মঃ

- ইকামাত শব্দের সহজ বোধ্য অর্থ হলো কায়েম করা, চালু করা, খাড়া করা, অস্তিত্বে আনা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।

- "ইকামাতে দ্বীন" এমন একটি পরিভাষা যার অর্থ বাংলায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়। "আল্লার দ্বীন কায়েম করা" বা "দ্বীন ইসলাম কায়েম করা" বললে এর সহজ তরজমা হতে পারে।

- “তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।”-(সূরা আল বাকারাঃ ২০৮)

 # বাংলাদেশে দ্বীনে হকের অবস্থাঃ

- দ্বীনে হক বাংলাদেশে ততটুকুই বেঁচে আছে যতটুকু দ্বীনে বতিল অনুমতি দিয়েছে।

- ইসলম এ দেশে ঐ পরিমাণেই টিকে আছে যেটুকুতে বাতিল বাধা দেয় না।

- ইসলাম পূর্ণাংগ একমাত্র জীবন বিধান। ইসলামকে যদি বিরাট একটি দালানের সংগে তুলনা করা হয় তাহলে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সে বিরাট বিল্ডিং এর ভিত্তি মাত্র।

- বাংলাদেশে ইসলামের গোটাবিল্ডিং এর তো কোন অস্তিত্বই নেই। শুধু ভিত্তিটুকুর অবস্থাই করুণ।

 # দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলের অবস্থা কী হয়?

- যেখানে দ্বীনে বাতিল কায়েম আছে সেখানে যেমন দ্বীনে হক বাতিলের অধীনে হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তেমনি দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিলকেই হকের অধীন হতে হয়।

- আল্লাহ পাক বাতিলকে খতম করার হুকুম দেননি। তিনি হককে বিজয়ী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

- দ্বীনে হক কায়েম হলে বাতিল ধর্ম খতম হয়ে যাবে না। যারা অন্য ধর্ম পালন করতে চায় তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না।

- মন্দির, গির্জা ইত্যাদির হেফাযত করতে হবে। কারণ ধর্মের উপর শক্তি প্রয়োগ কুরআনে নিষেধ।

★ ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বঃ

- আল্লাহ পাক এ দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

"তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন (সে দ্বীনকে) আর সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।" -সূরা আত তাওবা: ৩৩,

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। -
-সূরা ফাতহ: ২৮

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۹﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।- সূরা আস সফ: ৯

- রাসূলের দায়িত্ব পালনে পূর্ণভাবে শরীক হওয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবী। - ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমেরই।

- ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব (ফরিযায়ে ইকামাতে দ্বীন) প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

★ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করেছেন?

- ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা, এ রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা, এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করা, দেশের প্রচলিত আইনের বদলে কুরআনের আইন চালু করা, ইনসাফপূর্ণ বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা, আল্লাহর দেয়া রিযক থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না থাকে এমন অর্থনৈতিক বিধান জারী করা ইত্যাদি অগণিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজ তিনি করেছেন। এ কাজগুলো কি ইসলামী দায়িত্ব হিসেবেই তিনি করেননি?

- আল্লার রাসূলই হচ্ছেন দ্বীন ইসলামের আদর্শ। এসব কাজ যদি তিনি দ্বীনের দায়িত্ব হিসেবে নিজেই করে থকেন তাহলে এগুলোর গুরুত্বকে অবহেলা করলে দ্বীনদারীর ক্ষতি হবে কি না?

- বিস্ময়ের বিষয় যে, দ্বীনদারীর দোহাই দিয়েই দ্বীনের এসব দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়।

- বাতিলকে পরাজিত করে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দ্বীনি দায়িত্বই যে আসল কাজ এবং সে কাজের যোগ্য হবার জন্যই যে, নামায, রোযা, যিকর ইত্যাদির দরকার, যদি দ্বীনদার লোকেরাই সে কথা না বুঝে তাহলে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব কারা পালন করবে?

- "ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব অমুক বড় আলেম পালন করেননি বলে আমিও পালন করা দরকার মনে করিনি -এ খোঁড়া যুক্তি সেখানে কোন কাজে আসবে না।

★ ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতিঃ

দুনিয়ায় যে কোন আদর্শ কায়েমের এটাই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

এক: আদর্শ কায়েমের জন্য একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

দুই: যোগ্য নেতা ও কর্মী দল আসমান থেকে নাযিল হয় না। মানব সমাজ থেকেই এদেরকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়।

তিন: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে।

চারঃ আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরীর এ চিরন্তন পদ্ধতি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ।

পাঁচঃ ব্যক্তি গঠনের এ পর্যায় অতিক্রম করার পরই সমাজ গঠনের সুযোগ হতে পারে।

ছয়ঃ ইসলামের খেদমত ও ইসলামী আন্দোলনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

সাতঃ ইসলামী আন্দোলন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এবং ইসলাম কায়েমের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীদল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয় যুগ নাও আসতে পারে।

 # ইসলামী আন্দোলন ও ক্যাডার পদ্ধতিঃ

- যে কোন আদর্শ বাস্তবে কায়েম করতে হলে সে আদর্শে মন, মগয ও চরিত্র বিশিষ্টি নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরী করতেই হবে।
- আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন উপযুক্ত নেতা ও কর্মীদল তৈরী করার জন্য কোন না কোন ক্যাডার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।
- প্রথমে সমর্থক, ক্রমে কর্মী ও সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার একটা স্বভাবিক ক্রমিক পর্যায় প্রয়োজন। এ জাতীয় পদ্ধতিকেই ক্যাডার সিষ্টেম বলে।

★ হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?

- হক কায়েমের চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না।
- ইসলামের প্রথম কথাই বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নবীই এসছেন তাগুত বা বাতিল তাকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করে নিয়েছে।

★ দ্বীনি খেদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন?

- যে দেশে দ্বীনে হক কায়েম নেই সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলন চালালে কায়েমী স্বার্থ অবশ্যই বাধা দেবে।

- যদি কায়েমী স্বার্থ কোন ইসলামী খেদমতকে বিপজ্জনক মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ খেদমত যতই মূল্যবান হোক তা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন নয়।

- মাদরাসা, খানকা, তাবলীগ দুনিয়াময় দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষাকে পৌঁছানের মাধ্যমে খিদমাতে দ্বীনের মহান কাজ করে যাচ্ছেন।

- মাদ্রাসা,তাবলীগ,ও খানকাসহ অন্যান্য খেদমতে দ্বীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। কারণ, তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে বাতিলের উৎখাতের কোন কর্মসূচি নেই।

- একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের সংগেই এ সংঘর্ষ বাধে। সব নবীর জীবনেই একথা সত্য বলে দেখিয়ে গিয়েছে।

★ ওলামায়ে কেরাম সবাই “ইকামাতে দ্বীনে” সক্রিয় নন কেন?

- বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ ওলামায়ে কেরাম আছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার দ্বীনি খেদমতে নিযুক্ত রয়েছেন।

- ইকামাতে দ্বীনের দাবী অনুযায়ী তারা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় না হওয়ার পেছনে কারণ ৫ টি।

একঃ যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তারা প্রায় সবাই গরীবের সন্তান। ফলে উন্নত মানের আলেম কমই হচ্ছে।

দুইঃ মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা দুনিয়ার উন্নতির আশা কম বলে ধনী লোকেরা মাদ্রাসায় ছেলেদেরকে পাঠাতে চায় না।

তিনঃ যারা মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য হয় তারা শুধু আখেরাতের আশাই করে।

চারঃ মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শুধু ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবেই ইসলামকে শেখান হয়।

পাঁচঃ সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানা সম্পর্কে সঠিক ধরনার অভাব।

 # দ্বীনের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল ঃ

- আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উসওয়াতুন হাসানা বা দ্বীনের মাপকাঠি বানিয়েছেন।

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মানার উদ্দেশ্যেই আমরা সাহাবায়ে কেরামকে মানি।

- ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুন রাসূল যেমন নির্ভূল তেমন আরকেউ হতে পারে না। এজন্যই রাসূলকে যেমন অন্ধভাবে মানতে হয় তেমন আর কাউকে মানা চলে না।

 # উপমহাদেশের বড় বড় ওলামা
ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করেন নি কেন?

- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আলেমগনের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

- **১৮৩১** সালে বালাকোটে পরাজয়ের পর থেকে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশে ওলামায়ে হিন্দের নিকট ইংরেজ থেকে আজাদী হাসিলই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

- আর মুসলিমলীগ পন্থি ওলামাদের নিকট দেশ ভাগ করে স্বাধীন মুসলীম দেশ কায়েমই আসল লক্ষ্য ছিল।

- এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের নেতৃত্ব দেয়ার মতো পজিশন তাদের ছিল না।

- ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত করার আন্দোলন করাই যে দ্বীনের দাবী তা উপলব্ধির অভাব।

★ জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্বঃ

- ইকামাতে দ্বীনের কাজ কারো পক্ষে একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

- এমন কি শত যোগ্যতা সত্বেও কোন নবীও একা দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন নি। অবশ্য প্রথমে নবীকে একা শুরু করতে হয়েছে।

- সফরের সময় দু'জন এক সাথে সফর করলেও একজনকে আমীর মেনে জামায়াতের শৃঙ্খলা মতো চলার জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

- জমায়াত ছাড়া ইসলামী জিন্দেগী সম্ভব নয় এবং আমীর ছাড়াও জাময়াত হতে পারে না।

★ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের বৈশিষ্ট্যঃ

- প্রত্যেক সংগঠন,জামায়াত বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। স্বাভাবিকভাবে ঐ উদ্দেশ্যেই সেখানে লোক তৈরী করার পরিকল্পনা থাকে।

- ইকামাতে দ্বীনের জন্য গঠিত জামায়াতের কয়েকটি বৈশিষ্ট রয়েছেঃ

১. ইসলাম যতটা ব্যাপক এ জামায়াতের দাওয়াত ততটা ব্যাপক হবে।
২. এ জামায়াত ইসলামের পূর্নাংগ শিক্ষাকে মানব সমাজের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করবে।
৩. পূর্ন দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে মানুষকে এ সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা করবে।
৪. যত প্রকার তারবিয়াত বা ট্রেনং সম্ভব তার মাধ্যমে যোগ্য কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করবে।
৫. বাতিল নেজাম বা দ্বীনে বাতিল এ জাতীয় জামায়াতকে তাদের জন্য বিপদ জনক মনে করে তার অগ্রগতি রোধ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে।
৬. বাতিল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের এ বিরোধিতা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়।
৭. এ জাতীয় সংগঠনের কেউ নেতা হবার চেষ্টা করে না। এবং নেতার যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে নেতৃত্ব গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৮. ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের নিকট ইসলামী আদর্শই আসল আকর্ষন। মানুষকে এ আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করাই এর বৈশিষ্ট্য।

★বাংলাদেশে এ জাতীয় জামায়াত আছে কি?

- পূর্নাঙ্গ জামায়াত না পাওয়ার অজুহাতে ইকামাতে দ্বীনের কাজ না করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।
- আল্লাহপাক আমাকে যতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন তাতে ইকামাতের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত কোন জামায়াত আমি পাইনি।
- আল্লাহর দ্বীনকে এ দেশে কায়েম করার জন্য যদি জামায়াতে ইসলমীর চেয়ে আরও উন্নত কোন সংগঠন আমি পাই এ জামায়াত ছেড়ে ঐ সংগঠনে যোগ দান করা ফরয মনে করবো।

 # জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রঃ)

- বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে মরহুমের সম্পর্কঃ

১. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী (রঃ) আজীবন একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, আল্লার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে মানা উচিত নয়।

২. এ জামায়াতে আহালে সুন্নাহ আল জামায়াতের যে কোন মাযহাবের লোক শামিল হতে পারে।

৩. জামায়াতের সবারই ইসলাম সম্পর্কে অতীত ও বর্তমান সকল লেখকের বই থেকে স্বাধীন ভাবে মতামত গ্রহন করার পূর্ন স্বাধীনতা রয়েছে। মাওলানা মওদুদী (রঃ) চিন্তার স্বাধীনতার উপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তাকে অন্ধভাবে অনুসরনের কোন আশংকা নেই।

৪. জামায়াতে ইসলামী মওলানা মওদূদী (রঃ)-কে ফেকাহ বা আকায়েদের ইমাম মনে করে না।

৫. আরব দুনিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরাম মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

 # জামায়াত বিরোধী ফতোয়া

- জাময়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন ও প্রচার করেন জামায়াত তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করে না।

- জামায়াত তাদের দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না।

- দেশে দ্বীনে হক ও দ্বীনে বাতিলের যে সংঘর্ষ চলছে তাতে অবশ্য ঐসব ফতোয়া বাতিলের পক্ষে লাগাচ্ছে।

- তবুও জামায়াত তাদেরকে বিরোধী শক্তি বলে মনে করে না। তাদের সাথে জামায়াতের কোন লড়াই নেই।

- জামায়াতে ইসলামীকে সংশোধন করার নিয়তে আলেমগণ যে কোন ধরনের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে জামায়াত তাদের এ মহান খেদমতের জন্য শুকরিয়া জানাবে।

 # মাওলানা মওদূদী (রঃ) বিরোধী ফতোয়া

- মাওলানা মওদূদী (রঃ) ছোট বড় শতাধিক বই লিখেছেন।

- যিনি এতকিছু লিখেছেন তার লেখায় কোন ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। - কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তার বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্বৃতি নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, লেখকের মূল বক্তব্যের সাথে সমালোচনার কোন মিল নেই।

- যারা জ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত তারা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তার লেখার সমালোচনা করলে দ্বীনের অবশ্যই উপকার ও খেদমত হবে।

- দুনিয়ার বড় বড় ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-কে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ট আলেম ও ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেন।

★ওলামা ও মাশায়েখে কেরামের খেদমতেঃ

- ওলামায়ে কেরামে ও মাশায়েখে এযাম হলেন নবীর ওয়ারিস।

- অগণিত আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামের ইলম ও আমল সম্বন্ধে শিক্ষা পেতে হলে ওলামা ও মাশায়েখের সাহায্য ছড়া উপায় নেই।

- সকল হাক্কানী ওলামা ও মাশায়েখের খেদমতে আরজ মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর "তাফহীমুল কুরআন" "রাসায়েল ও মাসায়েল" নামক পুস্তকগুলো পড়ে দেখুন।

- শুধু অন্যের মন্তব্য শুনেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজে দেখে ফয়সালা করুন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

আল-বাকারা: ২৬১, আল-ইমরান: ৯২, আল-হাদীদ: ১১ দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫৯

১টি হাদীস মুখস্ত, দেখুন পৃষ্ঠা -৩৫৯ ৩৬০

মাসয়ালাঃ ত্বহারাত সংক্রান্ত। দেখুন পৃষ্ঠা -২৬৬

অনুশীলনী -১৭(সেপ্টেম্বর-২য় সপ্তাহঃ)

বিষয় : মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় আমাদের তৎপরতা

- প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম

দারস তৈরী -সূরা মুদ্দাসির(১-৭নংআয়াত),

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(1) قُمْ فَأَنْذِرْ(2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)

১. হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি ২. উঠুন এবং সতর্ক করুন ৩. এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব ঘোষণা করুন ৪. আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন ৫. প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন ৬. অধিক প্রাপ্তির আশায় কারো প্রতি অনুগ্রহ করবেন না ৭. এবং আপনার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করুন। (সূরা আল-মুদ্দাসি্‌স্‌সর ১-৭)

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের আল-মুদ্দাস্সির (এ) শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল-মুদ্দাসির (এ) অর্থ বস্তু বা কম্বল আচ্ছাদনকারী। এখানে আল-মুদ্দাস্সির (প্রে) শব্দ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে।
নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরা আল-মুদ্দাসসির দুটি অংশে নাযিল হয়। প্রথম অংশে সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়। এটি

✦ নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল-মুদ্দাস্সির' (الْمُدَّثِّرُ) শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আল-মুদ্দাস্সির' (الْمُدَّثِّرُ) অর্থ বস্ত্র বা কম্বল আচ্ছাদনকারী। এখানে 'আল-মুদ্দাস্সির' (الْمُدَّثِّرُ) শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে।

✦ নাযিল হওয়ার সময়কাল

সূরা আল-মুদ্দাসসির দু'টি অংশে নাযিল হয়। প্রথম অংশে সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়। এটি সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরাহ আলাকের পর নাযিল হয়। অর্থাৎ সম্ভবত এ আয়াতগুলো ৬১০ খ্রি. শাওয়াল মাসে নাযিল হয়।
দ্বিতীয় অংশে অষ্টম আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। এটি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজের মওসুম সমাগত হলে নাযিল হয়।

✦ সূরার বিষয়বস্তু

- সূরার প্রথম সাতটি আয়াতে নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্মনীতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহান রবের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বা তাওহিদের প্রতি আহ্বান এবং আহ্বানের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শারীরিক ও আত্মিক প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- ৮-৫৩ আয়াতে সত্য দ্বীন অমান্যকারীদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কিয়ামতের দিবসে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্মপর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ৫৪-৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশ। কিন্তু এ উপদেশ কবুল করার জন্য আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না। যে গ্রহণ করবে সে-ই উপকৃত হবে; আর যে গ্রহণ করবে না সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

✦ নির্বাচিত আয়াতসমূহের আলোচ্য বিষয়

সূরাহ আল-মুদ্দাসি্‌সরের প্রথম সাতটি আয়াতে নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্মনীতি সংক্রান্ত ছয়টি নির্দেশনা প্রদান হয়েছে।

প্রথম নির্দেশ : قُمْ فَأَنْذِر অর্থাৎ উঠুন এবং বিশ্ববাসীকে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন।

দ্বিতীয় নির্দেশ : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ মহান রবের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করুন ও প্রতিষ্ঠা করুন।

তৃতীয় নির্দেশ : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ পোশাক, দেহ, অন্তর ও মনকে পবিত্র করুন।

চতুর্থ নির্দেশ : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অর্থাৎ প্রতিমা পূজা ও যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকুন।

পঞ্চম নির্দেশ : وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ পার্থিব প্রতিদানের আশায় কাউকে দান ও অনুগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।

ষষ্ঠ নির্দেশ : وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করুন।

নির্বাচিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাঃ

- ❖ **প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা:** يا أَيُّها المدثر ওহে বস্ত্র আচ্ছাদিত ব্যক্তি।"

আরবীতে কাউকে ডাকার জন্য 'হরফে নিদা)ا) حرف (ব্যবহার করা হয়। এখানে 'ইয়া আইয়ুহা') 'হরফে নিদা। আর যাকে ডাকা হয় বা সম্বোধন করা হয় সেটি মুনাদা। এ আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল-মুদ্দাস্সির (খ) তথা 'ওহে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটি প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন। মহান আল্লাহ অন্য সকল নবীকে আহ্বান করার সময় নাম ধরেই সম্বোধন করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কখনও ইয়া মুহাম্মাদ' বলেননি, বরং তাঁকে অতি আদর করে সম্বোধন করেছেন। এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশেষ সম্মান।

সূরাহ আলাক্ব নাযিলের পর কিছুকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অহি নাযিল বন্ধ থাকে। এ সময়কে ফাতরাতুল অহি' বলে। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। অহি নাযিলের বিরতির শেষভাগে একদিন রাসূল সা পবিত্র মক্কায় পথ চলাকালে ওপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি ওপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে ফেরেশতা জিবরিল (আ:) আকাশে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে তিনি ভীত-আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে বললেন

رمى زملونى আমাকে চাদরাবৃত কর আমাকে চাদরাবৃত কর। অতঃপর তিনি চাদরাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেমতাবস্থায় রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে ডেকে বলা হচ্ছে হে আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম । আপনি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছেন কেন? আপনার ওপরে তো একটি বিরাট মহৎ কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে। অতঃপর তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ছয়টি কাজের নির্দেশ দেয়া হয়। (ইবনে জারির)

❖ **দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা : قُمْ فَأَنْذِر** "উঠুন অতঃপর সতর্ক করুন।"

এখানে 'কুম' (قُمْ) এবং 'আনযির' (أَنْذِر) দু'টি শব্দে একটি আয়াত। দু'টি শব্দই 'আমর' বা আদেশ সূচক। 'কুম' (قُمْ) অর্থ উঠুন, দন্ডায়মান হোন, কর্মে তৎপর হোন ইত্যাদি। আর 'আনযির' (أَنْذِر) অর্থ সতর্ক করুন, ভয় দেখান ইত্যাদি।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন, হে কম্বলজড়ানো ব্যক্তি! আপনার কম্বল জড়িয়ে শয্যা গ্রহণের অবকাশ কোথায়। আপনার প্রতি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার এক বিরাট দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, আপনি উঠুন। আমার একত্ববাদ প্রচার করুন এবং যারা আমার সত্তায়, গুণে ও ক্ষমতায় আমার সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরিক করে তাদেরকে এটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এ নির্দেশ এমন এক সময় ও পরিবেশে অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কাসহ সমগ্র আরবের লোক ও জনপদগুলো শিরকে নিমজ্জিত ছিল আর তিনি ছিলেন একাকী। তাঁর সঙ্গী-সাথী কেউই ছিল না। এহেন পরিবেশে সর্বজন বিরোধী একটি মতাদর্শ নিয়ে দন্ডায়মান হওয়া এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা কত বড় বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার ছিল তা একটু চিন্তা করলেই বোধগম্য হয়। এহেন পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহ বললেন, আপনি তৌহিদের পতাকা নিয়ে দন্ডায়মান হোন এবং মানুষকে তৌহিদের পরিপন্থী আকিদা-বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম সম্মপর্কে সতর্ক করতে থাকুন। এটাই আপনার প্রথম কাজ। এ যেন মহা স্রোতের বিপরীতে চলার এক কঠিন নির্দেশ।
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম 'নাযির' তথা সতর্ককারীর দায়িত্বসহ প্রেরণের কথা বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

"হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।" (সূরা আহযাব : ৪৫)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.

"আমি তোমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।" (সূরা ফাতির : ২৪)

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ.

"আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তার কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী।" (সূরা নূহ : ১-২)

- **তৃতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ** "আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।"

সূরাহ আল-মুদ্দাসসিরে দ্বিতীয় নির্দেশনায় মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী! মানুষ আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও অসীমত্বের কথা ভুলে আমার জমিনে শয়তানের কথামত রাজত্ব পরিচালনা করছে। আমার জমিনে এখন বাতিলের রাজত্ব চলছে। লাত, মানতের পূজা-অর্চনা করা হচ্ছে। অথচ জমিনের মালিক হলাম আমি আল্লাহ। আমার জমিনে শয়তানের রাজত্ব চলতে পারে না। মানবরচিত মতবাদ চলতে পারে না। আপনি উঠুন এবং আল্লাহর তাকবির ঘোষণা করুন। 'ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির' (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) অর্থাৎ সব জায়গায় 'আল্লাহু আকবার' (الله اكبر) ধ্বনিত হবে। জগতের সর্বত্রই থাকবে আমার শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ। মানুষের আকিদা-বিশ্বাস হতে শুরু করে তাদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি স্তরে থাকবে আমারই শ্রেষ্ঠত্বের ফলিতরূপ। একজন মু'মিন 'আল্লাহু আকবার' (الله اكبر)-এর তাকবির বা স্লোগান ছাড়া কোনো মানুষের তাকবির বা স্লোগান দিতে পারে না। এটি কুফরি স্লোগান। আল্লাহ বলেন, জমিনের মালিক আমি আল্লাহ। এ জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু

আছে সবই আমার হুকুমে তৈরি হয়েছে। সুতরাং এ জমিনে আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর। এ সম্পর্কে সূরাহ আরাফের ৫৪তম আয়াতে বলা হয়েছে,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“সাবধান! সৃষ্টি যার, আইন চলবে একমাত্র তার। বরকতময় আল্লাহই বিশ্ব জগতের মালিক।”

পৃথিবীতে যতজন নবী ও রাসূল আগমন করেছেন, এটিই ছিলো তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। এ ব্যাপারে সূরাহ আন-নাহলের ৩৬তম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

“প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, “আল্লাহর বন্দেগি করো এবং তাগুতের বন্দেগি পরিহার করো।”

সকল নবীরই প্রধান কাজ ছিলো মহান রবের একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা। সূরা আরাফের ৫৯, ৬৫, ৭৩ ও ৮৫তম আয়াতে হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, শুয়াইব (আ) এর দাওয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.

“হে আমার দেশবাসী! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।”

তাই একজন নবীর প্রথম কাজই হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্বজাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই।

ইসলামে ‘আল্লাহু আকবার’ (الله اكبر) তথা ‘আল্লাহই শ্রেষ্ঠ’ কথাটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ‘আল্লাহু আকবার’ ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। ‘আল্লাহু আকবার’ এ কথাটি বলে মানুষ সালাত শুরু করে এবং বারবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে ওঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে জবাই

করে। জন্মের সময় শিশুর কানে দেয়া হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি আবার মৃত্যুর পর সালাতু জানাজার মাধ্যমেও দেয়া হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। তাকবির ধ্বনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই রিসালাতের কাজ শুরু করেছিলেন। অতএব একজন মুমিনের 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া অন্য কোনো স্লোগান হতে পারে না।

- ❖ **চতুর্থ আয়াতের ব্যাখ্যা :** وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।"

এ আয়াতে 'সিয়াব' (ثِيَابْ) ও 'তাহির' (طَهِّرْ) দু'টি শব্দ রয়েছে। 'সিয়াব' (ثِيَابْ) শব্দটি 'সাওবুন' (ثَوْبً) এর বহুবচন। একে 'লিবাস' (لباس)ও বলা হয়। এর আসল অর্থ কাপড় বা পোশাক। এর রূপক অর্থ অন্তর, মন, দেহ, কর্ম ইত্যাদি।
অতএব, এ আয়াতে নবীকে সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, হে নবী! আপনি স্বীয় পোশাক ও দেহকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন, পোশাকের নৈতিক দোষত্রুটি হতে মুক্ত রাখুন। অর্থাৎ পোশাকে অহংকার, গৌরব, রিয়া বা লৌকিকতা থেকে মুক্ত রাখুন। অনুরূপভাবে অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং অসৎচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন।

ইসলাম মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে শিক্ষা দেয়। হাদিসে পবিত্রতাকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। তাই মুমিনগণকে সর্বাবস্থায় দেহ, স্থান ও পোশাক বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা., ইবরাহিম নাখয়ী, শা'বী, আতা, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সায়ীদ ইবন যুবাইর, হাসান বসরী (রহ.) ও অন্যান্য বড় বড় মুফাসসির এ আয়াতের তাৎপর্যে বলেছেন, আপনার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখুন ও সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে নিজেকে মুক্ত রাখুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অজ্ঞ ছিল। এসব লোককে সব রকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জীবনের সকল পবিত্রতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগতভাবেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তাই তিনি যেন সচেতনতার সাথে পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখেন তারই শিক্ষা রয়েছে এই আয়াতে। নৈতিক দিক দিয়ে পোশাক পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে- পোশাক এমন হতে হবে যাতে অহংকার প্রকাশ পাবে না, তাতে কুরুচির ছাপও থাকবে না।

মহান আল্লাহ পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "অবশ্যই মহান আল্লাহ অধিক হারে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২২)

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন।" (তিরমিজি)

অনুরূপভাবে সূরাহ মায়িদার ষষ্ঠ আয়াতে সালাতের পূর্বে পবিত্রতা তথা অজুর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, এই আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে-

১. পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

২. পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষত্রুটি থেকে পবিত্র রাখা।

৩. সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে নিজ চরিত্রকে পবিত্র রাখা।

অতএব দায়ী হিসেবে আমাদের সকলকে পবিত্রতার ক্ষেত্রে এ তিনটি দিকেই সতর্ক থাকতে হবে।

❖ **পঞ্চম আয়াতের ব্যাখ্যা : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** “প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন।”

অত্র আয়াতে ‘আর-রুজ্যুন’ (الرُّجْزَ) থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

‘আর-রুজ্যুন’ (الرُّجْزَ) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ।

- প্রসিদ্ধ তাবিঈ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদাহ, যুহরী, ইবন যায়েদ, আবূ সালামা (রহ.) প্রমুখ বলেছেন, ‘আর-রুজ্যুন’ (الرُّجْزَ) অর্থ মূর্তি। অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন করো, এগুলোর কাছেও যেয়ো না।
- ইবন আব্বাস রা. বলেছেন, এর অর্থ হলো পাপাচার।
- আবু আলিয়া এবং রবী (রহ.) বলেছেন, এর অর্থ অপবিত্রতা এবং গুনাহ।
- ইমাম যাহহাক বলেছেন, এর অর্থ শিরক।
- কালবী বলেছেন, এর অর্থ আজাব।
- আল্লামা সাবুনি বলেছেন, এর দ্বারা সর্বপ্রকার খারাপ জিনিস উদ্দেশ্য হতে পারে।

অতএব আয়াতের অর্থ হলো, হে নবী! আপনি প্রতিমা পূজা এবং যাবতীয় গুনাহ ও অপবিত্রতা পরিত্যাগ করুন।

এখানে অপবিত্রতা বলতে, আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ওঠা-বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা, আচার- ব্যবহার, ও দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সামান্যতমও যেন অনুপ্রবেশ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্র থেকে মুক্ত রাখুন।

এ বিষয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তো আগে থেকেই প্রতিমা পূজা ও যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন, তার ধারে কাছেও ছিলেন না। তাহলে তাঁকে এ আদেশ দেয়ার অর্থ কী? এর উত্তরে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশের মাধ্যমে উম্ম তে মুহাম্মাদীকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য।

❖ **ষষ্ঠ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ** وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "অধিক প্রতিদানের আশায় কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না।"

এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে কয়েকটি মেসেজ দেয়া হয়েছে।

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া পার্থিব বিনিময়ের আশায় সকল প্রকার দান-খয়রাত এবং মানব কল্যাণমূলক কাজ করতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কোনো কাজ যদিও ভালো মনে হয়, আর সে কাজের মধ্যে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকে, তবে সে কাজ আল্লাহর কাছে ভালো বলে গণ্য হবে না।

২. আমরা যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করছি, এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর একটি বড় হুকুম পালন করছি। তবে এ কাজটি যদি ব্যক্তিস্বার্থের জন্য হয় বা নিজের কোনো উপকার হাসিলের জন্য হয়, তাহলে এ আন্দোলন করার মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যাবে না।

৩. আমরা যারা সার্বক্ষণিকভাবে দ্বীনের পথে বা দ্বীনি আন্দোলনের পথে কাজ করছি তাদের এ কথা ভাবার বা মনে করার সুযোগ নেই যে, আমি দ্বীনের অনেক উপকার করলাম। বরং মনে রাখতে হবে যে, কোনো নেক কাজ কিংবা দ্বীনের কাজ করে আল্লাহর কোনো উপকার হয় না, যা উপকার বা কল্যাণ হয় তা নিজেরই উপকার বা কল্যাণ হয়। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের ধারণা আরো পরিষ্কার হবে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

১."বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।" (সূরা আনআম : ১৬২)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

২."আমি একমুখী হয়ে স্বীয় লক্ষ্য ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেকদের মধ্যে শামিল নই।" (সূরা আনআম, ৬ : ৭৯)

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17)

৩. "তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।"

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

৪"(নূহ, হুদ, সালেহ, লূত, শুআইব (আ) জাতির উদ্দেশ্যে বলেন) এ কাজে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব তো রাব্বুল আলামিনের।" (শুআ'রা : ১০৯; ১২৭; ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: a إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও 'আমলসমূহের দিকে। (সহীহ মুসলিম; সুনানু ইবন মাজাহ)

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

৬. নুমান ইবন বাশীর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জেনে রাখ, নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে- তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রাখো ঐ গোশতের টুকরাটি হলো মানুষের কলব বা আত্মা। (সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম)

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

৭. আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে। (জামি তিরমিজি; সহীহ মুসলিম)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

৮.আবু উমামা আল-বাহলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। (সুনানু আবি দাউদ)

- **সপ্তম আয়াতের ব্যাখ্যা :** وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।"

অত্র আয়াতে সবর সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সবর বা ধৈর্য তিন প্রকার।

১. 'আস-সাবরু আলাল মা'আসী' তথা অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ধৈর্য।

২. 'আস-সাবরু আলাত ত্বাওয়া' তথা আনুগত্যে ওপর ধৈর্য।

৩. 'আস-সাবরু আলাল মাসিবাহ' তথা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ। অতএব সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক।

এ আয়াতটি নবুয়তের একেবারে প্রথম দিকের আয়াত এবং মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো ময়দানে নামেননি। তাই তিনি এই ঘোষণা নিয়ে ময়দানে নামলে তার সাথে কী কী নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারে

সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্ম াদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আগেই সবরের শিক্ষা দিয়েছেন।

এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ-মুসিবতই আসুক না কেন প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং অত্যন্ত অটল ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলেই খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে বিরোধ হবেই। এ জন্যই সকল নবী বা রাসূলের সাথে সমসাময়িক শাসকদের বিরোধ হয়েছে। আজও যারা **বলে আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই**। তাদের ওপরও জুলুম নির্যাতন চলে। অতএব এ বাধা, নির্যানত ছিল, আছে এবং থাকবে। এ অবস্থায় ধৈর্যের সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম অহি প্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে খাদিজা রা.-কে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি তাঁকে ওয়ারাকা ইবন নওফিলের কাছে নিয়ে গেলে ওয়ারাকা সব কথা শুনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছিলেন, ইনি সে দূত (النَّامُوسُ) যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁরা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রা. ইন্তেকাল করেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদিসে সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস অধ্যয়ন করতে পারি। (যেমন- সূরা আল-বাকারাহ : ১৫৩; আলে ইমরান : ২০০; আনফাল : ৪৬; সোয়াদ : ১৭; কাফ : ৩৯)

আয়াত সমূহের শিক্ষা

১. আল্লাহর দ্বীনি দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি কিংবা মনের কষ্টের কারণে ঘরে শুয়ে বসে থাকা যাবে না।
২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুকরণে আমাদেরকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা দিতে হবে এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
৩. আয়াতে পবিত্রতার শিক্ষা আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুমিন ও দায়ী হিসেবে বাহ্যিক পবিত্রতার পাশাপাশি সকল প্রকার শিরক, কুফর, ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে অন্তর ও চরিত্রকে পবিত্র রাখতে হবে।
৪. আল্লাহর একত্ববাদ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। বৈষয়িক কোন উদ্দেশ্য এখানে থাকবে না।
৫. পার্থিব বিনিময় পাওয়ার আশায় অন্যকে দান করা যাবে না। কারো কোনো উপকার করলে তার বিনিময়ের আশা করা যাবে না। হাদিয়া বা উপঢৌকন বিনিময় পাওয়ার আশায় দেয়া যাবে না। এমনকি আল্লাহর কোনো বন্দেগি বা নেক কাজ করে কিংবা দ্বীনের কাজ করে মনে করা যাবে না যে আল্লাহর মহা উপকার করলাম। কেননা কোনো নেক কাজ কিংবা দ্বীনের কাজ করে আল্লাহর কোনো উপকার হয় না যা উপকার বা কল্যাণ হয় তা নিজেরই উপকার যা কল্যাণ হয় মনে করতে হবে।
৬. এ কাজ করতে গিয়ে বাতিলের আক্রোমণ ও বাধার সম্মুখীন হলে চুপ থাকা যাবে না বরং দুঢ়পদে আরবের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সবার অবলম্বনের মাধ্যমে চালিয়ে যেতে হবে।
পরিশেষে আমরা সবাই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সকল প্রকার বাহ্যিক ও আত্মিক পাপাচার ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে টিকে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

https://www.armansdiary.com/2024/01/Al-Muddassir-darsul-Quran.html

বইঃ রাসূলুল্লাহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপ্লবী জীবন,
নোট করার মত কিছু নাই, পুরো বই ই পড়তে হবে

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত

আল বাকারা: ২১৪

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ وَ لَمَّا یَاۡتِکُمۡ مَّثَلُ الَّذِیۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِکُمۡ ؕ مَسَّتۡہُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰی یَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَہٗ مَتٰی نَصۡرُ اللّٰہِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰہِ قَرِیۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?’ জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

আনকাবুত: ১-৩

الٓمّٓ ﴿۱﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ یُّتۡرَکُوۡۤا اَنۡ یَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ ہُمۡ لَا یُفۡتَنُوۡنَ ﴿۲﴾ وَ لَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡ فَلَیَعۡلَمَنَّ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَیَعۡلَمَنَّ الۡکٰذِبِیۡنَ ﴿۳﴾

১. আলিফ-লাম-মীম; (২) মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? (৩) আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।

১টি হাদীস মুখস্ত,

وقال :" إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤناً نكبة من شوكة فما فوق ذلك، إلا حُطت بها عنه خطيئة، ورفع بها درجة".

তিনি আরও বলেন; "নিশ্চয়ই নেককারদের উপর কঠিন বিপদ দেওয়া হয়। আর মুমিন বান্দার উপর কাঁটা বা তার চেয়ে নগণ্য পিরমাণ মত বিপদ আসে, তার প্রতিটির জন্য তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।" (তাবারানি, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৬১০)

ِ وقال :"إن عظم الجزاء مع عظم البلأ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط

তিনি আরও বলেন; নিশ্চয়ই বড় প্রতিদান বড় পরীক্ষার সাথেই। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। অতঃপর যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিজি, ইবনে মাযাহ, সিলসিলাতুস সাহিহা ১৪৬)

মাসয়ালাঃ হাজ্ব ও নামাজ সংক্রান্ত

নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও নামাজ ভঙ্গের কারনসমুহ

নামাজের ফরজসমূহ (আরকান ও আহকাম)ঃ

আহকাম ও আরকান মিলিয়ে নামাজের ফরজ মোট ১৩টি। নামাজ শুরু হওয়ার আগে বাইরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আহকাম বলা হয়।

❖ **নামাজের আহকাম ৭টি**। যথাঃ

১. শরীর পাক হওসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্ম ুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

২. কাপড় পাক হওসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরনের জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৪)

৩. নামাজের জায়গা পাক হওসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ নামাজির দু'পা, দু'হাঁটু,দু'হাত ও সিজদার স্থান পাক হওয়া।

৪. সতর বা শরীর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু'হাতের কব্জি,পদদ্বয় এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ অর্থঃ হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর। (সূরা আরাফঃ৩১)

৫. কিবলামুখী হওসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। (সূরা বাকারাঃ ১৫০)

৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সময়মতো আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

নিশ্চয় সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (সূরা নিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০৩)

৭. নামাজের নিয়্যাত করাঃ নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়্যাত করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ إنما الأعمال بالنية নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারী,হাদিস-১)

নামাজ শুরু করার পর নামাজের ভেতরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আরকান বলা হয়।

নামাজের আরকান ৬টি। যথাঃ
১. তাকবিরে-তাহরিমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْআর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৩)
২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ মানে কিয়াম করা। আল্লাহ বলেনঃ

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৮)
ক্বেরাত পড়াঃ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকাত এবং ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরজ। আল্লাহ বলেনঃ

فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। (সূরা মুযাম্মিল,আয়াতঃ ২০)
৪. রুকু করাঃ প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

অর্থঃআর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারাঃ৪৩)

৫. সিজদা করাঃ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফরজ।আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ’ কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ৭৭)

৬.শেষ বৈঠক করাঃ নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُك

অর্থঃ “অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।

সূত্রঃ বুক অব ইসলামিক নলেজ, লেখকঃ ইকবাল কবীর মোহন

নামাযের ওয়াজিবসমূহঃ

ওয়াজিব অর্থ হলো আবাশ্যক। নামাযের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। যা ভুলক্রমে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। নিচে ওয়াজিবসমূহ উপস্থাপন করা হলো । রুকন এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান, যা আবাশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক(বাদ) করলে নামায বাতিল হয়ে যায় এবং ভূলক্রমে তরক করলে ‘সিজদায়ে সাহু’ দিতে হয়।

নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪টি। যথাঃ

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ ফরয নামাযের প্রথম দু’ রাক‘আতে এবং সকল প্রকার নামাযের প্রত্যেক রাকা‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয, ওয়াজিব,

সুন্নাত ও নফল সব ধরণের নামাযের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহ আলাই)এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর দলিল-

لاً صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَا تِحَةِ الْكِتاَبِ

" যে নামাযে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" (বুখারী)

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোঃ ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক।

৩. তারতীব মত নামায আদায় করাঃ তারতীব অনুযায়ী নামায অর্থাৎ নামাযে যে সকল কাজ বারবার আসে ঐ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। যেমন রুকু, ও সিজদা যা নামাযের প্রতি রাক'আতে বারবার আসে। কিরা'আত পাঠ শেষ করে রুকু' এবং রুকু শেষ করে উঠে সিজদা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায নষ্ট হবে এবং নতুন করে নামায আদায় করতে হবে।

৪. প্রথম বৈঠকঃ চার রাকা'আত ও তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু রাকা'আত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব।

৫. আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করাঃ নামাযের উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব। আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আত্তাহিয়্যাতু পড়। সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিই প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

৬. প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করাঃ যে সকল নামাযে প্রকাশ্য বা উচ্চঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ' দু'ঈদের নামায ও তারাবীর নামায। অবশ্য একাকী আদায় করলে কিরা'আত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক নয়।

৭. চুপিসারে কিরা'আত পাঠ করাঃ যেমন নামাযে চুপে চুপে কিরা'আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেসব নামাযে নীরবে বা চুপে চুপে কিরা'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- যোহর ও আসরের নামায।

৮. তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করাঃ নামাযের সব কাজ ধীরে-সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু' ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা ওয়াজিব।

৯. রুকু'থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোঃ অর্থাৎ রুকু' শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১০. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।

১১. সালাম বলাঃ নামায শেষে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে নামায শেষ করা। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর মতে এটি ফরজ।

১২. তারতীব ঠিক রাখাঃ প্রত্যেক রাকা'আতের তারতীব বা ধারাবাহীকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

১৩. দু'আ কুনুত পাঠ করাঃ বেতরের নামাযে দু'আ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।

১৪. ঈদের নামাযে তাকবীরঃ দুই ঈদের নামযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

সূত্রঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায, দারুস সালাম বাংলাদেশ

❖ নামাজের সুন্নাত সমূহঃ

১। আজান ও ইকামত বলা। (আদ্দুররুল মুখতার মাআ শামী-২/৪৮)

২। তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উঠানো। (তানভীরুল আবসার মাআ শামী-২/১৮২)

৩। হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭১)

৪। ইমামের জন্য তাকবীর গুলিউচ্চ স্বরে বলা। (হিন্দিয়া-১/১৩০)

৫। সানা পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭১)

৬। আউযুবিল্লাহ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭২)

৭। বিসমিল্লাহ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৪)

৮। অনুচ্চস্বরে আমীন বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৩)

৯। সানা,আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ,আমীন অনুচ্চস্বরে বলা। (হিন্দিয়া-১৩১)

১০। হাত বাধার সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। (হিন্দিয়া-১/১৩১)

১১। পুরুষের জন্য নাভির নিচে,আর মহিলার জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা। (হিন্দিয়া-১/১৩০)

১২। এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাবার সময় “আল্লাহু আকবার” বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৩-৪৮৯)

১৩। একাকী নামাজ পাঠকারির জন্য রুকু থেকে উঠার সময় “সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা” ও “রব্বানা লাকাল হামদ” বলা। ইমামের জন্য শুধু “সামিয়া’ল্লাহু লিমান হামিদা” বলা আর মুক্তাদির জন্য শুধু “রব্বানা লাকাল হামদ” বলা। (মারাকিল ফালাহ-২৭৮)

১৪। রুকুতে “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৮)

১৫। সেজদায় বলা “সুবহানা রব্বিয়াল আ’লা”। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৯৪)

১৬। রুকুতে উভয় হাটু আকড়ে ধরা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৭)

১৭। রুকুতে পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখা। আর মহিলার জন্য মিলিয়ে রাখা। (শামী-২/১৭৩)

১৮। পুরুষের জন্য নামজে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা ও ডান পা খাড়া রাখে আঙ্গুলগুলো কেব্লার দিক করে রাখা। আর মহিলার জন্য উভয় পা ডান দিকে বের করে জমিনের উপর বসা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৪৯৬)

১৯। শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দুরুদ শরীফ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৫০০)

২০। দুরুদের পর দোয়া পড়া। (হিন্দিয়া-১/১৩০)

২১। তাশাহ্যুদে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সময় শাহাদাত(তর্জনি) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০১-৫০২)

নামাজের মুস্তাহাব সমূহঃ

১। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় উভয় পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের দিকে, বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০৩)

২। তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত চাদর থেকে বাহিরে বের করে রাখা।

৩। সালাম ফিরানোর সময় উভয় কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা। (মারাকিল ফালাহ-১৫১)

৪। নামাজে মুস্তাহাব পরিমান ক্বেরাত(ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাস্যাল,সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত।আছর ও ইশাতে আওসাতে মুফাস্যাল, সূরা তরেক থেকে বায়্যিনা পর্যন্ত। মাগরীবে কিসারে মুফাস্যাল সূরা যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত।)পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬১)

৫। জুমআর দিন ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ,লাম,মিম সেজদা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬৫)

৬। যথা সম্ভব কাঁশি ও ঢেকুর চেপে রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৬)

৭। হাই আসলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৭)

লেখকঃ মুফতি হাফিজ উদ্দীন, জামেয়াতুল আলআসাদ আল-ইসলামিয়া, ঢাকা

- **নামাজ মাকরূহ হওয়ার কারণঃ**

১. নামাজরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

২. সেজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ)। অবশ্য সেজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।

৩. আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

৪. কোমরে হাত রাখাও মাকরূহ।

৫. ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে, তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না; অবশ্য নামাজ মাকরূহ হবে।

৬. উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের উপর কুকুরের ন্যায় বসা।

৭. সেজদায় উভয় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

৮. হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

৯. ফরজ নামাজে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

১০. মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাযত করা।

১১. সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।

১২. হাই তোলা। হাই ও হাচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।

১৩. শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।

১৪. চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সেজদার স্থানে রাখা উচিত।

১৫. চুল মাথার উপর ভাজ করে গিরা দিয়ে নামাজ পড়া। মাথায় চুল থাকলে নামাজের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নত যাতে চুলও সেজদা করতে পারে।

১৬. খোলা মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

১৭. আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রহ.)- এর মতে এটা মাকরূহ নয়।

১৮. শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।

১৯. ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।

২০. কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে

টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

২১. মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

২২. সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় নামাজ মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

❖ নামায ভঙ্গের কারণসমূহঃ

নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে, তেমনিভাবে নষ্ট হওয়ার জন্যও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। যথাঃ

১. সালামের জবাব দিলে : নামাযরত অবস্থায় কারো সালামের জবাব দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সালাম যিকিরের পর্যায়ভুক্ত নয়।

২. নামাযের মধ্যে সালাম দিলে : ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক নামাযের মধ্যে সালাম দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩. দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করা : নামাযের মধ্যে কেউ দুঃখসূচক শব্দ যেমন-আহ, উহ, হায় ইত্যাদি উচ্চস্বরে বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৪. নামাযের ফরয ছুটে গেলেঃ নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা ফরয তন্মধ্যে কোনো একটি ফরয ছুটে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৫. কিরা'আতে ভুল করলে : নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতে যদি এমন ভুল করে যে ভুলের কারণে আয়াতের মর্মার্থ ওলট পালট হয়ে যায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৬. নামাযে কিরা আত দেখে দেখে পড়া : নামাযরত ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফ দেখে দেখে পাঠ করে, তবে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭. নামাযের মধ্যে কথা বলাঃ নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে কথা বলে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

كنَّا نتكلمُ فِي الصّلاةِ يُكَلِّمُ الرّجُلُ صَاحِبَهَ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصّلاةِ Ó

حَتّى نَزَلَتْ { وَقُوْمُوْا لِلهِ قاَ نِتِيْنَ } فأُمِرْنا بالسَّكُوْتِ, ونهينا عَنِ الْكَلَامِ

"যায়েদ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (এক সময়) আমরা নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। মুসল্লী নামাযের মধ্যে তার পার্শ্ববর্তী সাথীর সাথে কথা বলত। অতঃপর যখন কুরআনের বাণী "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ"

(সূরা বাকারাঃ২৩৮)

অবতীর্ণ হয়, তখন আমাদেরকে নীরবতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।"

৮. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়লে : মাদকাসক্ত মাতাল অবস্থায় নামায আদায় করলে তা আদায় হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى "তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ে না।" (সূরা নিসা,আয়াতঃ ৪৩)

৯. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে : নামাযের মধ্যে নির্ধারিত ১৪টি ওয়াজিবের কোন একটি ওয়াজিব যদি নামাযী ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিলে নামায শুদ্ধ হবে। কিন্তু সাহু সিজদা না দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় আদায় করতে হবে।

১০. অট্টহাসি দিলে : নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে শুধু নামাযই নয়, অজুও নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. অপ্রাসঙ্গিক কিছু করা : কোনা দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ সুসংবাদ শুনে আল-হামদুলিল্লাহ' এবং বিক্রয়ের সংবাদ শুনে "সুবহানাল্লাহ' বললে নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১২. অন্য দিকে ঘুরে গেলেঃ নামাযের মধ্যে কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৩. বাচ্চাকে দুধ পান করালে : নামাযরত স্ত্রীলোকের দুধ যদি তার সন্তান এসে খায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৪. হাঁচির জবাব দেয়া : নামাযের মধ্যে যদি কেউ অন্যের হাঁচি শুনে ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে হাঁচির জবাব দেয়, তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৫. চলাফেরা করলে : নামাযের মধ্যে চলাফেরা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রয়োজনে সম্মুখে বা পেছনে যাওয়া যাবে।

১৬. অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে : অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে নামায নষ্ট হয়ে

১৭. আমলে কাসীর হলে : নামাযের মধ্যে যদি কেউ আমলে কাসীর করে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমলে কাসীর হলো নামাযের মধ্যে এমন আমল করা যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, লোকটি নামায আদায় করছে না।

১৮. নিজের ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া : যদি কেউ নামাযের মধ্যে নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়, অথবা ইমাম যদি মুক্তাদি ব্যতীত অন্য কারো লোকমা নেয় অথবা ইমাম যদি জামাত বহির্ভূত অন্য কারো ভুল সংশোধন গ্রহণ করে তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৯. নামাজে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলাঃ এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ

عنْ مُعَا وِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّاَمِى. قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيْءٌ من كلامِ النَّاسِ , إنّما هو التسبيح و التكبير وقراءةُ القران.

"হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নামাযে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিগত কথা বলা চলবে না বরং নামায তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।" (মুসলিমঃ ৫৩৭)

২০. নামাযে কাতার সোজা না করে নামায পড়া, এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছ

عن أبی مسعود، قال: کان رسول الله صلى الله علیه وسلم یمسح مناکبنا في الصّلاة، ویقول: أستووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبکم.

হযরত আবু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: তোমরা সবাই নামাযের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাড়াও । একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দাড়িও না, তা হলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। (মুসলিম,হাদিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪৩২)

২১. বিনা অজুতে নামায পড়া, এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ

عن أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : لا تقبل صلاة أحد کم إذا أحدث حتى یتوضّأَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো অজু না থাকা সত্ত্বেও অজু না করে নামায পড়লে তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম,হাদিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২২৫)

২২. অন্যান্য : কোনো পত্র বা লেখার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তা মুখে উচ্চারণ করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৩. তিন তাসবীহ পাঠ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা ।

২৪. নামাযে খাওয়া বা পান করা ।

সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায,দারুস সালাল বাংলাদেশ।

হজ্বের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ও জরুরি মাসায়িল

মাওলানা মুহম্মাদ ইয়াহইয়া

হজ্ব তিন প্রকার

এক. তামাত্তু হজ্ব

মীকাত অতিক্রমের পূর্বে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে উমরার কাজ সম্পাদন করে চুল কেটে ইহরামমুক্ত হয়ে যাওয়া। অতঃপর এই সফরেই ৮ যিলহজ্ব হজ্বের ইহরাম বেঁধে হজ্বকার্য সম্পাদন করা।

দুই. ইফরাদ

মীকাত অতিক্রমের পূর্বে শুধু হজ্বের নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামা পৌঁছে (উমরা না করা বরং তাওয়াফে কুদুম করে মুস্তাহাব তাওয়াফ করা) ইহরাম অবস্থায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা।

তিন. কিরান

মীকাত অতিক্রমের পূর্বে একই সাথে উমরা ও হজ্বের নিয়তে ইহরাম বেঁধে এই ইহরামে উমরাহ ও হজ্ব উভয়টি পালন করা। মক্কা মুকাররামা পৌঁছে প্রথমে উমরা করা অতঃপর এই ইহরাম অবস্থাতেই হজ্বের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা এবং হজ্বের সময়ে হজ্ব করা।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

হজ্ব অথবা উমরার নিয়তে তালবিয়া পড়লেই ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে এর সুন্নাত তরীকা হল :

* মোচ, নখ এবং শরীরের পরিষ্কারযোগ্য লোম চেঁছে বা কেটে পরিষ্কার করা।

* ইহরামের উদ্দেশ্যে উত্তমরূপে গোসল করা। গোসল সম্ভব না হলে ওযু করে নেওয়া। ঋতুমতী মহিলার জন্য ইহরামের আগে গোসল করা মুস্তাহাব *-গুনয়াতুন নাসেক পৃ. ৬৯*

* পুরুষগণ দুটি নতুন বা ধৌত সাদা চাদর নিবে। একটি লুঙ্গির মতো করে পরবে। অপরটি চাদর হিসাবে ব্যবহার করবে। কালো বা অন্য কোনো শরীয়তসিদ্ধ রং এর কাপড় পরিধান করাও জায়েয। পায়ের পাতার উপরের উঁচু অংশ খোলা থাকে এমন চপ্পল বা

স্যান্ডেল পরা যাবে। মহিলাগণ স্বাভাবিক কাপড় পরবে। তারা ইহরাম অবস্থায় জুতা মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

* ইহরাম বাঁধার আগে খালি শরীরে আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। শরীরের আতর ও ঘ্রান ইহরাম বাধার পরে বাকী থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আর ইহরামের কাপড়ে আতর/সুগন্ধি লাগাবেনা। কেননা ইহরামের কাপড়ে এভাবে আতর বা সুগন্ধি লাগানো নিষিদ্ধ যা ইহরামের পরও লেগে থাকে। *-রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৯ গুনাতুন নাসেক পৃ. ৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২২ মানাসিক মোল্লা আলী কারী পৃ. ৯৮*

(মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে) ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়া ভালো *।-গুনয়াতুননাসেক ৭৩, মানাসিক মোল্লা আলী কারী পৃ. ৯৯, রদ্দুল মুহতার ২/৪৮২*

* নিয়ত : (পুরুষ হলে টুপি বা মাথার কাপড় খুলে ফেলতে হবে) তামাত্তুকারী শুধু উমরার নিয়ত করবে, ইফরাদকারী শুধু হজ্বের নিয়ত এবং কিরানকারী হজ্ব ও উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে। পুরুষ উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়বে আর মহিলা নিম্নস্বরে পড়বে।

তালবিয়া হল – لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. *-মানাসিক পৃ. ১০০, গুনয়াতুন্নাসেক পৃ. ৭৪, আদ্দুররুল মুখতার পৃ. ৪৮৪*

মাসআলা : তালবিয়া পূর্ণ পড়তে হবে। তালবিয়ার এই দুআর অল্প কিছু ছেড়ে দেওয়াও মাকরূহ *।-মানাসিক পৃ. ১০২, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৩,*

মাসআলা : তালবিয়ার উক্ত দুআর স্থলে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, কালিমা তাইয়্যিবা বা আল্লাহ তাআলার কোনো জিকির পড়লেও ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তালবিয়া ছাড়া অন্য কিছু পড়া মাকরুহ তাই তালবিয়া পড়া সম্ভব না হলে আল্লাহ তাআলার যে কোনো জিকির পড়ে ইহরাম বাঁধতে পারবে। *-মানাসিক ১০২, গুনয়াতুননাসিক ৭৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৩*

মাসআলা : মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় হাত-মোজা ও পা-মোজা ব্যবহার করতে পারবে। তবে হাত মোজার ব্যাপারে দু'ধরনের দলীল বিদ্যমান থাকায় কেউ কেউ হাতমোজা পরিধান না করাকে উত্তম বলেছেন। *-আল ইসতিযকার ১১/৩০, সূনানে আবু দাউদ ২/২৫৪ আত্তারগীব ওয়াত তারহীব ৪/৪৭৭, মীযানুল ইতিদাল ৩/৪৫, ইলাউস সুনান ১০/৪৮ আলবাহরুর রায়েক ২/২২৩, বাদায়ে ২/৪১০, ফাতহুল মুলহিম ৩/২০৪, মানাসিক ১১৬, গুনাতুল নাসিক -৭৪, খানিয়া -১/২৮৪, আহকামে হজ্ব ৩৫*

মাসআলা : মহিলাগণ ওযর অবস্থায় অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব ইত্যাদি থাকলেও ইহরাম বাঁধতে ও তালবিয়া পড়তে পারবে। হজ্বের অন্যান্য কাজও করতে পারবে তবে এ অবস্থায় তাওয়াফ করা, নামায পড়া জায়েয নয়।

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায়ও মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা নিষিদ্ধ। তাই এ অবস্থায় চেহারার সাথে কাপড় লেগে না থাকে এভাবে চেহারার পর্দা করা জরুরি। এখন এক ধরনের ক্যাপ পাওয়া যায়, যা পরিধান করে সহজেই চেহারার পর্দা করা যায়। *-আদিল্লাতুল হেজাব ৩২৯-৩৩৪; নাইলুল আওতার ৫/৭১ মানাসিক ১১৫, ফাতহুল বারী ৩/৪৭৫; এলামুল মুআককিয়ীন ১/১২২-১২৩, হজ্বের মাস শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ শাওয়াল মাসের আগে হজ্বের ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। -গুনয়াতুন্নাসেক -৬৭*

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় ইহরামের পোশাক পরিবর্তন করা যাবে। *-শরহু লুবাবিল মানাসিক ৯৮*

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে অন্যান্য মৃতের মতোই গোসল ইত্যাদি দিবে এবং স্বাভাবিক মৃতের মতোই অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়

১। পুরুষের জন্য শরীরের কোনো অঙ্গের আকৃতি বা গঠন অনুযায়ী তৈরিকৃত বা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। যেমন : পাঞ্জাবি, জুব্বা, শার্ট, সেলোয়ার, প্যান্ট, গেঞ্জি, কোর্ট, সোয়েটার, জাঙ্গিয়া।

মাসআলা : ইহরামের কাপড় ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করে কিংবা জোড়া দিয়ে পরিধান করা যাবে। তবে ইহরামের কাপড় এ ধরনের সেলাইমুক্ত হওয়াই ভালো। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৮১, শরহু লুবাবিল মানাসিক ৯৮

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত ব্যাগ ব্যবহার করা ও বেল্ট বাঁধা নিষিদ্ধ নয়।

২। পুরুষের জন্য মাথা ও চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য শুধু চেহারায় কাপড় স্পর্শ করানো নিষেধ। তাই তারা পরপুরুষের সামনে চেহারায় কাপড় লেগে না থাকে এভাবে পর্দা করবে।

৩। পুরুষের জন্য পায়ের উপরের অংশের উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা পরিধান করা নিষেধ। এমন জুতা বা স্যান্ডেল করতে হবে যা পরলে ওই উচু অংশ খোলা থাকে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৯০

৪। ইহরামের কাপড় বা শরীরে আতর বা সুগন্ধি লাগানো নিষেধ। সুগন্ধিযুক্ত তেল যয়তূন ও তিলের তেলও লাগানো যাবে না। সুগন্ধি সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি পৃথকভাবে সুগন্ধি জর্দা খাওয়াও নিষিদ্ধ। পানের সাথে খাওয়া মাকরূহ। ইচ্ছাকৃতভাবে ফল-ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া মাকরূহ। -মানাসিক ১২১; আহকামে হজ্ব ৩৪; আহকামে হজ্ব ৩৪

৫। শরীরের কোনো স্থানের চুল, পশম বা নখ কাটা বা উপড়ানো নিষিদ্ধ।

৬। ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা বা স্ত্রীর সামনে এ সংক্রান্ত কোনো কথা বা কাজ করা নিষিদ্ধ।

৭। কোনো বন্য পশু শিকার করা বা কোনো শিকারীকে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ।

৮। ঝগড়া-বিবাদ সাধারণ সময়েও নিষিদ্ধ। ইহরাম অবস্থায় এর গুনাহ আরো বেশি।

৯। কাপড় বা শরীরের উকূন মারা নিষিদ্ধ। *-আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৬-৪৯০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৪, মানাসিক ১১৭-১২০, গুনয়াতুননাসেক ৮৫।*

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় যে কাজগুলো নিষিদ্ধ তাতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ। এর কারণে হজ্ব কিছুটা অসম্পূর্ণ হয়ে যায় আর কিছু নিষেধাজ্ঞা এমন রয়েছে যেগুলো করলে 'দম' ওয়াজিব হয়। আর আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে হজ্বই নষ্ট হয়ে

যায়। এক্ষেত্রে গরু বা উট যবেহ করা ছাড়া পরবর্তী বছর কাযা করা জরুরি ।। *-আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৫৮-৫৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৪, মানাসিক ১১৭*

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় মাথা ও মুখ ব্যতীত পূর্ণ শরীর চাদর ইত্যাদি দিয়ে আবৃত করা যাবে। কান, ঘাড়, পা ঢাকা যাবে। মাথা ও গাল বালিশে রেখে শোয়া যাবে। তবে পুরো মুখ বালিশের উপর রেখে ঢেকে শোয়া যাবে না। *-মানাসিক ১২৩-১২৪, গুনয়াতুননাসেক ৯৩*

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় পান খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে পানে সুগন্ধিযুক্ত মসলা বা জর্দা খাওয়া নিষিদ্ধ।

মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় পানিতে ডুব দেওয়া যাবে। *-গুনয়াতুনন্নাসেক ৯১*

উমরার পদ্ধতি

উমরার ফরয দুটি

১। উমরার ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ উমরার নিয়তে তালবিয়া পড়া।

২। বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা ।

উমরার ওয়াজিব দুটি

১। সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।

২। মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা।

মাসআলা : উমরার তাওয়াফে পুরুষের জন্য 'ইজতিবা' অর্থাৎ ডান কাঁধ খালি রেখে চাদর বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রাখা এবং 'রমল' অর্থাৎ তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে কিছুটা দ্রুত বীরদর্পে হাঁটা।

উমরার তাওয়াফ

মাসআলা : যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল অর্থাৎ বীরদর্পে কাঁধ হেলিয়ে কিছুটা দ্রুত বেগে চলা সুন্নত। তদ্রূপ পুরো তাওয়াফে ইজতেবা (ডান কাঁধ খালি করে ডান বগলের নিচে দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর

দিয়ে চাদর পরিধান) করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ। তবে এ দু'টি শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নত। মহিলাদের জন্য নয়। *-মানাসিক ১২৯, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৫*

মাসআলা : তাওয়াফকারীর সীনা বাইতুল্লাহ দিকে করে তাওয়াফ করা যাবে না। এমনকি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় কিংবা হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার সময় সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলে যেখান থেকে ঘুরেছে সেখান থেকেই সীনা ঠিক করে আবার তাওয়াফ শুরু করা জরুরি। *-মানাসিক ১৫৩, গুন্‌য়াতুন নাসিক ১১৩, রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪*

মাসআলা : সকল তাওয়াফের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া ওয়াজিব। চাই তাওয়াফ নফল হোক বা ফরয। আর এই দুই রাকাত মাকামে ইব্রাহীমীর পিছনে পড়া ভালো। কিন্তু জায়গার সংকুলান না হলে মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়া যাবে। এমনকি হেরেমের সীমানার ভিতর পড়লেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হেরেমের বাইরে পড়া মাকরূহ। তবে পড়লে আদায় হবে যাবে। দম ওয়াজিব হবে না। *-মানাসিক ১৫৫, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৬, গুনয়াতুননাসেক ১১৬*

মাসআলা : তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামায তাওয়াফের পরেই অবিলম্বে আদায় করা উত্তম। বিনা ওজরে বিলম্বে পড়া মাকরূহ। তবে মাকরূহ ওয়াক্ত হলে পরে পড়বে। *-রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯, মানাসিক ১৫৫, গুনয়াতুননাসেক ১১৬*

মাসআলা : একাধিক তাওয়াফ করে পরবর্তী দুই রাকাত নামাযকে একত্রে পড়া মাকরূহ। তবে পূর্বের তাওয়াফের পরের সময় যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয়ে থাকে তবে একাধিক তাওয়াফের নামায একত্রে আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। *-গুনয়াতুনাসেক ১১৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭*

হজ্বের পদ্ধতি

হজ্বের ফরয তিনটি :

১। ইহরাম বাঁধা

২। উকূফে আরাফা। অর্থাৎ ৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে পরবর্তি রাতের সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে যিয়ারত। ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগেই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ এই-

১। উকূফে মুযদালিফা। ১০ যিলহজ্ব সোবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের ভিতর স্বল্প সময় মুযদালিফায় অবস্থান করলে এ ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

২। সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।

এ সায়ী তাওয়াফে যিয়ারতের পরও করা যায়। আবার ৮ যিলহজ্বের আগেও নফল তওয়াফের পর আদায় করা যায়। ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীগণ মক্কা প্রবেশের পর যে 'তাওয়াফে কুদুম' করে থাকে এরপর হজ্বের ওয়াজিব সায়ী করে নিতে পারে।

৩। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে জামরাতে রমী তথা কংকর নিক্ষেপ করা।

৪। তামাত্তু ও কিরান হজ্ব আদায়কারীর জন্য দমে শুকর তথা হজ্বের কুরবানী।

৫। মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাটা।

৬। মীকাতের বাহির থেকে আগত লোকদের জন্য 'তাওয়াফে বিদা' করা।

নিম্নে ৮ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত ৫ দিন হজ্বের আমলগুলোর কর্মপদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট মাসায়িল আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রথম দিন ৮ যিলহজ্ব

আজ সূর্যোদয়ের পর সকল হাজীকে ইহরাম অবস্থায় মিনা গমন করতে হবে। যোহর থেকে পরবর্তী দিনের ফজর পর্যন্ত মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া এবং ৮ তারিখ দিবাগত রাত্রি মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭*

হজ্বের ইহরাম

ইফরাদ হজ্ব ও কিরান হজ্ব আদায়কারী হজ্বের ইহরাম পূর্ব থেকেই করে থাকে। তামাত্তু হজ্ব আদায়কারী আজ মিনায় যাওয়ার পূর্বে হজ্বের ইহরাম বাঁধবে।

হজ্বের ইহরাম বাঁধার স্থান

মাসআলা : হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য পুরুষ-মহিলা কারো জন্যই মসজিদে হারামে যাওয়া জরুরি নয়। মহিলাগণ নিজ নিজ অবস্থান স্থল থেকেই ইহরাম বাঁধবে। পুরুষরাও হোটেল বা আবাস-স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে। তবে পুরুষগণ সম্ভব হলে মসজিদে হারামে এসে নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বাঁধা ভালো।

মাসআলা : হজ্বের ইহরামের পর থেকে ১০ তারিখ জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পুর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে। কংকর নিক্ষেপের পর থেকে তালবিয়অ বন্ধ হয়ে যাবে। *-মানাসিক ২২৫, গুনয়াতুননাসেক ১৭০*

মাসআলা : মিনায় অবস্থান না করা

৮ তারিখ দিবাগত রাতে যদি কেউ মিনায় অবস্থান না করে কিংবা এ তারিখে মোটেই মিনায় না যায় তাহলেও তার হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে। *-মানাসিক ১৮৮-১৮৯, আহকামে হজ্ব ৬২*

মাসআলা : তাবু মিনার বাইরে হলে

মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মিনার এলাকার বাইরে বহু তাবু লাগানো হয়। যেহেতু এটি জায়গা সংকীর্ণতার ওজরে করা হয়ে থাকে তাই আশা করা যায়, এ সকল তাবুতে অবস্থানকারীগণও মিনায় অবস্থানের ফযীলত পেয়ে যাবে। তবে যারা তাবুর বাইরে মিনার এলাকায় গিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে পারে তাদের জন্য সেখানে অবস্থান করাই ভালো হবে।

মাসআলা : নির্ধারিত সময়ের আগেই মিনায় রওয়ানা

মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় হল ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর। কিন্তু আজকাল ৭ তারিখ দিবাগত রাতেই মুআল্লিমের গাড়ি রওয়ানা হয়ে যায় এবং রাতে রাতেই মিনায় পৌঁছে যায়। যদিও ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা হওয়া নিয়ম এবং এটিই ভালো, কিন্তু অধিক ভিড়ের কারণে আগে আগে চলে যাওয়া দোষণীয় নয়। *-মানাসিক ১৮৮, গুনয়াতুনন্নাসেক ১৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭*

মাসআলা : ৯-১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তাই প্রত্যেক হাজীকে এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

দ্বিতীয় দিন ৯ যিলহজ্ব

উকূফে আরাফা

আজ হজ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায়ের দিন। ৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলার পর থেকে পরবর্তী রাতের সুবহে সাদিকের মধ্যে যেকোনো স্বল্প সময় আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকলেই এই ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে এ দিন সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। *-গুনয়াতুন্নাসেক ১৫৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯; আহকামে হজ্ব ৬৩*

আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া উত্তম। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩; গুনয়াতুন্নাসেক ১৪৬-১৪৭*

সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় যাওয়া ভিড়ের কারণে বহু লোক ৮ তারিখ রাতেই আরাফায় চলে যায়। মুআল্লিমের গাড়িগুলোও রাত থেকেই হাজী সাহেবদেরকে আরাফার পৌঁছাতে শুরু করে। রাতে চলে গেলে একাধিক সুন্নাতের খেলাফ হয়। এক. রাতে মিনায় থাকা সুন্নত। এটি আদায় হয় না।

দুই. *৯ তারিখ ফজর নামায মিনায় পড়া সুন্নত। এটাও ছুটে যায়।*

তিন. সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশে রওনা হওয়া মুস্তাহাব। সেটাও আদায় হয় না। তাই সাধ্য মতো চেষ্টা করা চাই যেন বাসগুলো অন্তত ফজরের পর ছাড়ে। যদি মানানো সম্ভব না হয় তাহলে বৃদ্ধ ও মহিলারা মাহরামসহ আগে চলে যাবেন। আর সুস্থ সবল হাজীগণ মিনায় ফজরের নামায পড়ে আরাফার পথে রওয়ানা হবেন। মিনায় ফজর পড়ে হেঁটে গেলেও সুন্দরভাবে দুপুরের আগেই আরাফায় পৌঁছা যায়। গাড়িতে গেলে জ্যামের কারণে একটু বিলম্ব হলেও আরাফায় পৌঁছা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময় একেবারে তাঁবুর নিকটে পৌঁছা যায় না। কিছুটা আগে নেমে যেতে হয়। তাই মাযূর হাজীগণ রাতেও যেতে পারবেন। আর যারা সুস্থ সবল আছেন, হাঁটতে তেমন সমস্যা হয় না তারা ফজরের পরই রওয়ানা হবেন। *-রদ্দুল মুহতার -২/৫০৩*

আরাফায় কসর করবে না পূর্ণ নামায পড়বে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে আরাফার ময়দানে মুকীম হাজীগণ যোহর-আসর পূর্ণ চার রাকাতই পড়বে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও এমনই। তাই নিজ নিজ তাবুতে পড়লে মুকীম হাজীগণ পূর্ণ নামায পড়বেন, কসর করবেন না। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫০৫ গুনয়াতুন্নাসেক ১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া -১/২২৮, ২/৫০৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯*

যোহর ও আসর একত্রে পড়া

মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে যোহর ও আসর একত্রে ইমামের পিছনে আদায় করে নিবে। কিন্তু মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলে জোহরের সময় যোহর এবং আসরের সময় আসর পড়বে। একত্রে পড়লে সময়ের আগে পড়া নামায আদায় হবে না।

উকূফে আরাফার করণীয়

উত্তম হল, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআ করা। এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে অল্প সময় বসবে। এরপর আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুআ মুনাজাতে লেগে যাবে। *-আদ্দুররুল মুখতার আহকামে হজ্ব ৬৫*

সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বেরিয়ে যাওয়া

অনেকে সূর্যাস্তের আগেই মুযদালিফায় রওনা হয়ে যায়। এরূপ হয়ে গেলে কর্তব্য হল পুনরায় আরাফায় ফিরে যাওয়া। যদি ফিরে না যায় তবে দম দিতে হবে। *-খ. মানাসিক ২১০ গুনয়াতুনন্নাসেক ১৬০; রদ্দুল মুহতার ২/৫৫২*

৯ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছতে না পারলে

কেউ যদি ৯ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দানে কোনো কারণে পৌঁছতে না পারে তবে সে সুবহে সাদেক হওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্য আরাফায় অবস্থান করলেও তার ফরয আদায় হবে যাবে। আর এ কারণে দম বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে যথা সময় আরাফায় না পৌছার ত্রুটি থেকে যায়। *-মানাসিক ২০৫-২০৬, গুনয়াতুন্নাসেক ১৫৯*

আরাফায় জুমআ

আরাফার ময়দানে জুমআ পড়া জায়েয নয়। তাই এদিন শুক্রবার হলে হাজীগণ যোহর পড়বে, জুমআ নয়। - *মানাসিক ১৯৬*

মাসআলা : মসজিদে নামিরার পশ্চিমের কিছু অংশসহ 'বাতনে উরানা' নামক স্থান রয়েছে। এখানে উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়। -*আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০৪*

মুযদালিফায় রওয়ানা

আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়েই মুযদালিফার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশে রওনা হতে বিলম্ব না করাই শ্রেয়। -*রদ্দুল মুহতার ২/৫০৮*

৯ তারিখ দিবাগত রাত্রির মাগরিব ও ইশা

আজকের মাগরিব ও ইশা ইশার ওয়াক্তে মুযদালিফায় গিয়ে পড়তে হবে। যদি কেউ মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই রাস্তায় মাগরিব ইশা পড়ে নেয় কিংবা মুযদালিফায় পৌঁছার আগে শুধু মাগরিব পড়ে তবে ইভয় ক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছে আবার মাগরিব ইশা একত্রে পড়া জরুরি। -*মানাসিক ২১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৪*

মাসআলা : মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এক আযান ও এক ইকামতে পড়া উত্তম। পৃথক পৃথক ইকামতও জায়েয। --*মানাসিক ২১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৮*

মুযদালিফায় গিয়ে ইশার ওয়াক্ত না থাকলে বিলম্বের কারণে মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে পথিমধ্যে মাগরিব ইশা পড়ে নিবে। এক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছার পর ইশার ওয়াক্ত বাকী না থাকলে মাগরিব ইশা দোহরাতে হবে না। কিন্তু যদি সেখানে গিয়ে মাগরিব-ইশা পড়ার সময় বাকী থাকে তবে এ দুই নামায পুনরায় পড়তে হবে। -*তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/২৮, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪২, আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪০৪, তাতারখানিয়া ২/৪৫৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০; গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৪*

ইশার ওয়াক্তের পূর্বেই মুযদালিফা পৌঁছে গেলে

যদি কেউ ইশার ওয়াক্তের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তবে সে তখন মাগরিব পড়বে না; বরং ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব-ইশা আদায় করবে। *-মানাসিক ২১৮*

মাসআলা : মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়ার জন্য জামাত শর্ত নয়। একা পড়লেও দুই নামায একত্রে ইশার সময় পড়বে। তবে নিজেরা জামাত করে পড়া ভালো। *-মানাসিক ২১৪, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৩-১৬৪*

মাসআলা : কেউ যদি দুই নামাযের মাঝে নফল বা সুন্নাত নামায কিংবা অন্য কোন কাজে বিলম্ব করে। যেমন : খানা-খাওয়া ইত্যাদি তবে ইশার জন্য ভিন্ন ইকামত দেওয়া উচিত। *-মানাসিক ২১৯*

৪র্থ দিন ১০ যিলহজ্ব

উকূফে মুযদালিফা

উকূফে মুযদালিফার সময় ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। সুবহে সাদিকের পর স্বল্প সময় অবস্থানের পর মুযদালিফা ত্যাগ করলেও ওয়াজিব আদায় হবে যাবে। তবে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা সুন্নত। আর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। *-মানাসিক ২১৫, ২১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৫*

মাসআলা : উকূফে মুযদালিফা যেহেতু ওয়াজিব তাই বিশেষ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে উকূফ না করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ভীড়ের কারণে যদি সূর্যোদয়ের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। *-মানাসিক ২১৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫১১*

উকূফের স্থান

মুযদালিফার ময়দানের যেকোনো অংশেই অবস্থান করা যাবে। মসজিদে মাশআরে হারামের নিকট উকূফ করা ভালো। অবশ্য মুযদালিফার বাইরে মিনার দিকে 'ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সির' নামক স্থানে উকূফ করা যাবে না। কারণ এখানে উকূফ করা নিষিদ্ধ। এখানকার উকূফ ধর্তব্য নয়। *-গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৭*

মাসআলা : অতিশয় বৃদ্ধ, দুর্বল কিংবা অধিক পীড়িত রোগীর জন্য মুযদালিফায় অবস্থান না করে আরাফা থেকে সোজা মিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি আছে। এতে তাদের উপর দম বা কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। *-মানাসিক ২১৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১*

১০ম যিলহজ্বের দ্বিতীয় ওয়াজিব জামরায়ে আকাবার রমী

রমীর পদ্ধতি

রমী অর্থ কংকর নিক্ষেপ করা। মসজিদে হারামের দিক থেকে সর্বশেষ কংকর নিক্ষেপের স্থানকে 'জামরা আকাবা' বলা হয়। এখানে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। কংকর নিক্ষেপের স্থানে যে চওড়া পিলার আছে তাতেই কংকর মারা জরুরি নয় বরং বেষ্টনীর ভিতরে পড়াই যথেষ্ট। পিলারে কংকর লেগে তা যদি বেষ্টনীর বাইরে গিয়ে পড়ে তবে তা ধর্তব্য হবে না, ঐ কংকর পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। আর পিলারের গোড়ায় মারা ভাল পিলারের উপর অংশে মারা অনুত্তম। *-গুনয়াতুন্নাসেক ১৭১ রদ্দুল মুহতার ২/৫১২*

কংকর সংগ্রহঃ প্রথম দিনের সাতটি কংকর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করা মুস্তাহাব। অবশ্য অন্য জায়গা থেকে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে জামরার নিকট থেকে নিবে না। কারণ, এই স্থানের পাথরগুলো হাদীসের ভাষ্যমতে আল্লাহ তাআলার দরবারে ধিকৃত। যাদের হজ্ব কবুল হয়নি তাদের কংকর এখানে পড়ে থাকে। পরবর্তী দিনের কংকর মুযদালিফা থেকে নেওয়া মুস্তাহাব নয়। জামরার নিকট ব্যতীত অন্য যেকোনো স্থান থেকে নিতে পারবে। *-মানাসিক ২২২, গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৮, আদ্দুররুল মুখতার ৫১৫*

কংকরের ধরনঃ বুট বা ছোলার দানার মত ছোট কংকর মারা ভালো। বড়জোর খেজুরের বিচির মত হতে পারে। বড় পাথর মারা মাকরূহ। তদ্রূপ নাপাক কংকর মারাও মাকরূহ। কংকর নাপাক হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা ধুয়ে নিক্ষেপের কাজে ব্যবহার করা যাবে। *-মানাসিক ২২২*

জামরা আকাবাতে রমীর সময়ঃ ১০ম যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত সম্ভব হলে রমী করা মুস্তাহাব। তবে ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমী করা জায়েয। বিনা ওজরে মুস্তাহাব সময় রমী না

করে অন্য সময় রমী করা মাকরূহ। কিন্তু আজকাল যেহেতু মুস্তাহাব সময়ে রমীর স্থানে প্রচণ্ড ভীড় হয় তাই মহিলা ও দুর্বলদের মতো অন্যদের জন্যও মুস্তাহাব সময়ের বাইরে রমী করার অবকাশ রয়েছে। ওজর থাকার কারণে তা মাকরূহ হবে না। *-গুনয়াতুন্নাসেক ১৬৯-১৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২৩৩*

সাত কংকর একত্রে মারাঃ কেউ যদি সাত কংকর একবারে নিক্ষেপ করে তবে এক কংকর মারা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আরো ছয়টি কংকর পৃথক পৃথক মারতে হবে। *-আহকামে হজ্ব ৭৫*

মাসআলা : জামরা আকাবার রমীর পর দুআর জন্য এখানে অবস্থান না করাই সুন্নত। তাই আজ কংকর মেরে দুআর জন্য সময়ক্ষেপন করবে না। বরং কংকর মেরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। *-মানাসিক ২২৪*

সময় মতো রমী না করলেঃ ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিকের আগে জামরা আকাবার রমী করতে না পারলে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে দম ওয়াজিব হবে না বেশি মাজুর ব্যক্তিগণ এ মতটি গ্রহণ করতে পারে। তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আগে মেরে নিতে হবে। অন্যথায় পরে কংকর মারার অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে কংকর না মারার কারণে সবার মতেই ভিন্ন দম ওয়াজিব হবে। *-আহকামে হজ্ব ৭৬*

অন্যকে দিয়ে রমী করানোঃ প্রত্যেক হাজী পুরুষ হোক বা মহিলা, নিজের রমী নিজেই করবে। ভীড়ের কারণে কিংবা অন্য কোনো শরয়ী ওযর ব্যতীত অন্যের দ্বারা রমী করানো জায়েয নয়। শরয়ী ওযর ব্যতীত অন্যকে দিয়ে রমী করালে তা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে পুনরায় নিজের রমী করতে হবে। যদি না করে তবে দম ওয়াজিব হবে।
শরয়ী ওযর হল এমন অসুস্থতা বা দুর্বলতা যার কারণে বসে নামায পড়া জায়েয। অথবা অসুস্থতার কারণে জামরাত পর্যন্ত পেঁছা খুবই কষ্টকর হয় কিংবা রোগ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তবে এরূপ ব্যক্তি অন্যকে দিয়ে রমী করাতে পারবে। *-আহকামে হজ্ব ৭৬-৭৭*

মাসআলা : মাজুর ব্যক্তির পক্ষ থেকে রমী করার জন্য তার অনুমতি লাগবে। বিনা অনুমতিতে কেউ তার পক্ষ থেকে রমী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে অচেতন, পাগল এবং ছোট বাচ্চার অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবক রমী করে দিতে পারবে। -*আহকামে হজ্ব ৭৭*

মাসআলা : যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে রমী করবে, তার জন্য উত্তম হল প্রথমে নিজের রমী শেষ করবে তারপর বদলী করবে। একটি কংকর নিজের পক্ষ থেকে আর আরেকটি অন্যের পক্ষ থেকে এভাবে মারা মাকরূহ। তাই আগে নিজের সাত কংকর মারবে এরপর বদলী আদায় করবে। -*আহকামে হজ্ব ৭৭*

মাসআলা : ঋতুবর্তী মহিলাগণও রমী করতে পারবে।

১০ম যিলহজ্বের তৃতীয় ওয়াজিব

দমে শুকর বা হজ্বের কুরবানীঃ তামাত্তু ও কিরানকারি হাজীদের জন্য একটা কুরবানী করা ওয়াজিব। জামরায়ে আকাবার রমীর পর কুরবানী করবে, মাথা মুণ্ডাবে।

মাসআলা : ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হজ্বের কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে করলে ভালো।

মাসআলা : ইফরাদ হাজীদের যেহেতু কুরবানী নেই তাই তারা রমীর পরই চুল কাটতে পারবে। রমীর আগে চুল কাটলে দম ওয়াজিব হবে।

দমে শুকর বা হজ্বের কুরবানীর সময়ঃ ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ের ভিতর কুরবানী করতে হবে। সুন্নত সময় শুরু হয় ১০ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর থেকে। -*রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২*

কুরবানীর স্থানঃ

মাসআলা : হজ্বের কুরবানী হেরেমের সীমার ভিতরে করা জরুরি। হেরেমের বাইরে জবাই করলে তা দ্বারা হজ্বের কুরবানী আদায় হবে না। হেরেমের যেকোন স্থানে কুরবানী করতে পারে। মিনাতে করা জরুরি নয়। -*রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২*

হাজীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানীঃ মুসাফিরের উপর ঈদুল আজহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং যারা ১০-১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসাফির থাকবে তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যারা মিনায় রওয়া হওয়ার আগে মক্কাতেই ১৫ দিনের নিয়তে অবস্থান করেছে তারা মুকীম হবে। তাদের জন্য হজ্বের কুরবানী ছাড়াও ঈদুল আযহার ভিন্ন কুরবানী দিতে হবে। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫*

হজ্বের কুরবানীর গোশত : হজ্বের কুরবানীর গোশত হাজী নিজেও খেতে পারবে। এ কুরবানীর গোশতের হুকুম ঈদুল আযহার কুরবানীর মতোই।

হজ্বের কুরবানীর সামর্থ না থাকলেঃ তামাত্তু ও কিরানকারী হাজীদের কারো নিকট হজ্বের কুরবানীর সামর্থ না থাকলে তাকে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। ৩টি রোযা আরাফার দিন পর্যন্ত শেষ হতে হবে। আর বাকী সাতটি পরবর্তীতে সুযোগমতো রাখলেই চলবে। আরাফার দিন সহ তিনটি রোযা রাখা না হলে তার জন্য কুরবানী দেওয়াই জরুরি হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কুরবানীর ব্যবস্থা করতে না পারলে চুল কেটে নিবে এবং পরবর্তীতে দুটি পশু যবেহ করবে। ১টি হজ্বের কুরবানী হিসাবে। আর অপরটি কুরবানী না করে চুল কাটার কারণে।

মাসআলা : হজ্বের কুরবানীতে ঈদুল আযহার কুরবানীর ন্যায় গরু, মহিষ, উটের সাত ভাগের একভাগ দিতে পারবে। এ ছাড়া ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দেওয়ার সুযোগ তো আছেই।

১০ যিলহজ্বের চতুর্থ ওয়াজিব

মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা

মাথা মুণ্ডানোর সময়ঃ ১০ যিলহজ্বের দিন কুরবানীর পর থকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মাথা মুণ্ডানোর সুযোগ আছে। এর চেয়ে বিলম্ব করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য মাথা মুণ্ডানোর আগ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে। এ সময় পাথর মারার কাজ করলে তাও ইহরাম অবস্থাতেই করতে হবে।*-হিদায়া ১/২৭৬, গুজয়াতুল মানাসিক ১৭৫, রদ্দুল মুহতার ২/৫৫৪, বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৩০, মাবসূতে সারাখসী ৪/৭০*

চুল কাটার পরিমাণঃ মাথার চুল না মুণ্ডিয়ে যদি খাটো করে তবে আঙুলের এক কর (প্রায় এক ইঞ্চি) পরিমাণ ছোট করা ওয়াজিব। মহিলাগণ অন্তত এতটুকু ছেটে নিবে। এ পরিমাণ চুল মাথার এক চতুর্থাংশ থেকে কাটা হলেই হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু মাথার এক অংশ মুণ্ডিয়ে অন্য অংশে চুল রাখা বা ছোট বড় করে রাখা মাকরূহ তাহরীমী। তাই এমনটি করবে না। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫*

মাসআলা : মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার আগে নখ বা শরীরের অতিরিক্ত পশম ইত্যাদি কাটা যাবে না। যদি কাটে তবে জরিমানা দিতে হবে।

মাসআলা : জামরা আকাবার কংকর নিক্ষেপের পর হজ্ব আদায়কারী নিজের চুল কাটার আগে অন্যের চুল কাটতে পারবে। কিন্তু নিজের চুল কাটার সময় হওয়ার পূর্বে অন্যের চুল কেটে দিলে যে কাটছে তার উপর এক ফিতরা পরিমাণ সাদকা করা জরুরি হবে। *-আহকামে হজ্ব ৯৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১২*

মাসআলা : কারো মাথা পূর্ব থেকে মুণ্ডানো থাকলে কিংবা পুরো মাথা টাক থাকলে হালাল হওয়ার জন্য মাথায় ক্ষুর ঘুরিয়ে নিলেই চলবে। *-বাদায়েউস সানায়ে ২/২১২, রদ্দুল মুহতার ২/৫১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১*

মাথা মুণ্ডানোর স্থানঃ হাজীদের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মিনাতে মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা সুন্নাত। হেরেমের সীমার ভিতর অন্য কোথাও করে নিলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হেরেমের বাইরে মাথা কামালে দম ওয়াজিব হবে। *-আহকামে হজ্ব ৭৯*

হজ্বের তৃতীয় ফরয তাওয়াফে যিয়ারত

তাওয়াফে যিয়ারতের সময়ঃ সুন্নত হল জামরা আকাবার রমী, কুরবানী এবং মাথা কামানোর পর তাওয়াফ করা। আরাফায় অবস্থানের আগে তাওয়াফে যিয়ারত করলে তা দ্বারা ফরয তাওয়াফ আদায় হবে না। আরাফায় অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে ১২ যিলহজ্বের সূর্যাস্তের আগে এই তাওয়াফ করার অবকাশ রয়েছে। যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং তাওয়াফে যিয়ারত করা না হয় তবে দম দেওয়া জরুরি হবে। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫১৭, ৫৩৩, আহকামে হজ্ব ৮০*

মাসআলা : তাওয়াফে যিয়ারত অসুস্থ হলেও নিজেকেই করতে হবে। প্রয়োজনে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু অন্যকে দিয়ে করানো যাবে না। হাঁ, অচেতন ব্যক্তির

পক্ষ থেকে বদলী তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে। আর সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য পায়ে হেঁটে তাওয়াফে যিয়ারত করা ওয়াজিব। পায়ে হেঁটে করার সামর্থ থাকাবস্থায় হুইল চেয়ারে করে বা অন্য কোনো বাহনে চড়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে না। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫১৭*

তাওয়াফে যিয়ারত রমল ও সায়ীঃ যারা মিনায় যাওয়ার পূর্বে সায়ী করেছে অর্থাৎ ইফরাদ হজ্বকারী তাওয়াফে কুদুমের পর এবং তামাত্তু ও কিরানকারী নফল তাওয়াফের পর, তাদের যেহেতু তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করতে হবে না তাই এই তাওয়াফে তাদেরকে রমলও করতে হবে না। অবশ্য যারা পূর্বে এভাবে সায়ী করেনি তাদের যেহেতু তাওয়াফের পর সায়ী করতে হবে তাই তাওয়াফে রমলও করতে হবে। -*আহকামে হজ্ব ৮১*

ঋতুমতি মহিলার তাওয়াফঃ স্রাব চলাকালীন তাওয়াফ নিষিদ্ধ। তাই পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। **১২** তারিখ সূর্যাস্তের আগে পবিত্র হয়ে গেলে অবশ্যই এর ভিতরেই তাওয়াফ সেরে নিতে হবে। কিন্তু যদি **১২** তারিখ সূর্যাস্তের ভিতর পবিত্র না হয় তাহলে পবিত্র হওয়ামাত্র আদায় করে নিবে। এক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কোনো জরিমানা আসবে না। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯*

পবিত্র হওয়ার আগেই দেশে ফিরতে হলেঃ যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারে, আর তার দেশে ফিরার তারিখ হয়ে যায়। কোনোভাবে তা বাতিল বা দেরি করা সম্ভব না হয় তবে এই অপারগতার কারণে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করে নিবে। আর একটি উট বা গরু দম হিসাবে জবাই করতে হবে। সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফারও করবে। তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে যাবে না। অন্যথায় তাকে আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। যতদিন তাওয়াফ না করবে ততদিন স্বামীর সাথে থাকতে পারবে না। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫১৮-৫১৯*

মাসআলা : কোনো মহিলার ওষুধ সেবনের কারণে যদি স্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল করে তাওয়াফ করতে পারবে।

হজ্বের ৪র্থ দিন ১১ যিলহজ্ব

মাসআলা : ১১ ও ১২ যিলহজ্বের রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। কেউ যদি মিনায় না থাকে তবে সুন্নতের খেলাফ হবে বটে কিন্তু কোনো প্রকার জরিমানা দিতে হবে না। -*ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩*

১১ যিলহজ্ব রমীর সময়ঃ জোহরের সময় থেকে নিয়ে আগত রাত্রের সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমীর সময়। তবে সম্ভব হলে সূর্যাস্তের আগে করে নেওয়া ভাল। সূর্যাস্তের পর মাকরূহ সময়। কিন্তু মহিলা, দুর্বল ও অধিক ভীড়ের কারণে সূর্যাস্তের পর রমী করতে কোনো অসুবিধা নেই।

মাসআলা : ১১ যিলহজ্ব তিন জামরাতেই রমী করতে হবে। প্রথম দুই জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করে কিবলামুখী হয়ে দুআ করা সুন্নাত। জামরায়ে আকাবার রমীর পর দুআ নেই। *-সহীহ বুখারী ১/২৩৬, রদ্দুল মুহতার ২/৫২১*

পঞ্চম দিন ১২ যিলহজ্ব

রমীর তৃতীয় দিনঃ ১২ যিলহজ্ব যোহরের সময় থেকে রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশ্য সম্ভব হলে সূর্যাস্তের আগে রমী করা মুস্তাহাব। আজও তিন জামরাতেই কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

মাসআলা : ১১ ও ১২ তারিখ যোহরের পূর্বে রমীর সময় শুরুই হয় না। তাই এ সময় কেউ রমী করলে তা আদায় হবে না। প্রকাশ থাকে যে, ১১ ও ১২ তারিখে নির্ধারিত সময়ের ভিতর যদি কেউ রমী করতে না পারে তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত তা কাযা করার (অর্থাৎ রমী করার) সুযোগ আছে। কিন্তু ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে কাযা করতে না পারলে এরপরে আর রমী করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে দম দেওয়া জরুরি। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫২১*

১৩ যিলহজ্ব, রমী করা

মাসআলা : ১২ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় থাকা উত্তম এবং ১৩ তারিখ রমী করাও উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ রমী করেই মিনা ত্যাগ করেছিলেন।

অবশ্য কেউ যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে রমী করে মিনা ত্যাগ করতে না পারে তবে সূর্যাস্তের পর মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ হবে। তবে এ কারণে দম বা কোনো কিছু

ওয়াজিব হবে না। আর যদি মিনায় ১৩ তারিখ সুবহে সাদিক হয়ে যায় তবে ঐ দিন রমী করা ওয়াজিব। রমী না করে চলে যাওয়া না জায়েয এবং এতে দম ওয়াজিব হবে। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫২১, আহকামে হজ্ব ৮৫*

মাসআলা : ১৩ তারিখ যোহরের পূর্বেও রমী করা জায়েয। তবে যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় হচ্ছে রমী করার সুন্নত ওয়াক্ত। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩*

তাওয়াফে বিদা

মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী হাজীদের জন্য মক্কা মুকাররামা ত্যাগ করার আগে একটি তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একে তাওয়াফে বিদা বলা হয়। এই তাওয়াফটি মক্কা থেকে বিদায়ের সময় করা উত্তম। আর মক্কা ও মীকাতের ভিতর অবস্থানকারীদের জন্য তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। *-রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩*

তাওয়াফে যিয়ারতের পর হাজী কর্তৃক আদায়কৃত যে কোন তাওয়াফ ছাড়া বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

লক্ষণীয় :

হজ্বের মৌলিক বিষয়গুলো উপরে উল্লেখ করা হল। এ ছাড়া হজ্ব করতে গিয়ে ভুল। এছাড়া হজ্ব ভুল-ভ্রান্তি বা অন্য কারণে হাজীগণ আরো অনেক মাসআলার সম্মুখীন হতে পারেন সে ক্ষেত্রে কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক।

অনুশীলনী- ১৮ঃ সেপ্টেম্বর-৪র্থ সপ্তাহঃ

দারস তৈরী -সূরা ফীল,

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي

تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِ (5)

جِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول

অর্থ : তুমি কি দেখনি যে, তোমার প্রতিপালক হাতি-ওয়ালাদের সাথে কিরূপ (আচরণ) করেছিলেন? (০১) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন নি? (০২) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন। (০৩) যারা তাদের উপর পোড়া মাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। (০৪) অতঃপর তিনি তাদের চিবানো তৃণ-ঘাসের মতো করে দিয়েছিলেন। (০৫)

নামকরন: সূরা ফিল আল-কুরআনের ১০৫তম সূরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয় । এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। ফিল অর্থ হাতি। এ সূরায় হস্তিবাহিনীর করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা ফিল।

শানে নুযুলঃ হাবশার বাদশাহর তরফ থেকে আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল আবরাহা। সে ছিল খ্রিষ্টান। সে সানআ নামক স্থানে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করে । অতঃপর মানুষকে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আহ্বান করে। সে চাইল মানুষ যেন মক্কা শরিফে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আগমন করে। কিন্তু মানুষ কাবাগৃহকে খুব সম্মান করত। সুতরাং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল না । তারা আগের মতোই কাবাগৃহে উপাসনা করতে লাগল। এতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চিন্তা করল- কাবাগৃহ ধ্বংস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৩টি বিশালকায় শক্তিশালী হাতি নিয়ে অগ্রসর হয়। আবরাহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাদা ও কুরাইশদের সর্দার। তিনি জানতেন যে কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সুতরাং এ ঘরের রক্ষার দায়িত্বও আল্লাহরই উপর । আব্দুল মুত্তালিবের নির্দেশে কুরাইশগণ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন। এগুলো ছিল একপ্রকার ছোট পাখি। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে

একটি করে কংকর নিয়ে এলো। অতঃপর এগুলো আবরাহার বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। পরে তার ক্ষতস্থানে পচন ধরে এবং ভয়ঙ্কর কষ্টের পর সে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি ৫৭০ সালে সংঘটিত হয়। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জন্মের ৫০দিন পূর্বে ঘটেছিল। আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে এ বিশেষ ঘটনা সকলকে জানিয়ে দেন।

ব্যখ্যাঃ আয়াত-১ اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِؕ ١

তুমি কি দেখনি (কা‘বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন?

(১) এখানে أَلَمْ تَرَ "আপনি কি দেখেননি" বলা হয়েছে। বাহ্যত এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কোন কোন মুফাসসির এর সমাধানে বলেন, এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজিদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' বা আপনি কি দেখেননি? শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। [কুরতুবী]

অপর কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তাছাড়া, এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়েশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা দুজন হস্তীচালককে অন্ধ,

বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন। *বাইহাকী: দালায়েলুন নাবুওয়াহ, ১/৫২] [আত-তাহরীর ওয়াততানওয়ীর] তাফসীরে জাকারিয়া*

আয়াত-২

اَلَمۡ یَجۡعَلۡ کَیۡدَهُمۡ فِیۡ تَضۡلِیۡلٍ

তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?

(১) যদি আয়াতটিকে পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ধরা হয়, তখন এ আয়াতটির অর্থ হয়, "তিনি কি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান নি?" পক্ষান্তরে যদি আয়াতটিকে প্রথম আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে, "আপনি কি দেখেন নি, তিনি তাদের উপর ঝাকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন?" [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

আয়াত-৩

وَّ اَرۡسَلَ عَلَیۡهِمۡ طَیۡرًا اَبَابِیۡلَ

(২) أبابيل শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, যা একটার পর একটা আসে। কারও কারও মতে, শব্দটি বহুবচন। (أَبَابِيل) আবাবিল পাখির ঝাঁক-কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। [তাবারী] বলা হয়ে থাকে যে, এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। [কুরতুবী]

আয়াত-৪ تَرۡمِیۡهِمۡ بِحِجَارَۃٍ مِّنۡ سِجِّیۡلٍ

(১) উপরে سجيل এর অর্থ করা হয়েছে, পোড়া মাটির কঙ্কর। [মুয়াস্‌সার] কারও কারও মতে, ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে শক্ত হয়ে যে, কংকর তৈরি হয়, সে কংকরকে سجيل বলা হয়ে থাকে। [জালালাইন] আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ অতি শক্ত পাথরের কঙ্কর। [আদওয়াউল বায়ান]

আয়াত-৫ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ

অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায়।

(১) عصف এর অর্থ শুষ্ক তৃণ-লতা, শুকনো খড়কুটো।। কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা শুষ্ক তৃণ ভক্ষিত হওয়ার পর যা হয়, তদ্রুপই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। [তাবারী, ইবন কাসীর]

এ সূরা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই-

১. কাবা মহান আল্লাহর ঘর, আর এটি সংরক্ষণ তিনিই করবেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি এটি ধ্বংস করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

২. মহান আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা অসীম। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।

৩. যারাই মহান আল্লাহর নাফরমানি করবে, তিনি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন।

৪. আল্লাহদ্রোহী ও নাফরমানদের শাস্তি শুধু পরকালেই হবে, তা নয় বরং দুনিয়াতেও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।

৫. ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সমস্ত কৌশল ও ষড়যন্ত্র মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কেননা তিনিই সর্বোত্তম কৌশলী।

বইঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি

মূল নামঃ ইসলামী দাওয়াত আউর তরিকে কাম

লেখক- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

বইটির গুরুত্ব

১. বইটি নিরেট একটি সাংগঠনিক বই।
২. দায়ীদের উদ্দেশ্যে বইটি রচিত।
৩. যারা দ্বীনকে জীবন উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তাদের উদ্দেশ্যে ।
৪. ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য বইটি গুরুত্বপূর্ণ।
৫. এটি ১৯৪৫ সালের ১৯শে এপ্রিল দারুল ইসলাম পাঠান কোটে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামায়াতের ভাষণ।

ভুমিকায় ৩টি বিষয়ের আলোচনা ঃ

আমাদের দাওয়াতে হতাশার দিক

১. আমাদের আন্দোলন শুষ্ক, নীরস ও স্বাদহীন।
২. আমাদের দাওয়াত দুনিয়ার রাজনৈতিক বাজারে একটি অচল পণ্য।
৩. আমাদের কর্মনীতিতে আন্দোলনকে তীব্র ও জনগণকে আকৃষ্ট করতে বর্তমান কালের উপায় উপকরণ নেই।

আমাদের দাওয়াতে আশার দিক

১. ধীরে ধীরে বহু লোক আমাদের দাওয়াতে আকৃষ্ট হচ্ছে।
২. সম্মেলন সমুহে দূর-দুরান্ত থেকে লোকজন যোগদান করছে।
৩. এ সকল লোকদের আকর্ষণ নিশ্চিত সত্যের দিকে।

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

১. "মুসলিম লীগ" মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন করে।
২. অপর দিকে"কংগ্রেস" অখন্ড ভারত রক্ষার আন্দোলনে জোরালো ভুমিকা রাখে।

৩. এ সময় জামায়াত রাজনৈতিক মিছিল-মিটিংএ যোগ না দিয়ে নীরবে দাওয়াত-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

অতীতের কাজ যাচাই করা, দোষ-ত্রুটিসমূহ অনুধাবন করা এবং তাহা দূর করবার জন্য চিন্তা করার অবসর লাভ করাই এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

ক. আমাদের সম্মেলন সমুহের উদ্দেশ্য হলো

১. সদস্যগণের পরস্পর পরিচিতি, সংঘবদ্ধ ও গভীরভাবে মিলিত হওয়া।
২. পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতার উপায় উদ্ভাবন করা।
৩. নিজেদের সাংগঠনিক কাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করা।
৪. বিপদ, সমস্যা, বাধা-বিপত্তি সমুহ দূর করার পন্থা নির্ধারণ করা।
৫. অতীত কাজের দোষ-ত্রুটি অনুধাবন ও তা দূর করতে চিন্তা করার অবসর লাভ।
৬. সমর্থকদেরকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দাওয়াত ও কাজ বুঝার সুযোগ করে দেয়া।
৭. সত্য নীতি সম্পর্কে মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর হলে তারা জামায়াতে যোগদান করবে।

খ. সাধারণ লোকেরা কেন সম্মেলনে আসে

১. মুষ্টিমেয় কিছু লোক আল্লাহর নামে যে কাজ শুরু করেছে, তা সুক্ষ দৃষ্টিতে যাচাই করার জন্য।
২. প্রকৃত পক্ষে মুষ্টিমেয় লোকদের কাজ আল্লাহর জন্য কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য।

আমাদের দাওয়াত

ক. দাওয়াতী কাজে অভিযোগ বা বাধা

১. দাওয়াত দিতে গেলেই বলা হয়, আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার দাওয়াত দিই।
২. আমাদের লক্ষ্য বুঝানো হয়-আমরা ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনীতি করি।
৩. আমাদেরকে পার্থিব স্বার্থবাদী আখ্যা দেয়া হয়।

খ. অভিযোগ কারীদের ধারণা

১. অথচ মুসলমানরা তো দ্বীন-ইসলাম ও পরকালের জন্যই কাজ করে।
২. হুকুমত দাবী করার বস্তু নয়, ধার্মিক জীবন যাপনের কারণে আল্লাহর তরফ থেকে আসে।

গ. অভিযোগের কারণ ৩টি

১. প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝার কারণে।
২. চালাকীর সাথে করে, যাতে সাধারণ লোক সত্যের আন্দোলন/দাওয়াত থেকে বিরত থাকে
৩. আলেম-পীরেরা কেন রাজনীতির দাওয়াত দেয় না, তারাই ইসলাম বেশী বুঝে (নিজ)

ঘ. আমাদের উদ্দেশ্য বা চুড়ান্ত লক্ষ্য

১. মানুষের সামগ্রিক জীবনে ইসলাম নির্ধারিত পরিপূর্ণ বিপ্লব সৃষ্টি করা।
২. নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য-১টি মুসলিম জাতি গঠন, নবীদের কাজই এখন আমাদের।

ঙ. আমাদের দাওয়াত ৩টি দফাঃ

১. আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণঃ সাধারণতঃ সকল মানুষকে বিশেষত মুসলমানদেকে আহবান জানাই।

২. মুনাফেকী ত্যাগ করে যারা মুসলমান হওয়ার দাবী করে, তাদেরকে মুনাফেকী ও কর্মে বৈষম্য দূর করে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশের দাওয়াত দিয়ে থাকি।

৩. নেতৃত্বের আমুল পরিবর্তন ঃ বাতিল, ফাসেকী ও কাফিরদের নেতৃত্বের আমুল পরিবর্তন করে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নেক বান্দাদের হাতে সোপর্দ করা।

চ. খোদার বন্দেগী সম্পর্কে কিছু লোকের ভ্রান্ত ধারণা

১. নিজকে বান্দা মনে করাই যথেষ্ট, নৈতিক-সমষ্টিগত জীবনে দাসত্ব না করলেও ক্ষতি নেই

২. আল্লাহকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও মাবুদ স্বীকার করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে আল্লাহকে অপসারিত করা অসংগত হবে না।

৩. ধর্মীয় জীবনে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, হালালহারামের কয়েকটি শর্ত মানাই বন্দেগী।

৪. বৈষয়িক ব্যাপারে খোদার বন্দেগী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন-তামাদ্দুন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি।

ছ. কাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম?

১. যতখানি কাফের জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

২. ততখানি তীব্রতার সাথে বন্দেগীর এই ভূল ধারণার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম।

জ. কেন আমাদের সংগ্রাম উল্লেখিত ধারণা সমুহ দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি ও রূপকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে।

মুনাফেকীর মুলকথা

ক. মুনাফেকীর নীতি ৪টি ঃ

১. ঈমান ও দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত দেখে সন্তুষ্ট হওয়া।

২. এর আমুল পরিবর্তন করে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা না করা।

৩. প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা অনুকূল মনে করে তা থেকে নিজের ফায়দা হাসিলের চেষ্টা।

৪. কিছু লোক চেষ্টা করলেও তা আরেকটি ফাসেকী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করে।

খ. খালেস-নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের পরিচয়ঃ

১. যে জীবন ব্যবস্থার প্রতি ঈমান আনবে, তা জীবন-বিধান ও আইন হিসাবে চালু করবে।

২. এই পথে যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক, আমাদের প্রাণ ব্যকুল ও কাতর হয়ে উঠবে।

৩. প্রকৃত ঈমান তার বিকাশে সামান্যতম বাধা বরদাশত করবে না।

গ. সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণাঃ

১.কিছু দেশে ইসলামের কিছূ আইন-নীতি অক্ষতিকর মনে করে অনুগ্রহ করে চলতে দেয়।

২. সমগ্র জীবন দ্বীনের বিপরীত নিয়মে চলে, এতে ঈমানের ক্ষতি হয় না বলে মনে করে।

৩. এমনকি সেখানে কুফুরী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্থায়ী নিয়তি মনে করা হয়।

ঘ. বান্দাকে মুনাফেকী হতে পবিত্র করাই আমাদের লক্ষ্য

১. খোদার বন্দেগীর সঠিক ধারণা অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টা চালাব।

২. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি পূর্ণ জীবনে অনুসরণ করব।

৩. জীবনের ক্ষুদ্র কাজেও বাতিলের প্রভাব বরদাশত করবো না।

কর্মীর বৈসাদৃশ্যের তত্ত্বকথা

ক. কর্মীয় বৈসাদৃশ্য কাকে বলেঃ

১. কথা ও কাজের গরমিলকে বলে।

২. মুখে ঈমানের দাবী রেখে কাজে তার বিপরীত করাকে।

৩. বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করাকে।

৪. বন্দেগীর বিপরীত কাজ করাকে।

খ. বৈসাদৃশ্য, অসামঞ্জস্য, মুনাফেকীর ও বহুরুপী কাজের উদাহরণ

১. তাওহীদ, রেসালত, আখেরাত, শরীয়তকে মানার দাবী করে বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য বস্তুবাদী, তাওহীদের বিপরীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার জন্য যাওয়া।

২. ঈমানের দাবী করে খোদার দুশমনদের রচিত আইনে স্থাপিত আদালতের বিচারের উপর নির্ভর করি।

৩. মসজিদে নামাজ আদায় ও বাইরে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নফসের অনুসরণ করি।

৪. একদিকে আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান, অন্যদিকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মুর্তির পুজা করা।

গ. দ্বীন সম্পর্কে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা

১. ঈমান ও ইসলামের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট হবে।

২. তাওহীদ-রেসালতের সাক্ষ্য ও নামাজ-রোজাসহ কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনেই যথেষ্ট।

৩. বাস্তব জীবনে দ্বীন ও ঈমান বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করলে ঈমানের কোন ক্ষতি নেই।

ঘ. যার ফলশ্রুতিতে ক্ষতি হচ্ছে

১. ফাসেকী, কাফেরী, পাপ, নাফরমানী ও যুলুমকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

২. ঈমানের বিপরীতে মুসলমানরা সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে-তা বুঝার জ্ঞানটুকু নেই। উদাহরণঃ লবনের খনিতে বিচ্ছিন্নভাবে যতলোক প্রবেশ করবে তারা লবনের সাথে মিশে যাবে।

ঙ. আমাদের আহবান

১. সম্পূর্ণ একমুখী নীতি-আদর্শের অনুসারী হয়ে দ্বীনের বিপরীত কাজ-কর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

২. ঈমানের দাবীকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও তা পূরণ করার আহবান।

নেতৃত্বের মৌলিক পরিবর্তনের আবশ্যকথা

ক. ঈমানের দাবী / মুমীনের অনিবার্য দাবী- বর্তমান জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করা

১. যিনি নিজকে খোদার দাসত্বের নিকট সোপর্দ করেন।

২. জীবনে কোন প্রকার মুনাফেকী ও বৈসাদৃশ্যের ফাঁক না রাখেন।
৩. একনিষ্ঠ মুমীন হওয়ার চেষ্টা করেন-তার উপর।

খ. বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত

১. কুফরীর উপর-পুজিবাদ বা বস্তুবাদ =আমেরিকা
২. নাস্তিকতার উপর-কমিউনিজম ও সেকুলারিজম =তুরষ্ক
৩. শিরকের উপর-রাজতন্ত্র-সৌদি আরব =কুয়েত
৪. ফাসেকীর উপর-জাতীয়তাবাদ
৫. অসচ্চরিত্রতার উপর-গনতন্ত্র =বাংলাদেশ

গ. নেতৃত্বের মৌলিক পরিবর্তন কেন দরকারঃ এ কাজ না করলে ক্ষতি ৩টি

১. দুনিয়াতে খাঁটি মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।
২. খোদার দাসত্বকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
৩. ভবিষ্যত বংশধরদের ইসলামের উপর বিশ্বাসী রাখা সম্ভব নয়।

ঘ. মুমীনের কর্তব্য

১. খোদার সন্তোষ অর্জন,
২. ধবংস ও বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা,
৩. শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পৌছতে বাধাঃ- প্রতিষ্ঠিত অসৎ নেতৃত্ব।

ঙ. কেন বিশ্বে অশান্তি-যুলুম বৃদ্ধি পায়ঃ বিবেকের মতামত কি?

১. কারণঃ বিশ্বের নেতারা অসৎ, ফাসেক, ফাজির, খোদাদ্রোহী, শয়তানের দাসানুদাসগণ।
২. ফলাফলঃ যুলুম, নির্যাতন, অশান্তি, বিপর্যয় ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে।

চ. মুসলমানের অপরিহার্য কাজঃ

১. পথভ্রষ্ট নেতৃত্ব খতম করা।

২. কুফর ও শিরকের প্রধান্য বিচুর্ণ করা।

৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনা করা।

নেতৃত্ব পরিবর্তন কিরূপে হবে

ক. বিশ্ব পরিচালনার জন্য কি দরকার

১. যোগ্যতাঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান

২. শক্তিঃ আধুনিক প্রযুক্তি সমুহ

৩. বৈশিষ্ট্যঃ মৌলিক মানবীয় গুণাবলী

খ. যাদের হাতে আল্লাহ নেতৃত্ব দেবেন তাদের গুণাবলী ৪টি

১. **ঈমানঃ** যাদের খাটি ঈমান আছে

২. **সততাঃ** যারা প্রকৃতভাবে সৎ

৩. **মানবিক যোগ্যতাঃ** যাদের দেশ পরিচালনার অপরিহার্য গুণাবলী আছে।

৪. **শক্তিঃ** যাদের শক্তি ও ক্ষমতা কাফেরদের চেয়ে বেশী আছে।-(নূর-৫৫নং)

আমাদের উদ্দেশ্যঃ ২টি

১. দল গঠনঃ ঈমান ও সৎ লোকদের একটি দল গঠন করা। -আলে ইমরান-১০৩

২. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাঃ দুনিয়ার নেতৃত্ব কাফেরদের হাত থেকে সৎ ও ঈমানদারদের হাতে সোপর্দ করা তাওবা ৩৩, ফাতাহ-২৮, সফ-৯

ঘ. আমাদের দাওয়াতের মুল আবেদনঃ

১. ঈমানদার ও সৎ লোকদের নিয়ে দল গঠন

২. নিষ্ঠাবান ইসলামের অনুসারী হওয়া

৩. তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত চরিত্র হবে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ

৪. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী হবে

বিরুদ্ধতা ও উহার কারণ

ক. কাদের থেকে বিরোধীতা আসে

১. **মুসলমানঃ** সর্বপ্রথম দাওয়াতে বিরোধীতা আসে মুসলমানদের পক্ষ থেকে।

২. **দ্বীনদারঃ** আবার তাও মুসলমানদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তারাই আগে বাধা দেয়।

৩. **ইসলামী দলঃ** তার মধ্যেও আবার বেশী তৎপর ধর্মপন্থী দলগুলো।

খ. আমাদের দাওয়াত সম্পর্কে অমুসলিমদের মন্তব্য

১. অমুসলিমরা আজ পর্যন্ত বিরোধীতার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয় নাই।

২. ইসলাম সম্পর্কে একজন হিন্দু, শিখ ও ইংরেজও সত্য নয় একথা বলে নাই।

৩. ইহার বিরোধীতা করার প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ করে নাই।

৪. তারা একথাও বলেছে-যদি দেশে ইসলামের দাওয়াত আগেই পেশ করা হত এবং মুসলমানরা যদি তা কায়েম করার চেষ্টা করতো তবে দেশের অবস্থা ভিন্নরূপ হত।

গ. বিরোধীতার ধরণ

১. আমাদেরকে কেউ সম্মুখ দিক থেকে আক্রমন করতে পারে না-

২. তাই তারা পিছন দিক থেকে বিভিন্নভাবে আক্রমন করে বলেঃ

ঘ. দাওয়াত ঠিক আছে, তবে সমস্যা আছে-

১. দায়ীদের মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি আছে।

২. এই কাজের জন্য সাহাবীদের মত লোক প্রয়োজন।

৩. এই যুগে এই দাওয়াত চলার মত নয়, ইহা অচল মতবাদ।

৪. মুসলমানদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে এ দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না

ঙ. বিরোধীতাকারীদের পরিচয়

১. সর্ব প্রথমে যারা বাধা দিবে- পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব।

২. ধার্মিক ও মুত্তাকীরা-যাদের কপালে সিজদার চিহ্ন পড়ে গেছে।

৩. যারা ২৪ ঘন্টা ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা করে তারাও বিরোধীতা করতে সংকোচ করে না।

৪. তাদের পুত্র-ভ্রাতা কিংবা আত্মীয়দের আন্দোলনে যোগদান আদৌ সহ্য করতে পারে না।

চ. বিরোধীতার পরিবর্তে পুষ্প ও প্রশংসা আসত যদি আমরা

১. দাওয়াতকে নিছক একটি জ্ঞান-গবেষণা মূলক আন্দোলন হিসাবে পেশ করতাম।

২. এই উদ্দেশ্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে লোকদের আহবান না জানাইতাম।

ছ. নবী-রাসুলদের আন্দোলনের বিরোধীতার কারণ

১. কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের বিরোধীতা

২. শিরকের ভিত্তিতে স্থাপিত জীবন/সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে খালিস তাওহীদের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করার কারণে তারা তা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না।

৩. বংশীয় প্রথা, আত্ম গৌরব, আভিজাত্য, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে তাওহীদের ভিত্তিতে জাতি গঠন করার আহবান জানানোর কারণে।

৪. অর্থনৈতিক ও পারিবারিক স্বার্থ-পরতা ও লোভ-লালসার প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নৈতিক চরিত্রের মূলনীতি সমুহকে বাস্তব জীবনের ভিত্তি হিসাবে স্থাপিত করতে বলার কারণে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এই লক্ষ্যে একটি আন্দোলনের মাধ্যমে লোকদের সংঘবদ্ধ করে দেশের তাহযীব তামাদ্দুন ও নৈতিকতাকে আদর্শ দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা সাধনা করেছেন।

জ. বাতিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুসলমানদের সমঝোতার ধরণ

১. মুসলমানরা বাতিল ব্যবস্থার সাথে সমঝোতার ফলে তাদের উপর বিরোধীতা আসে নাই।

২. এই সমঝোতায় বৈষয়িক ও ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা ছিল।

৩. পরহেজগারীর ধুম পড়া লোক পযন্ত বাতিল সমঝোতার সাথে জড়িত।

৪. বাতিল মতবাদের অধীনে তাকওয়া, ইবাদাতসহ কয়েকটি অনুষ্ঠান পালনেই যথেষ্ট মনে করা।

৫. বহু আধ্যাত্মিক লোকের বাতিলের সাথে সমঝোতার ফলে আধ্যাতিকতার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই

৬. কুফর, জাহেলিয়াত, ফাসেকী ও ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ ও ক্রুটি বর্ণনা করে মুখে সাহাবা যুগের মনোমুগ্ধকর চিত্র অংকন করা ইসলামের কর্তব্য পালনে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

৭. আত্মীয়-স্বজন, আগামীদেরকে বাতিল সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাখা সম্পূর্ণ হালাল

ঝ. আমাদের মারাত্মক অপরাধ কি/কেন বিরোধীতা করা হচ্ছে

১. বাতিলের সাথে সকল সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করতে বলছি।

২. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের অনুসরণ করতে আহবান জানাচ্ছি।

৩. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল, সময়-শ্রম উৎসর্গ করে চেষ্টা সাধনা করার আহবান জানাচ্ছি।

ঞ. আমাদের দাওয়াতকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হলে তাকে যে কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে-

১. স্বার্থের কুরবানী বরদাশত করে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। অথবা

২. স্বীকার করার পর মনের দূর্বলতার দোহাই দিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে হবে

ট. এই পথ অবলম্বন করা সহজ নয়ঃ কারণ-এতে

১. পরকালের গ্যারান্টি নষ্ট হয়ে যাবে।

২. আধ্যাত্বিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে।

ঠ. এই জন্য বড় একটি দল তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করে

১. আমদের দাওয়াত ও আন্দোলনকে ভুল বলতে পারে না

২. সত্যতা স্বীকার করলেও মুলনীতিকে বাদ দিয়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির বিষেধাগার করে ঘোলাটে করে আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকে।

ড. পরিণামঃ তারা যুক্তি দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও খোদার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

আমাদের কর্মনীতি

ক. আমাদের র্কর্মনীতির উৎস

১. কুরআন

২. হাদিস এবং

৩. নবী-রাসুলদের কর্মনীতি

খ. যারা দাওয়াত গ্রহণ করে তাদের প্রতি কর্মনীতি/আহবান

১. খোদার দাসত্ব অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলতে বলি।

২. কাজে নিজের ঐকান্তিকতার পরিচয় দিতে বলি।

৩. ঈমানের বিপরীত কাজ হতে নিজকে পবিত্র রাখতে বলি।

গ. আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে কর্মনীতি ত্যাগ করতে হবে

১. বড় হওয়ার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের গগণচুম্বি স্বপ্ন-প্রাসাদ ধুলিস্যাৎ করতে হয়।

২. অবৈধ পথে অর্জন করা ধন-সম্পদ ত্যাগ করে সর্বহারা হতে হয়।

৩. জীবিকা নির্বাহের শরীয়ত বিরোধী পথ ত্যাগ ও পবিত্র পন্থা গ্রহণ করা, তা যতই নিকৃষ্ট হোক।

ঘ. উপরোক্ত কর্মনীতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাথমিক যে অগ্নি পরীক্ষা/বাঁধা/সমস্যা আসে

১. প্রথমে পিতা-মাতা ও নিকট আত্বীয় স্বজন, তার ঈমানের সাথে দ্বন্ধে লিপ্ত হয়।

২. অনেক মানুষের মায়া মুহাব্বত ও স্নেহ নীড় বোলতার বাসায় পরিণত হয়।

ঙ. প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে যে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়

১. যে তাকওয়া ফিকাহ শাস্ত্রের মান দন্ডের উত্তীর্ণ নয়।

২. যে তাকওয়া খানকা শরীফের মানদন্ডে অসম্পূর্ণ।

৩. কিন্তু সে তাকওয়া বিশ্ব পরিচালনার গুরু দায়িত্ব ও আমানাতের দুর্বহ ভার বহন করার মত।

৪. খানকার তাকওয়া একশত ভাগের এক ভাগও বহন করার মত নয়।

চ. দ্বিতীয় দায়িত্ব: নিকটবর্তী পরিবেশে সকল লোকদের মধ্যে দাওয়াত বিকীর্ণ করা।

ছ. দাওয়াতের ফলাফল বা লাভ ২টি

১. দাওয়াতের মাধ্যমে জীবনে ঈমান বিরোধী ভুলত্রুটি থেকে পরিশুদ্ধ করার অবকাশ পায়।

২. দাওয়াতের ফলে নিজের মধ্যে অনেক গুণ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।

জ. যে সব দিক হতে বিপদ/সমস্যা আসতে পারে

১. প্রথমে হতাশা ব্যাঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২. অপমানকর উক্তি ও ভর্ৎসনা করা।

৩. মুর্খতা মুলক কার্য দ্বারা অসম্মান করা।

৪. নানা প্রকার অভিযোগ ও দোষারোপ করা।

৫. ফেতনায় জড়ানোর উপায় অবলম্বন করা।

৬. ঘর হতে বিতাড়িত করা ও আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৭. তার জীবন দুর্বিসহ করা।

ঝ. এ সব বিপদ মসিবতে কর্মীর মধ্যে যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়

১. সাহস হারা হয়ে সত্যের আন্দোলন থেকে বিরত থাকে না।

২. বাতিলের সামনে আত্মসমর্পন করে না।

৩. বিক্ষুদ্ধ হয়ে বিবেক-বুদ্ধি হারায় না।

৪. বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, বুদ্ধিমত্তা, নমনীয় দৃঢ়তা, স্থিরতা, সততা, পরহেজগারীর অধিকারী হওয়া

৫. একনিষ্ঠ মন নিয়ে নিজ আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকে।

৬. পরিবেশকে অনুকুল করার অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালায়।

ঞ. আদর্শ প্রচারে কুরআনে উপস্থাপিত কর্মীর কর্মনীতি

১. উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত উপস্থাপন করা।

২. স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দ্বীনের মুলনীতির ভিত্তিতে বাস্তব জীবনের দাওয়াত পেশ করা।

৩. সাধ্যাতীত খোরাক দান না করা।

৪. খুটিনাটি বিষয় পেশ না করা ও অবৈজ্ঞানিক কাজ করতে নিষেধ করা।

৫. মৌলিক দোষ-ত্রুটি দুর করার আগে বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি দুর করার চেষ্টা করা।

৬. অবজ্ঞা মিশ্রিত ব্যবহার না করা।

৭. মন্দের বিপরীতে উত্তম ব্যবহার।

৮. অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে ধৈর্য্য ধারণ করা।

৯. অর্থহীন কথাবার্তা উপেক্ষা করা।

ট. যে কর্মনীতির আলোকে লোকদেরকে আন্দোলনে টানা যায়

১. রিয়া ও প্রদর্শন মুলক কাজ হতে বিরত থাকা।

২. নিজেদের কীর্তি-কলাপ গৌরবের সহিত লোকদের সামনে পেশ না করা।

৩. সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা ও তার কাছে ফলাফল আশা করা।

৪. মনের মধ্যে সর্বদা আল্লাহর ভয় থাকা।

৫. তড়িৎ ফলাফল না আসলে কৃত্রিম ও প্রদর্শন মুলক কর্মনীতি গ্রহণ না করা।

ঠ. আমাদের রাজনৈতিক কর্মনীতি

১. বাতিল শাসন ব্যবস্থার আইন-আদালতের সাহায্য গ্রহণ করবো না।

২. জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষার জন্য বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করবো না।

৩. যারা এই সীমা লংঘন করবে তাদের জামায়াতের মধ্যে থাকতে দেয়া হবে না।

৪. যারা স্বার্থের-আত্মীয়তা রক্ষার জন্য মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ে জামায়াতে তার স্থান নেই।

ড. আমাদের কর্মনীতির যুক্তিকতা ও স্বার্থকতা ৪টি

প্রথমতঃ আমরা একটি আদর্শবাদী জামায়াত কিনা তা প্রমাণ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ সদস্যদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার সন্দেহাতীত মানদন্ড।

তৃতীয়তঃ সদস্যরা আইনের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজের সাথে সম্মপর্ক করবে।

চতুর্থতঃ সমাজে নৈতিক ও বাস্তব অবস্থা উলংগ করে দেখা সম্ভব হয়। ধর্মের আবরণে লুকায়িতদের চরিত্র ফুটে উঠবে।

ঢ. শেষকথাঃ

আমাদের কর্মনীতিকে যাচাই করার আহবান

১. আমাদের কর্মনীতি কি ধরনের,

২. মানুষকে কোন দিকে ডাকছি এবং সেই দাওয়াত কতখানি সত্য,

৩. কুরআন ও হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য আছে কি না,

৪. বর্তমান সমাজের রোগ প্রতিষেধক হিসাবে বাতিল মতবাদ নির্মূল করার মত কি না।

আলেম ও পীর সাহেবদের দোহাই

ক. আলেম ও পীর সাহেবদের প্রতি প্রশ্ন/ জিজ্ঞাসা

১. বড় আলিম ও পীর সাহেবরা কি দ্বীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল নহেন ?

২. জামায়াত ইসলামের যে রূপ প্রচার করে থাকে, তারা কি তা বুঝতে পারে নাই।

৩. তাদেরকে বার বার বলা সত্ত্বেও তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নহে- তার কারণ কি।

খ. এই প্রশ্নের উত্তর

১. আমি (মওদুদী) দ্বীন-ইসলামকে বর্তমান ও অতীত ব্যক্তিদের থেকে বুঝতে চেষ্টা করি নাই।

২. ইসলামকে কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ থেকে বুঝার চেষ্টা করেছি।

৩. দ্বীন আমার ও ইমানদারের নিকট কী দাবী করে, তা জানার জন্য কোন বুজুর্গ ব্যক্তি কি করেন/বলেন-সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করি নাই।

৪. বরং আমি এক্ষেত্রে কুরআন ও নবী-রাসুলের কর্মনীতি বুঝার চেষ্টা করেছি।

গ. আলিম ও পীর সাহেবদের প্রতি আমার আহবান

১. গৃহীত কর্মনীতি কুরআনের নির্দেশ ও নবীদের কার্যকলাপ হতে প্রমানিত হয় কিনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা বিচার করুন।

২. আপনারা কুরআন ও সুন্নাহ হতে জ্ঞান লাভ করতে প্রস্তুত থাকুন।

৩. আপনারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করে আমার সাথে মিলিত হোন।

৪. আমাদের দাওয়াতে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত কিছু থাকলে তা প্রমাণিত করুন।

৫. কুরআন-সুন্নাহ হতে সরে গেছি প্রমাণিত হলে সত্য গ্রহণে মুহুর্ত বিলম্ব করব না।

৬. কিন্তু হক ও বাতিলের প্রমাণ করার জন্য যদি কুরআন সুন্নাহ ব্যাতীত ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করেন, তা আপনাদের ইচ্ছাধীন।

দরবেশীয় বিদ্রুপ

ক. অনেকের অভিযোগ হলো

১. জামায়াতে ইসলামী কতগুলো দরবেশ ও দুনিয়া ত্যাগী লোকদের দল।

২. পৃথিবীর বাস্তবতা ও রাজনীতি থেকে তারা অনেক দূরে।
৩. মুসলমানদের বর্তমান সংকটপূর্ণ সময়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা তাদের নাই।
৪. যাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার দিকে নজর বেশী, তারা এ আন্দোলনে যোগদিতে পারে না

খ. তাদের প্রতি উত্তর হল

- বর্তমান রাজনীতিবীদরা স্থুলদৃষ্টি নিয়ে মাঠে নেমেছেন।
- তারা শুধু রাজনৈতিক সমস্যা ও বাহ্যিক রদ-বদলকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।
- কিন্তু রাজনীতির প্রাসাদ যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাতে তাদের দৃষ্টি এখনো পৌছে নাই।

গ. বর্তমান (ভারতের) রাজনৈতিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করার কারণ হচ্ছে
১. সমাজের নৈতিক চরিত্র, বিশ্বাস, তাহযীব যে ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল তা দুর্বল হয়ে পড়ে পথভ্রষ্ট ইঙরেজ্ ১টি জাতি (ইংরেজরা) সহস্র মাইল দূর থেকে এসে দেশকে পরাভূত করে।
২. মুসলমানদের এই পরাধীনতা ও দূর্বলতার সুযোগে তাদের প্রতিবেশী জাতি শক্তিশালী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করে। তাই ঘরের শত্রুও বাইরের শত্রুকে মুকাবেলা করা জটিল হয়ে পড়ে।

ঘ. বর্তমান বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ
১. নিজেদের নৈতিকতা, তাহযীব, অর্থনীতি, রাজনীতির ভিত্তি রেখেছে খোদাদ্রোহী শক্তির উপর
২. ফাসেকী ও কুফুরী ব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
৩. আমার (মওদুদী) দৃষ্টিতে-মুলতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এই রাজনীতি একেবারেই অর্থহীন।

ঙ. বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের সমস্যা-জটিলতার সমাধান হচ্ছে

১. তার বিধানকে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা।

২. পৃথিবীর কর্তৃত্ব খোদাদ্রোহী, কাফির, ফাসিকদের থেকে নেকবান্দাদের হাতে তুলে দেয়া।

৩. সকলে মিলে খোদার দাসত্ব করা।

চ. আমরা কি রকম দল গঠন করতে চাই

১. যারা তাকওয়ার দিক থেকে সমাজের সাধারণ পরহেজগারদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হবে।

২. বিশ্ব পরিচালনার যোগ্যতা-দক্ষতার দিক দিয়ে বর্তমান লোকদের থেকে বেশী অগ্রসর হবে

ছ. বর্তমানে পরহেজগারী মনে করা হয় ঘরের কোণায় বসে বাস্তব জগতের কাজ কর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করাকে।

জ. বিপর্যয় সংশোধনের উপায় হচ্ছে

১. খোদার নেক বান্দাদের একটি সুসংবদ্ধ জামায়াত গঠন।

২. দলের প্রত্যেকটি লোক খোদাভীরু, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বাস ভাজন হবে।

৩. খোদার মনোনীত চরিত্র ও গুণাবলীতে ভূষিত হবে।

৪. সে সংঙ্গে দুনিয়ার লোকদের পরাজিত করার মত বিশ্ব পরিচালনার যোগ্যতাও সর্বাধিক হবে >- আমাদের দৃষ্টিতে ইহা অপেক্ষা বড় রাজনীতি আর হতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের প্রতি মাওলানা মওদুদীর উপদেশ

১. জেনে বুঝে আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করুন এবং এই গুরুদায়িত্ব পালন করুন।

২. দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো অনুধাবন করে খুটিনাটি বিষয় গুলো পরিত্যাগ করে চলুন।

৩. অনেক কর্মীরা আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মতবাদ বুঝেছে, কিন্তু কর্মনীতি আদৌ বুঝে নাই। তাই কর্মনীতিও ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

৪. স্থুলদর্শিতা, প্রদর্শন মুলক মনোবৃত্তি এবং দ্রুত ফলাফল পাওয়ার মানসিকতা পরিহার করুন।

৫. দাওয়াত ও প্রচারণার ক্ষেত্রে নির্মমতা ও কঠোরতা পরিহার করে সহজ ও সরলভাবে যুক্তির মাধ্যমে দাওয়াত উপস্থাপন করুন।

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল বাকারা: ২১৪, আনকাবুত: ১,২,৩ পৃষ্ঠা-৩৯৫

ইমানি পরীক্ষা সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত, ৩৯৬

মাসয়ালা: হাজ ও নামাজ (পৃষ্ঠা-২০) সংক্রান্ত , পৃষ্ঠা- ৩৯৬

অনুশীলনী -১৯(অক্টোবর-২য় সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী -সূরা হুজুরাত ২য় রুকু, ১-১৩ নং আয়াত:-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٤

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخۡرُجَ إِلَيۡهِمۡ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا
بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦
وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ
وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ٧
فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعۡمَةٗۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٨
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن
فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩
إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ
تُرۡحَمُونَ ١٠
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ
وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا
تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ
فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۖ وَلَا
تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

☞বঙ্গানুবাদঃ

১. মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের চেয়ে অগ্রগামী হয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

২. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের আওয়াজ রাসূলের আওয়াজের চেয়ে উচু করোনা এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলোনা যেরুপ তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে; তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সে সব লোক আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

৪. হে নবী, যারা আপনাকে ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. যদি তারা আপনার বের হয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারন করত তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৬. হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

৭. ভালো করে জেনে রাখ আল্লাহর রাসূল তোমাদের মাঝে রয়েছেন। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তবে তোমরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেণ। পক্ষান্তরে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃনিত করে দিয়েছেন।

৮. আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী। আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।

৯. যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফ কারীদেরকে পছন্দ করেন।

১০. মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

১১. মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।

১২. মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৩. হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

☞**নামকরণঃ** ৪র্থ আয়াত থেকে গৃহীত।

☞**নাযিল হওয়ার সময়কালঃ** বিভিন্ন বর্ণনা ও সুরার বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় এ সুরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্র নাযিল হওয়া হুকুম আহকাম ও নির্দেশ সমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তু সাদৃশ্যের কারনে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে।

৪র্থ আয়াত সর্ম্পকে ঘটনা

একবার বনী তামিম গোত্রের কিছু লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রা:) রা'কা ইবনে হাকিমের নাম এবং হযরত উমর (রা:) আকরা ইবনে হাফসের নাম প্রস্তাব করেন। হযরত আবু বকর (রা:) এবং হযরত উমর (রা:) এর মধ্যে চলমান এ আলোচনা এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচু হয়ে যায় (বুখারী)।

হিজরী ৯ম সন এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়। আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ৬টি ঘটনা বর্ণিত আছে। সব ঘটনা নির্ভুল।

৬ষ্ঠ আয়াত সম্পর্কে ঘটনাঃ

মুসনাদে আহমাদের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর

বনী মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে মেরাব ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। তিনি

যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলেন এবং তারা গোত্রে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের যাকাত আদায় করে জমা করে রাখবেন বললেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একটি নিদিষ্ট তারিখে যাকাতের অর্থ নেবার জন্য কোন দুত পাঠাতে বললেন। কিন্তু নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে গেলেও দুতের দেখা না পেয়ে হারেস আশংকা করলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন কারনে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং একথা তিনি ইসলাম গ্রহনকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে প্রকাশ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সবাই মিলে দেখা করার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রাসূল নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা কে প্রেরণ করলেও তিনি পথিমধ্যে ধারনা করেন এই গোত্রের লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্রুতা আছে। তাকে একা পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেন তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। অত:পর তা জানতে পারে হারেস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেন তিনি ওলীদকে দেখেনইনি।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে - ওলীদ ইবনে ওকবা (রা:) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করে তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারনে তাকে হত্যা করতে আসছে। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে এ ধারনা ব্যক্ত করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালিদ ইবনে ওলীদ কে ঘটনা পর্যবেক্ষনের নির্দেশ দিলেন। তিনি ফিরে এসে সংবাদ দিলেন তারা ঈমানের উপর অটল রয়েছে/যাকাত দিতে প্রস্তুত।

ওলীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

তাই এটি স্পষ্ট যে এ যুগের বেশীর ভাগ অংশই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাজিলকৃত।

☞**আলোচ্য বিষয়ঃ**

এ সুরার বিষয়বস্তু হলো মুসলমানদেরকে এমন আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরন শিক্ষা দেয়া যা তাদের ঈমানসুলভ স্বভাব-চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

- ○ প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।
- ○ এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে প্রতিটি খবর বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী কর্মকান্ড করে বসা ঠিক নয়।
- ○ মুসলমানদের দুটি দল যদি কোন সময় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি।

মুসলমানদেরকে কিছু খারাপ বিষয় থেকে আত্নরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

★একে অপরকে ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা

★বদনাম উপহাস করা

★উপনামে ডাকা

★গোপন বিষয় খোজাখুজি

সবশেষে বলা হয়েছে- ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয় বরং সরল মনে আল্লাহ ও রাসূলকে মানা, কার্যত অনুগত থাকা এবং কুরবানী।

১. প্রথম আদবঃ আল্লাহ ও রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী না হওয়া। এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী।

নিজের মতামত ও ধ্যান ধারনাকে আল্লাহ রাসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারেনা এবং বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষন করতে পারেনা। সুরা আহযাবের ৩৬ আয়াতে এরুপ নির্দেশ আল্লাহ ও তার রাসূল যে বিষয়ে ফয়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আলাদা কোন ফয়সালা করার ইখতিয়ার কোন ঈমানদারের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না।

এ নির্দেশটি শুধু ব্যক্তিগত নয় বরং মুসলমানদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য (সরকার, বিচারালয়, পার্লামেন্ট) সহীহ সনদে বর্ণিত

মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের বিচারক করে পাঠানোর সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?" তিনি বললেন- "আল্লাহ কিতাব অনুসারে।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন যদি কিতাবে না পাওয়া যায় তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ রাসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন যদি সেখানে না পাও তিনি জবাব দিলেন তাহলে আমি নিজে ইজতেহাদ করব। তাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই হাদীসের স্থান। এবং এক্ষেত্রে নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিলে বোঝাপড়া হবে আল্লাহর সাথে।

২. যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মজলিশে যাতায়াত করত তাদেরকে এ আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে তার সাথে কথা বলার সময় যেন তার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এক্ষেত্রে যখনই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আলোচনা করা হয় এবং তার হাদীস বর্ণনা করা হয় তখন পরবর্তী সময়ের লোকদের অনুরুপে শিষ্টতা বজায় রাখা দরকার এছাড়া নিজের চাইতে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সাথে কথা বলার শিষ্টতা এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ইসলামে রাসূলের ব্যক্তিসত্ত্বার মর্যাদা এ আয়াত থেকে বোঝা যায়। রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতায় সারা জীবনের সঞ্চিত পুজি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা না করা মূলত আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার পর্যায়ভুক্ত।

৩. অর্থাৎ যে হৃদয়ে রাসূলের মর্যাদা নেই সে হৃদয়ে তাকওয়া থাকতে পারেনা। যারা বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা রাসূলের প্রতি তাদের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করে।

৪. আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারন ভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি তাদের অনেকেই সময়ে সময়ে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য হাজির হতো তার হুজরার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাকে ডাকতো। স্বভাবগত কারনেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন।

৫. অর্থাৎ চিৎকার না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে রাসূল নিজেই এসে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন। এ আয়াতে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

৬. অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এটি ওলীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবা মুআ'ইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হারেস ইবনে মেরার (উম্মুল মুমিনিন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে রাসূলের দরবারে হাযির হন।

- হযরত উম্মে সালামা রা. বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন সংবাদকে কেন্দ্র করে এত বড় ভুল সংঘটিত হতে যাচ্ছিল সে মুহূর্তে আল্লাহ এ মৌলিক নির্দেশ দিলেন যে, যখন এমন কোন খবর পাওয়া যাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে বার্তাবাহক কেমন ব্যক্তি তা যাচাই করতে হবে।
- যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে বার্তাবাহক নির্ভরযোগ্য নয় (ফাসেক) তবে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী কাজ করার পূর্বে তা যাচাই করা দরকার।

- যার চরিত্র ও কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোন, ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়।
- হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এ প্রেক্ষিতে 'জারহ ও তা'দীল' এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন।
- যাতে যাদের মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌছেছিল তাদের অবস্থা যাচাই করা যায়।
- তাছাড়া সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে নীতি হলো এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য হবেনা যা দ্বারা শরীয়তের কোন নির্দেশ প্রমানিত হয় কিংবা কোন মানুষের উপর কোন অধিকার বর্তায়।
- তবে সাধারন পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবর অনুসন্ধান এবং সংবাদাতার নির্ভরযোগ্যতা জরুরী নয়। কারন আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ খবর বলা হয়েছে।

৭. বনু মুসতালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে উকবার খবরের ভিত্তিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহন করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু কিছু সাহাবী তৎক্ষনাৎ তাদের বিরুদ্ধে আক্রমন করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পীড়াপীড়ি করছিল। এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত।

৮. অর্থাৎ কতিপয় লোক তাদের অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত জানালেও মুসলমানদের গোটা জামায়াত ভুল করেনি। মুমিনদের সঠিক পথের উপর কায়েম থাকার কারন হচ্ছে আল্লাহ তার দয়া ও মেহেরবানীতে ঈমানী আচরনকে তাদের জন্য প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং নাফরমানী আচরনকে ঘৃনিত করে দিয়েছেন।

- আয়াতের দুটি অংশে দুটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। "যারা বনু মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়া করছিল তাদের কথা বলা হয়েছে।"

- “কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেনি। বরং ঈমানের দাবীর উপর ছিলেন।
- তবে তারা ঈমানের প্রতি অটল ছিলনা একথা বলা হয়নি, বরং শিথিলতার কথা বলা হয়েছে। তাই তিনি (আল্লাহ) প্রথমে এর ভুল ও কুফল তুলে ধরেছেন।

৯. আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী কোন ভাগ বাটোয়ারা নয়। তিনি এ বিরাট নেয়ামত জ্ঞান যুক্তির ভিত্তিতে দান করেন।

☞**ব্যাখ্যাঃ**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো। তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে এগিয়ে যেও না। আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

- لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।

– ঈমানের প্রথম ও মৌলিক দাবী হচ্ছেঃ যে আল্লাহকে নিজের মালিক হিসাবে মানে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতের পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলে তাকে তার এই ঈমানের উপর সত্যবাদীতা প্রমাণ করতে হবে এই ভাবে যে,

ক. নিজ মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে কখনো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে না।

খ. বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারবে না।

গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব সময় আগে দেখে নেবে যে, এই ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ কি।

– لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -" আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রগামী হয়ো না।" মানেঃ

- তার আগে আগে চলবে না।
- পেছনে পেছনে চলো।
- তার আনুগত্য হয়ে থাকো।
- নির্দেশ দাতা হয়োনা, আনুগত্যকারী হও।

- সূরা আহযাবে একই কথা বলা হয়েছে একটু নরম ভাবেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখ কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। (আয়াতঃ ৩৬)

– অর্থাৎ ঈমানদার নিজেদের ব্যাপারে কখনো আপনা থেকে অগ্রগামী হয়ে কোন বিষয় ফায়সালা করবেনা। বরং তার দেখা উচিত যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব বা রাসূলের সুন্নাহতে কি নির্দেশনা রয়েছে।

– এটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক দফা। অগ্রগামী না হওয়ার এই নির্দেশ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, বরং সামাজিক ব্যাপারেও প্রযোজ্য। প্রযোজ্য সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট সব কিছুতে।

– মুয়াজ বিন জাবাল রা.কে যখন ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠানো হয়ে, তখন নবী সা প্রশ্ন করেছিলেনঃ তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেনঃ "আল্লাহর কিতাব অনুসারে" । নবী (সা) বললেনঃ যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হুকুম না পাওয়া যায় তাহলে কোন জিনিসের সাহায্য নেবে? তিনি জবাব দিলেন , আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব। তিনি বললেনঃ যদি সেখানেও কিছু না পাও? তিনি বললেনঃ তাহলে আমি নিজে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে নবী (সা.) তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেনঃ সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন যা তার রসূলের কাছে পছন্দনীয় ।

– মুসলিম বিচারক আর অমুসলিম বিচারকের মধ্যকার মূল পার্থক্য তুলে ধরে এমন বস্তু হচ্ছেঃ নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হিদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম এ দুটি উৎসবের দিকে ফিরে যাওয়া

– আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই যে সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই যে রসূলের সুন্নাত- এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত ।

ব্যক্তির কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দূরের কথা গোটা উম্মতের ইজমাও এ দুটি উৎসের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না ।

– নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত যায়েদের (রা) জন্য হযরত যয়নবের (রা) সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন এবং হযরত যয়নব ও তার আত্মীয়রা তা নামঞ্জুর করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এ পয়গাম দেন তখন হযরত যয়নব (রা) বলেনঃ أنا خير منه "আমি বংশীয় দিক দিয়ে তার থেকে উত্তম" لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش

“আমি অভিজাত কুরাইশ পরিবারের মেয়ে, তাই আমি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।” তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা) এ ধরনের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এর কারণ ছিল এই যে, হযরত যায়েদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আযাদ করা গোলাম ছিলেন এবং হযরত যয়নব ছিলেন তাঁর ফুফু (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব)-এর কণ্যা। এত উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাও আবার যে সে পরিবার নয়, নবীর নিজের ফুফাত বোন এবং তার বিয়ের পয়গাম তিনি দিচ্ছিলেন নিজের আযাদ করা গোলামের সাথে একথা তাদের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। এ অবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত শুনতেই হযরত যয়নব ও তাঁর পরিবারের সবাই নির্দ্বিধায় আনুগত্যের শির নত করেন। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের বিয়ে পড়ান। তিনি নিজে হযরত যায়েদের (রা) পক্ষ থেকে ১০ দীনার ও ৬০ দিরহাম মোহরানা আদায় করেন, কনের কাপড় চোপড় দেন এবং কিছু খাবার দাবারের জিনিসপত্র পাঠান।

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

অর্থাৎঃ এই নির্দেশনার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা কখন এই নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে মুক্ত ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজ মতামতকে অগ্রাধিকার দাও। তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ দেখছেন-তিনি বুঝাপড়া করবেন।

একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু দারদা (রাঃ) কে আবু বকর (রাঃ) এর অগ্রে চলতে দেখে সর্তক করে বললেনঃ তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেনঃ দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সুর্যোদয় ও সুর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরদের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (রুহুল বয়ান)

- **আমরা কি করি?**

ক. আমরা দ্বীনের জন্য লম্বা লম্বা বক্তব্য দেই। কিন্তু আমল করার বিষয় যখন আসে, তখন ভূলে যাই।

খ. আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশনা দেখিনা।

গ. আমরা খুব সামান্য সমস্যায় পড়ে রুখসতের তরিকা গ্রহণ করি।

ঘ. আমরা চাকুরীর জন্য ওয়াস্তা খোঁজি, জরিমানা মাফ করানোর জন্য ওয়াসতা খোঁজি, জাওয়াজাতের কাজ করার জন্য খরচ যা লাগবে, তা সমস্যা নয় অফার দিয়ে ওয়াস্তা খোঁজি।

ঙ. আমরা দ্বীন সম্পর্কে খুব কম জানি। অথচ আমাদের বক্তব্যে তা মনে হয়না।

চ. আমরা বড় বড় মাওলানাদের সমালোচনা করি। মাত্র ২/১টি বাংলা বই পড়ে আমরা মহা পন্ডিত। মনে করিঃ যাহা জানার তা কেবল আমি জানি অথবা আমাদের সংগঠনের লোকে জানে।

ছ. আমরা ফেইসবুক চালাই মন্তব্য করি-আমার সংগঠনের দৃষ্টিভংগী দেখিনা।

জ. সংগঠনের সমালোচনার জবাবে আমি সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সংগঠনে একজন জবাব দেয়ার দায়িত্বে আছেন, তা মনে রাখিনা।

ঝ. আমরা আমাদের বিরোধীদের ১৪ গোষ্ঠী উদ্ধার করি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমীরে জামায়াত বলেছেনঃ আমরা এই সম্পর্কে কোন কথা বলবো না। পক্ষেও না, বিপক্ষেও না।

ঞ. আমরা চলার সময় দায়িত্বশীলকে সামনে দেই না।

ট. দায়িত্বশীল রেখে আমরা মন্তব্য করা শুরু করি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

২. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের আওয়াজ রাসূলের আওয়াজের চেয়ে উচু করোনা এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলোনা যেরুপ তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে; তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

হে মু'মিনগণ! নিজেদের আওয়ায রসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো।

- এ বক্তব্যে মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিসে উঠাবসা ও যাতায়াতের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

- নবীর সাথে সাক্ষাত বা কথাবার্তার সময় নবীর স্টেটাস তথা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

ক. কারো কণ্ঠ যেন নবীর কণ্ঠ থেকে উচ্চ না হয়।

খ. তাকে সাধারণ মানুষের মতো এড্রেস করা যাবেনা।

- নবী এখন নাই। কিন্তু তার মজলিস আছে। তাই যে সব মাহফিলে কুরআন বা হাদীসের আলোচনা হয় তখন সেই সব মাহফিলেও এমনি আদব রক্ষা করতে হবে।

- নবীর অবর্তমানে নবীর কাজ যারা করছেন, তাদের মধ্যে যারা নবীর আন্দোলনের দায়িত্বশীল, তাদের সাথে আচরণ কিভাবে হবে, এই আয়াতে সে হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

- সম্মাণিত লোকের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, তার নসিহত এখানে পাওয়া যায়।

أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ·

-এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।

(হুজরাত ২)

- আয়াতের এই অংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে।

- দুনিয়াতে যত সম্মাণিত লোক হোক, তার সাথে বেয়াদবী যেমন কুফুরী হবে না, তেমনি শাস্তি যোগ্য হবেনা। কিন্তু রাসূলের সাথে বেয়াদবী শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও যা কুফুরী এবং গোনাহ।

- রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অবহেলা, আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অবহেলার পর্যায়ভূক্ত।

- ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের প্রতি অসম্মানও একই পর্যায়ে পড়ে।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ নিচু রাখে, তারা আসলে ঐসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহান বদলা। (হুজরাত ৩)

- মানেঃ

** আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্মানের প্রতি তারাই লক্ষ রাখবে, যারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাস করেছে। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ দিয়েছে যে, তাদের অন্তরে তাকওয়া রয়েছে।

** যে দিলের মাঝে রাসূলের জন্য মর্যাদাবোধ নাই, সে দিলে তাকওয়া নাই।

** রাসূলের সামনে বড় গলায় কথা বলাঃ অন্তরে তাকওয়া না থাকার প্রমাণ।

** দায়িত্বশীলের সামনে বড় গলায় কথা বলাঃ অন্তরে তাকওয়া না থাকার প্রমাণ।

· لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ— তাদের রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

· এ ব্যাপারে একটা কাহিনী আছেঃ একবার বনী তামিম গোত্রের কিছু লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) রা'কা ইবনে হাকিমের নাম এবং হযরত উমর (রাঃ) আকরা ইবনে হাফসের নাম প্রস্তাব করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) এর মধ্যে চলমান এ আলোচনা এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচু হয়ে যায়। (বুখারী)

- **উচ্চ স্বরে কথা না বলা প্রসংগে**

** এ আয়াত নাযিলের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরুপে কথা বলব। (বায়হাকী)

** হযরত উমর (রাঃ) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হতো। (সেহাহ)

** হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কন্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উচু ছিল। এ আয়াত নাযিলের পর তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কন্ঠস্বর নিচু করলেন। (দুররে মনসুর)

** কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব।

** কোন কোন আলেম বলেন তার কবরের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা আদবের খেলাফ। যে মজলিসে হাদীস পাঠ হয় সেখানে হট্টগোল করা বে-আদবী।

** কণ্ঠস্বর উচু করলে আমল বিনষ্ট হবে কেন? সৎকর্ম বিনষ্ট করাঃ ১) কুফরী ২) ঈমান ইচ্ছাধীন কাজ কুফরীও ইচ্ছাধীন কাজ।

** কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে কুফরীর শাস্তি কিভাবে হতে পারে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার বায়ানুল কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন্ রাসূলের কন্ঠ থেকে উচু হলে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে কারন রাসূল কষ্ট পাবেন।

- **আমরা কি করি?**

** দায়িত্বশীলদের যে একটা শরয়ী মর্যাদা আছে, তা আমরা ভূলে যাই।

** বৈঠকে কথা বলা আমার অধিকার মনে করি-তাই যেমন খুশী তেমন বলি।

** আমিরে জামায়াতের নসিহত হচ্ছেঃ আমরা অধিকারের কথা ভূলে যেতে হবে, দায়িত্বের কথা স্মরণে রাখতে হবে।

** আমরা বৈঠকে অনুমতি ছাড়া কথা বলি।
** একজন কথা বলেছে, সাথে সাথে আমি জবাব দেই। অথচ আমাকে জবাব দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়নি।
** বৈঠকে আমরা দুইজন কথা বলি। আমাদেরকে কথা থামাতে হয়।
** দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
** বৈঠকে আপনাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া দায়িত্বশীলের কর্তব্য। সে কর্তব্য উনি পালন না করলে তার জবাবদিহি উনি করবেন। কিন্তু উনার কর্তব্য পালনে আপনি তাকে জোর করতে পারেন না।
** বৈঠকের অধিকাংশের মতামতের আলোকে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু উনি বাধ্য নন। অধিকাংশের মত নয়, এমন সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারও দায়িত্বশীলের রয়েছে। এমন অবস্থায়ও দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতে হবে।
** কোন অবস্থায়ই দায়িত্বশীলের উপরের মুরব্বীয়ানা করা যাবেনা।
** দায়িত্বশীলের সাথে যখন কথা বলবেন, তখন হিসাব করবেনঃ কে কথা বেশী বলেছে। আপনি না দয়িত্বশীল। মনে রাখবেনঃ বলবেন কম, শুনবেন বেশী। আপনার কথা কম হতে হবে, দায়িত্বশীলের কথা বেশী হতে হবে ।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

৪. (হে রাসূল) যারা আপনাকে হুজরার বাহির থেকে ডাকাডাকি করে তাদের বেশীর ভাগ লোকেরই কান্ডজ্ঞান নেই।

এ ব্যাপারে একটা কাহিনী আছেঃ

نزلت هذه الآيات الكريمة، في أناس من الأعراب، الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، [أي: اخرج إلينا]، فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب.

- ইমাম বগাভী (রহঃ) কাতাদাহ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন বনু তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি নীতি থেকে অজ্ঞ। তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ "হে মুহাম্মদ আমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসুন" (মাযহারা)

- সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাদের আলেমদের সাথেও অনুরুপ ব্যবহার করতেন।

- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছে থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম তখন তার গৃহে পৌছে ডাকাডাকি বা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আসতেন তখন আমি তার নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি দেখে বলতেন হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই আমাকে আপনি কড়া নেড়ে সংবাদ দিলেনা কেন। উত্তরে বলতাম-আল্লাহর নির্দেশ তাদের বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন আমি কোনদিন কোন আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেইনি বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব। (রুহুল মা'আনী)

- শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন।

- হে মুহাম্মদ বলে ডাকা নয়।

- আমরা নাম ধরে না ডেকে অন্য ভাবে ডাকবো।

- কারো বাসায় গেলে, উনি বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যাওয়ার আগে ফোন করে যাবেন বা আগে এপোয়েন্টম্যান্ট নিয়ে যাবেন।

-দায়িত্বশীল রোবট নন, তিনিও রক্তে মাংসে মানুষ। তারও ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, চাওয়া পাওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদির জরুরত আছে।

-আমার পাঠচক্র ও মেহমান-উনারা অবাঞ্চিত নন, কিন্তু এই সময়ের জন্য অবাঞ্চিত।

-   এ্যাপোয়েন্টম্যান্ট নিয়ে হোক আর এমনি এমনি যাওয়া হোক, সর্বাবস্তায় আদব হচ্ছেঃ আপনি কারো ঘরে প্রবেশ করতে সালামের মাধ্যমে অনুমতি চাইবেন। ৩বার সালাম দিয়েও উত্তর না পেলে ফিরে আসবেন।

-   আল কুরআনের নির্দেশঃ সূরা নুর ঃ ২৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

-   একজন সাহবীর প্রশ্নঃ মায়ের ঘরে ঢুকার আগে কি অনুমতি লাগবে?
-   মায়ের ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগলে, বোনের ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগবে কিনা?
-   শাশুড়ির ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগলে, শালীর ঘরে ঢুকতে অনুমতি লাগবে কিনা?
-   আপনি দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ দেবেন না। যারা জীবনে ব্যর্থ, তারা অভিযোগ করে। সফল ব্যক্তিরা অভিযোগ না করে শুকরিয়া আদায় করে।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৫. যদি আপনার বের হওয়া পর্যন্ত তারা সবর করে থাকতো, তাহলে সেটা তাদেরই জন্য ভাল হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

-   নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী যারা তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, তারাঃ

** ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা, ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।

** সবসময় নবীর (সা.) সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। কারণ তিনি আল্লাহর কাজে কতটা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি ছিল।

** ক্লান্তিকর ব্যস্ততার ভেতরে কিছু সময় তার আরামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্যও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

** তারা নবীর সাথে দেখা করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতো যখন তিনি ঘরের বাইরেই অবস্থান করতেন।

** তাঁকে মজলিসে না-ও পেতো তাহলে তাঁর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো।

** অত্যাধিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতো না।

- আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হতো যাদের ধারণা ছিলঃ

** ইসলামী আন্দোলন ও মানুষকে সংশোধনের কাজ যারা করেন তাদের কোন সময় বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার নেই।

** রাতের বেলা বা দীনের বেলা যখনই ইচ্ছা তাঁর কাছে এসে হাজির হওয়ার অধিকার তাদের আছে।

** তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তারা আসবে তাদের সাক্ষাত দানের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

- এ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু অজ্ঞ অভদ্র লোকও থাকতো যারা নবীর (সা.) সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোন খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর দেয়ার কষ্টটাও করতো না।

- নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হুজরার চারদিক ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো, সাহাবীগণ হাদীসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

- লোকজনের এ আচরণের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কষ্ট হতো। কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন।

- শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এ অবশিষ্ট কর্মনীতির জন্য তিরস্কার করে লোকজনকে এ নির্দেশনা দান করলেন যে,

** যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাতদানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

· وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

** ভূলের যদি পুনরাবৃত্তি না করা হয়, তবে অতীতের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

** আল্লাহ যে ক্ষমা করবেন, এটা আপনার আমার কৃতিত্ব নয়, বরং তার দয়া।

** অতএব, আমরা দায়িত্বশীলদের সময়সূচীকে বিবেচনায় রাখবো।

** যখন তখন কারো বাসায় যাবো না।

** আগে না জানিয়ে যাবো না।

**** টেলিফোন করার সময় নজর রাখবোঃ**

১. নামাযের সময় কি না?

২. ঘুমের সময় কিনা?

৩. উনি এই সময়ে সাধারণতঃ ব্যস্ত থাকেন কি না?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। (সুরা আল হুজরাত- ৬)

- **এ ব্যাপারে একটা কাহিনী আছেঃ**

*** মুসনাদে আহমাদের বরাত দিয়ে তাফসীর ইবনে কাসীরঃ

** বনী মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে মেরাব ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন।

** তিনি যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলেন এবং তারা গোত্রে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের যাকাত আদায় করে জমা করে রাখবেন বললেন।

** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একটি নিদিষ্ট তারিখে যাকাতের অর্থ নেবার জন্য কোন দুত পাঠাতে বললেন।

** কিন্তু নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে গেলেও দুতের দেখা না পেয়ে হারেস আশংকা করলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কারনে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

** একথা তিনি ইসলাম গ্রহনকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে প্রকাশ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সবাই মিলে দেখা করার ইচ্ছা করলেন।

** এদিকে রাসূল নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা কে প্রেরণ করলেন।

** ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী বনু মুস্তালিক গোত্রে পৌছেন। গোত্রের লোকেরা অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে আসে।

** ওলীদ সন্দেহ করে তারা বোধ হয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে আসছে।

** তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে।

** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে খালিদ ইবনে ওলীদ কে ঘটনা পর্যবেক্ষনের নির্দেশ দিলেন।

** খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। তিনি ফিরে এসে সংবাদ দিলেন তারা ঈমানের উপর অটল রয়েছে এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত। অতঃপর তা জানতে পেরে হারেস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন তিনি ওলীদকে দেখেনইনি।

** ওলীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।তাই এটি স্পষ্ট যে এ যুগের বেশীর ভাগ অংশই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাজিলকৃত।

- **এ আয়াত আমাদেরকে কি শিখালো?**

** বড় ধরণের ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এমন ধরণের খবরের ক্ষেত্রে খবর প্রদানকারী ব্যক্তিকে যাচাই করে দেখতে হবে।

** খবর প্রদানকারী যদি ফাসেক হয়, তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই বুঝা যাবে যে, তার কথা নির্ভর যোগ্য নয়। এমন অবস্থায় প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান করতে হবে।

** শরীয়ার হুকুম হচ্ছেঃ যার চরিত্র ও কর্ম নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সংবাদদাতার সংবাদ গ্রহণ করে কোন ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বৈধ নয়।

** এই নীতির ভিত্তিতে হাদীস সহীহ কি না, তা যাচাই করার জন্য হাদীস বিশারদগন "জারহ ও তা'দীল" নীতি উদ্ভাবন করেন।

** ফকীহরা নীতি গ্রহণ করেছেন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়।

পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। সাধারণ এ খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না।

শিক্ষাঃ

১) ধর্মীয় আলেমদের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর কারন তারা পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী।

- একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু দারদা (রা:) কে আবু বকর (রা:) এর অগ্রে চলতে দেখে সর্তক করে বললেন: তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন: দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সুর্যোদয় ও সুর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরদের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (রুহুল বয়ান)

-

২) উচ্চ স্বরে কথা না বলাঃ

এ আয়াত নাযিলের পর

হযরত আবুবকর (রা:) আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরুপে কথা বলব। (বায়হাকী)

হযরত উমর (রা:) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হতো। (সেহাহ)

হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উচু ছিল। এ আয়াত নাযিলের পর তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নিচু করলেন। (দুররে মনসুর)

কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহ:) বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। কোন কোন আলেম বলেন তার কবরের সামনে উচ্চস্বরে কথা বরা আদবের খেলাফ। যে মজলিসে হাদীস পাঠ হয় সেখানে হট্টগোল করা বে-আদবী।

কণ্ঠস্বর উচু করলে আমল বিনষ্ট হবে কেন?

সৎকর্ম বিনষ্ট করে-

ক) কুফরী খ) ঈমান ইচ্ছাধীন কাজ কুফরীও ইচ্ছাধীন কাজ।

কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে কুফরীর শাস্তি কিভাবে হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার বায়ানুল কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন্‌ রাসূলের কণ্ঠ থেকে উচু হলে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে কারন রাসূল কষ্ট পাবেন।

৩) হুজরার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করাঃ

- ইমাম বগাভী (রহঃ) কাতাদাহ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন বনু তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছির বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি নীতি থেকে অজ্ঞ। তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল।

- "হে মুহাম্মদ আমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসুন" (মাযহারা)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাদের আলেমদের সাথেও অনুরুপ ব্যবহার করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছে থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম তখন তার গৃহে পৌছে ডাকাডাকি বা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আসতেন তখন আমি তার নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি দেখে বলতেন হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই আমাকে আপনি কড়া নেড়ে সংবাদ দিলেনা কেন। উত্তরে বলতাম- আল্লাহর নির্দেশ তাদের বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন আমি কোনদিন কোন আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেইনি বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব। (রুহুল মা'আনী)

আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উৎস হচ্ছেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল। তাই বাকী সব সিদ্ধান্ত হবে সেই উৎসের ভিত্তিতে।

- চলা ফেরায় যেমন দায়িত্বশীলের আগে চলা যাবেনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণেও দায়িত্বশীলের আগে যাওয়া যাবেনা-পাশ কাঠিয়ে যাওয়া যাবে না।

- রাসূলের মজলিসে তথা কুরআন হাদীসের আলোচনা হয় এমন বৈঠককে অথবা বৈঠক চলাকালীন এর আশে পাশে কথা বলা যাবেনা।

- দায়িত্বশীলের সামনে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলা যাবেনা। দায়িত্বশীলের কথার উপরে কথা বলা যাবেনা।

- কারো সাথে দেখা করতে এ্যাপোয়েন্টম্যান্ট নিয়ে দেখা করতে হবে। টেলিফোন করতে সময় জ্ঞান থাকা চাই।

- বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্য ভাল ভাবে যাচাই করে নিতে হবে।

বই নোট: ইসলাম পরিচিতি

মুল বইঃ রিসালাতে দ্বীনিয়াত

লেখক: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

অনুবাদ: সৈয়দ আব্দুল মান্নান

প্রথম প্রকাশ: উর্দু ভাষায় ১৯৩২ সনে

বইটিকে মোট ৭ টি অধ্যায়ে এবং ৫৪ টি উপাধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যেমন:

১. ইসলাম
২. ঈমান ও আনুগত্য
৩. নবুয়াত
৪. ঈমানের বিবরণ
৫. ইবাদাত
৬. দ্বীন ও শরীয়াত
৭. শরীয়াতের বিধি-বিধান

ইসলাম

১. ইসলাম নামকরণ কেন
২. ইসলাম শব্দটির অর্থ
৩. ইসলামের তাৎপর্য

৪. কুফরের তাৎপর্য
৫. কুফরের অনিষ্টকারিতা
৬. ইসলামের কল্যাণ

ঈমান ও আনুগত্য

১. আনুগত্যের জন্য জ্ঞান ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন
২. ঈমানের পরিচয়
৩. জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম
৪. ঈমান বিল-গায়েব

নবুয়াত

১. পয়গাম্বরীর মূলতত্ত্ব
২. পয়গাম্বরের পরিচয়
৩. পয়গাম্বরের আনুগত্য
৪. পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমানের আবশ্যকতা
৫. পয়গাম্বরীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৬. হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুয়াত
৭. নবুয়াতে মুহাম্মাদীর প্রমাণ
৮. খতমে নবুয়াত
৯. খতমে নবুয়াতের প্রমাণ

ঈমানের বিবরণ

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
২. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র অর্থ
৩. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র প্রকৃত তাৎপর্য
৪. মানব জীবনে তাওহীদ বিশ্বাসের প্রভাব
৫. আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
৬. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
৭. আল্লাহর রাসূলদের প্রতি ঈমান

৮. আখেরাতের উপর ঈমান
৯. আখেরাত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা
১০. আখেরাত বিশ্বাসে সত্যতা
১১. কালেমায়ে তাইয়েবা

ইবাদাত

১. ইবাদাতের তাৎপর্য
২. সালাত
৩. সওম
৪. যাকাত
৫. হজ্জ
৬. ইসলামের সহায়তা

দ্বীন ও শরীয়াত

১. দ্বীন ও শরীয়াতের পার্থক্য
২. শরীয়াতের বিধান জানার মাধ্যম
৩. ফিকাহ
৪. তাসাউফ

শরীয়াতের বিধি-বিধান

১. শরীয়াতের নীতি
২. চতুর্বিদ অধিকার
৩. আল্লাহর অধিকার
৪. নিজস্ব অধিকার
৫. আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার
৬. বান্দাদের অধিকার
৭. বিশ্বজনীন ও স্থায়ী বিধান

ইসলাম

ইসলাম নামকরণ কেন?

দুনিয়ায় যত রকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তার জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন, ইয়াহুদী ধর্ম জম্ম নিয়েছিল ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্য। দুনিয়ায় আরো যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদেরর নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্য নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের সংযোগ নেই। বরং 'ইসলাম' শব্দটির অর্থের মধ্যের আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে এ নামে। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যেসব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তারা ছিলেন 'মুসলিম'। এ ধরনের লোক আজো রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

ইসলাম শব্দটির অর্থ

আরবী ভাষায় 'ইসলাম' বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তার বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে 'ইসলাম'।

ইসলামের তাৎপর্য

১. যে শক্তশালী বিধানের অধীনে চলতে হচ্ছে দুনিয়া জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছু, তা হচ্ছে এক মহাশক্তিমান বিধানকর্তার সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ এ বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং সবাই মেনে চলে তাঁরই দেয়া নিয়ম।

যে মানুষ আল্লাহকে চেনে না, যে তাঁকে অস্বীকার করে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং যে আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার করে,

স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ, তার দেহের প্রতিটি অণু ইসলাম মেনে চলে কারণ তার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও গতি সবকিছুই আল্লাহর দেয়া নিয়মের অধীন। এবার আর এক আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখা যাক।

প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের রয়েছে দু'টি দিক। এক দিকে সে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই জীব-জগতের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা রয়েছে। তাকে মেনে চলতে হয় সেই নিয়ম। অপরদিকে, তার রয়েছে জ্ঞানের অধিকার, চিন্তা করে বুঝে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার ছাবার ক্ষমতা তার করায়ত্ত। নিজের ইখতিয়ার অনুযায়ী কোন বিশেষ মতকে সে মেনে চলে, আবার কোন বিশেষ মতকে সে অমান্য করে কোন পদ্ধতি সে পছন্দ করে, কোন বিশেষ পদ্ধতিকে আবার পছন্দ করে না। জীবনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কখনো কোন নিয়ম-নীতিকে সে স্বেচ্ছায় তৈরী করে নেয়, কখনো বা অপরের তৈরী নিয়ম-নীতিকে নিজের করে নেয়। ***এদিক দিয়ে সে দুনিয়ার অন্যবিধ সৃষ্ট পদার্থের মতো একই ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন নয়, বরং তাকে দেয়া হয়েছে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা।***

এক শ্রেনীর মানুষ হচ্ছে তারা, যারা তাদের স্রষ্টাকে চিনেছে, তাকেই তাদের একমাত্র মনিব ও মালিক বলে মেনে নিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাদেরকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেখানেও তারই নির্ধারিত কানুন মেনে চলবার পথই তারা বেছে নিয়েছে, তারা হয়েছে পরিপূর্ণ মুসলিম। তাদের ইসলাম হয়েছে পূর্ণাঙ্গ। কারণ তাদের জীবনই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহতে সমর্পিত। না জেনে-শুনে যার নিয়মের আনুগত্য তারা করছে জেনে-শুনেও তারই আনুগত্যের পথই তারা অবলম্বন করেছে। অনিচ্ছায় তারা আল্লাহর বাধ্যতার পথে চলেছিল, স্বেচ্ছায়ও তারই বাধ্যতার পথ তারা বেছে নিয়েছে। তারা হয়েছে এখন সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী। কারণ যে আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন জানবার ও শিখবার ক্ষমতা, সেই আল্লাহকেই তারা জেনেছে। এখন তারা হয়েছে সঠিক যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী।

কারণ সৃষ্টির সকল পদার্থ যার দাসত্ব করে যাচ্ছে, তারাও করেছে তারই দাসত্ব। **দুনিয়ার বুকে তারা হচ্ছে আল্লাহর খলীফা (প্রতিনিধি)** সারা দুনিয়া এখন তাদেরই এবং তারা হচ্ছে আল্লাহর।

কুফরের তাৎপর্য

'কুফর' শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এ ধরনের লোকে 'কাফের' (গোপনকারী) বলা হয়, কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পর্দা। সে পয়দা হয়েছে ইসলামী স্বভাব নিয়ে। তার সারা দেহ ও দেহের প্রতিটি অংগ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী স্বভাবেরই উপর তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করেছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলবার চেষ্টা করেছে।

কুফরের অনিষ্টকারিতা

- 'কুফর' হচ্ছে এক ধরনের মূর্খতা, বরং কুফরই হচ্ছে আসল মূর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে অজ্ঞ হয়ে থাকলে তার চায়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে?
- কুফর একটি যুলুম, বরং সবচেয়ে বড় যুলুমই হচ্ছে এ কুফর। যুলুম কাকে বলে? যুলুম হচ্ছে কোন জিনিস থেকে তার সহজাত প্রকৃতির খেলাপ কাজ যবরদস্তি করে আদায় করে নেয়া?
- 'কুফর' কেবল যুলুমই নয়, বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামিও বটে।
- যে আল্লাহ মানুষের আসল কল্যাণকারী, প্রকৃত বাদশাহ, সবার বড় পরওয়ারদিগার, মানুষ যদি তার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, তাকে আল্লাহ বলে না মানে, তার দাসত্ব অস্বীকার করে, আর তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামী আর কি হতে পারে।

- কুফর ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই যে, এর ফলে মানুষ চিরকালের জন্য ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে যায়।

ইসলামের কল্যাণ

মুসলিম চরিত্রে থাকবে আল্লাহ ভীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়নতা। সবকিছুরই মালিক আল্লাহ, এ ধারণা নিয়ে সে বাস করবে দুনিয়ার বুকে। আমার ও দুনিয়ায় মানুষের দখলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান। কোন জিনিসের এমন কি আমার নিজের দেহের ও দেহের শক্তির মালিকও আমি নিজে নই। সবকিছুই আল্লাহর আমানত এবং এ আমানত থেকে ব্যয় করবার যে স্বাধীনতা আমায় দেয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা প্রয়োগ করাই হচ্ছে আমার কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তা'আলা আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন এবং সেদিন প্রত্যেকটি জিনিসের হিসেব দিতে হবে।

মুসলিম চরিত্র ভাল করে বুঝতে পারলেই বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, দুনিয়ায় মুসলিম কখনো অপমানিত, বিজিত ও অপরের হুকুমের তাবেদার হয়ে থাকতে পারে না। সবসময়েই সে থাকবে বিজয়ী ও নেতা হয়ে, কারণ ইসলাম তার ভিতর যে গুণের জম্ম দিয়েছে তার উপর কোনো শক্তিই বিজয়ী হতে পারে না।

এ হচ্ছে ইসলাম, মানুষের স্বাভাবধর্ম। কোন জাতি বা দেশের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় এ বিধান। সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশ যেসব আল্লাহ পরস্ত ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ অতীত হয়ে গেছেন, তাদের ধর্ম, তাদের আদর্শ ছিলো ইসলাম। তারা ছিলেন মুসলিম- হয়তো তাদের ভাষায় সে ধর্মের নাম ইসলাম অথবা অপর কিছু ছিলো।

ঈমান ও আনুগত্য

আনুগত্যের জন্য জ্ঞান ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন

- সবার আগে মানুষের প্রয়োজন আল্লাহর অস্তিত্ব সম্মপর্কে পূর্ণ প্রত্যয় লাভ। কেননা আল্লাহ আছেন, এ প্রত্যয় যদি তার না থাকলো, তা হলে কি করে সে তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে?

- এর সাথে সাথেই প্রয়োজন আল্লাহর গুণরাজী সম্পর্কে জ্ঞান।
- এরপর মানুষকে আরো জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা কি?
- মানুষকে আরো জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী পথে চলার ও তার পছন্দ মতো বিধানের আনুগত্য না করার পরিণাম কি?

ঈমানের পরিচয়

ঈমান ও ইসলামের দিক দিয়ে বিচার করলে গোটা মানব- সমাজকে **চার শ্রেণীতে** ভাগ করা যেতে পারে :

একঃ যাদের ভিতরে ঈমান রয়েছে এবং তাদের ঈমান তাদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পূর্ণ অনুগত করে দেয়।

দুই: যাদের ভিতরে ঈমান রয়েছে, কিন্তু তাদের ঈমান এতটা শক্তিশালী নয় যে, তা তাদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর আজ্ঞাবহ করে তুলবে।

তিন: যাদের ঈমান নেই;কিন্তু প্রকাশ্যে তারা এমন সব কাজ করে, যা আল্লাহর আইন মুতাবিক বলে মনে হয়।

চার: যাদের ঈমান নেই এবং কর্মের দিক দিয়ে ও যারা দুর্জন ও দুষ্কৃতিকারী। এরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্তরের লোক, কেননা এরা যেমন বিদ্রোহী তেমনি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম

“যদি কোন মানুষ সঠিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, তা হলেও বহু বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণা পর সে এ সব বিষয় সম্পর্কে একটা বিশেষ সীমানা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কায়েম করতে পারে। এরূপ অবস্থায় সে পুরোপুরি সত্য উপলদ্ধি করছে বলে তার মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাবে না। অবশ্যি মানুষকে কোন পথ নির্দেশ না দিয়ে ছেড়ে দিলে তাতে তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পুরোপুরি পরীক্ষা হতে পারতো। সেই ক্ষেত্রে যেসব লোক নিজ চেষ্টা ও যোগ্যতা দ্বারা সত্য

ও ন্যায়ের পথে পৌঁছতো তারাই হতো সফল;আর যারা পৌঁছতো না, তারা হতো ব্যর্থকাম। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহকে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলেননি! তিনি তাঁর আপন মেহেরবানীতে মানুষেরই মধ্যে এমন মানুষ পয়দা করেছেন, যাদেরকে তিনি দিয়েছেন নিজের গুণরাজির সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান। দুনিয়ায় মানুষ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে তার পদ্ধতি ও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের কাছে এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে। এরাই হচ্ছেন আল্লাহর পয়গম্বর। তাঁদেরকে জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচ্ছে ওহী এবং যে কিতাবে তাঁদেরকে এ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর কালাম।

ঈমান বিল-গায়েব

- ইমান বিল-গায়েব বলতে বুঝায়, যা কিছু মানুষের জানা নেই তা কোন জ্ঞানী লোকের কাছে থেকে জেনে নিয়ে তার উপর প্রত্যয় পোষণ করবে।
- আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার পন্থা কি তার খবরও কারো জানা নেই।আখেরাতের জীবনের সঠিক অবস্থা সকলেরই অজ্ঞাত। এর সবকিছুর জ্ঞান মানুষকে এমন এক লোকের কাছ থেকে হাসিল করতে হবে, যাঁর বিশ্বস্ততা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা আল্লাহভীতি, পাক-পবিত্র জীবন ও জ্ঞানগর্ব আলোচনা তার মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, তিনি যা বলেন, তা নির্ভুল এবং তার সব কথাই প্রত্যেয়ের যোগ্য, একেই বলে ঈমান বিল-গায়েব।

এ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ:

প্রথমত, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহর সত্তা ও গুণরাজি, তাঁর মনোনীত জীবন পদ্ধতি এবং আখেরাতের সুকৃতির প্রতিদান ও

দুষ্কৃতির প্রতিফল সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান এবং সে জ্ঞানকে এমন পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে নিতে হবে, যেন তার উপর পূর্ণ প্রত্যয় বা ঈমান জন্মে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে নিজের চেষ্টায় এ জ্ঞান লাভ করার মতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলেননি, নিজে মানুষেরই মধ্য থেকে তাঁর মনোনীত বান্দাকে (যাদেরকে বলা হয় পয়গাম্বর) ওহীর মাধ্যমে এ জ্ঞান দান করেছেন এবং তাঁদের হুকুম করেছেন অন্যান্য বান্দার কাছে এ জ্ঞান পৌঁছে দিতে।

তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের উপর কেবল মাত্র এতটুকু দায়িত্বই রয়েছে যে, সে আল্লাহর সত্যিকার পয়গাম্মর চিনে নেবে। অমুক ব্যক্তি সত্যি সত্যি আল্লাহর পয়গাম্বর, এ সত্য জানা হলেই তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রদত্ত যে কোন শিক্ষার উপর ঈমান আনা, তাঁর যে কোন নির্দেশ মেনে এবং তাঁরই অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা।

নবুয়াত

পয়গাম্বরীর মূলতত্ত্ব

সাধারণ কাজের জন্য বিভিন্ন রকম কাজের লোক জন্মে অসংখ্য কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানে অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী রাজনীতি ও সিপাহসালারীর যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ জন্মে কম। কোন বিশেষ কর্মে অসাধারণ যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভার অধিকারী লোকেরা আরো কম জন্মে থাকেন। কেননা তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে তাঁদের মত সুদক্ষ ও প্রতিভাসম্মপন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা যেমন করে বিশেষ বিশেষ শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি করে এমন মানুষও তিনি সৃষ্টি করেছেন, যাঁদের মধ্যে আলাহকে চিনবার উচ্চতম যোগ্যতা ছিল। নিজের কাজ থেকে তিনি তাঁদেরকে দিয়েছেন আল্লাহর বিধান (দ্বীন, আচরণ (আখলাক)ও জীবন যাপন পদ্ধতি (শরীয়াত)সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অপর মানুষকে এসব বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার কাজে

তাঁদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আমাদের ভাষায় এ সব মানুষকেই বলা হয় নবী, রাসূল অথবা পয়গাম্বর।

পয়গাম্বরের পরিচয়
পয়গাম্বরের আনুগত্য
পয়গাম্বরগণের প্রতি ঈমানের আবশ্যকতা
পয়গাম্বরীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুয়াত
নবুয়াতে মুহাম্মাদীর প্রমাণ
খতমে নবুয়াত

খতমে নবুয়াতের প্রমাণ

পয়গাম্বরীর তাৎপর্য আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই কথাগুলো বুঝে নিলে এবং তা নিয়ে চিন্তা করলে সহজেই জানা যাবে যে, পয়গাম্বর রোজ পয়দা হয় না, প্রত্যেক কওমের মধ্যে সবসময় পয়গাম্বরের আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজন নেই। পয়গাম্বরের জীবই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াতের জীবন। যতক্ষণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত জীবন্ত থাকে ততক্ষণ তিনি জীবিত থাকেন। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের মৃত্যু ঘটেছে, কারণ যে শিক্ষা তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন দুনিয়ার মানুষ তা বিকৃত করে ফেলেছে। যেসব গ্রন্থ তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তার কোনটিই আজ অবিকৃত অবস্থায় নেই। তাঁদের অনুগামীরাই আজ দাবী করতে পারছেনা যে, তাদের পয়গাম্বরের দেয়া আসল কিতাব তাদের কাছে মওজুদ রয়েছে, তারাই ভুলিয়ে দিয়েছে তাদের পয়গাম্বরের দেখানো পথ!পূর্ববর্তী পয়গাম্মরদের মধ্যে একজনের ও নির্ভুল নির্ভরযোগ্য বিবরণ আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যয় সহকারে আজ বলা যায় না কোন জামানায় তিনি পয়দা হয়েছিলেন? কি কাজ তিনি করে গেছেন? কিভাবে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন? কি কি কাজের শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন এবং কি কি কাজ থেকে মানুষকে বিরত করতে চেয়েছিলেন? এমনি করেই হয়েছে তাঁদের সত্যিকার মৃত্যু।

পক্ষান্তরে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আজো রয়েছেন জীবিত, কারণ তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যে কুরআন তিনি দিয়ে গেছেন, তা আজো তার তার মূল শব্দ-সম্ভার সহ অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে তার একটি হরফ, একটি নোকতা, একটি যের যবরের পার্থক্য ও হয়নি কোথাও। তাঁর জীবন-কাহিনী তাঁর উক্তি সমূহ ও কার্যকলাপ সব কিছুই সুরতি হয়ে আছে। তেরশ বছরের ব্যবধানে আজো ইতিহাসে তাঁর বর্ণনা এমন সুস্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই, যেন তাঁকে আমরা দেখেছি প্রত্যক্ষভাবে। হযরত (সা) এর ব্যক্তির জীবন-কাহিনী যেমন সুরতি হয়ে রয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী তেমন অবিকৃতভাবে সুরক্ষিত হয়নি। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতি মুহুর্তে হযরত (সা) এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাতেই প্রমাণিত হয় যে হযরত (সা) এর পর আর কোন পয়গাম্বরের প্রয়োজন নেই।

এক পয়গাম্বরের পর অপর কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাবের কেবল মাত্র তিনটি কারণ থাকতে পারেঃ

একঃ যখন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরের শিক্ষা হেদায়াত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং পুনরায় তা পেশ করার প্রয়োজন হয়, **দুইঃ** যখন পূর্ববর্তী পয়গাম্মরের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং তাতে সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন হয়, **তিনঃ** পূর্ববর্তী পয়গাম্মরের শিক্ষা যখন কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অপর জাতি বা জাতিসমূহের জন্য অপর কোন পয়গাম্মরের প্রয়োজন হয়।

উপরিউক্ত তিনটি কারণের কোনটিই বর্তমানে প্রযুক্ত হতে পারে না, **কারণঃ**

একঃ হযরত মুহাম্মাদ(সা)এর শিক্ষা ও হেদায়াত আজো জীবন্ত রয়েছে এবং সেসব মাধ্যম এখন পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে, যা থেকে প্রতি মুহুর্তে জানা যায়, হযরতের দ্বীন কি ছিল, কোন জীবন পদ্ধতির তিনি প্রচলন করেছিলেন এবং কোন কোন পদ্ধতি মিটিয়ে দেবার ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁর শিক্ষা ও

হেদায়াত আজো মিটে যায়নি, তখন আবার তা নতুন করে পেশ করার জন্য কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই।

দুইঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে দুনিয়াকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেয়া হয়ে গেছে। এখন তার মধ্যে যেমন কিছু কম-বেশী করার প্রয়োজন নেই, তেমনি তার মধ্যে এমন কোন ঘাটতি নেই, যা পূরণ করার জন্য আর কোন নবী আসার প্রয়োজন হবে। সুতরাং দ্বিতীয় কারণটির কোন অস্তিত্ব নেই।

তিনঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা) কোন বিশেষ কওমের জন্য পেরিত না হয়ে তামাম দুনিয়ার জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁর শিক্ষা যথেষ্ট। সুতরাং এখন কোন বিশেষ কওমের জন্য স্বতন্ত্র নবী আসার প্রয়োজন নেই। তাই তৃতীয় কারণটিও এ ক্ষেত্রে অচল।

এসব কারণে হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে বলা হয়েছে 'খাতামুন্নাবীয়্যিন' অর্থাৎ যাঁর ভিতরে নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর দুনিয়ায় নতুন কোন নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই; প্রয়েজন কেবল এমন মানুষের-যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা) -এর পথে নিজেরা চলবেন ও অপরকে চালাবেন; যাঁরা তাঁর শিক্ষাধারাকে উপলব্ধি করবেন, তদনুযায়ী আমল করবেন এবং দুনিয়ায় যে আইন ও বিধান নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা) তশরিফ এনেছিলেন, সেই আইন ও বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আনুগত্য সংক্রান্ত ১টি আয়াত মুখস্ত আন নিসা ৫৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে উত্তম।

আনুগত্য সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.رضى الله عنه.أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي"

পরিচ্ছেদঃ ৩০০৫. আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪ঃ ৫৯)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬৬৫২ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭১৩৭
৬৬৫২। আবদান (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যাক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যাক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যাক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

মাসয়ালাঃ আক্বিকা সংক্রান্ত।

যে সুন্নতগুলোর তাৎপর্য অনেক কিন্তু আমরা তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেই না আকীকা তার অন্যতম। ইসলাম পূর্বকাল থেকে চলে আসা এই আমলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। তিনি একে অনুমোদন করেছেন, নিজে করেছেন এবং অন্যদের করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সুন্নতটি আজ বিস্মৃতপ্রায়। মুসলিমগণ এর আমল বাদ দিয়ে এর স্থলে চালু করেছেন নানা বিজাতীয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতি।

অথচ ইসলামী মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় আকীকার গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রতি আমরা উন্নাসিকতা দেখিয়ে নিজেদেরই বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছি। হাদীসের ইঙ্গিত থেকে যেমন অনুমিত হয়, এর সঙ্গে শিশুর পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণ জড়িত। আমরা দেখি নব জাতকের এটা-সেটা রোগ-বালাই লেগেই থাকে। রোজই তার চিকিৎসার পেছনে, পথ্য ও ওষুধ কিনতে গিয়ে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। হাজার হাজার টাকা আমরা অসন্তুষ্টি আর অভিযোগ নিয়ে শিশুর অসুখ-বিসুখের পেছনে ব্যয় করতে পারি অথচ আকীকার মতো চমৎকার একটি আমল করতে পারি না, একটি বা দু'টি ছাগল জবাইয়ের মাধ্যমে। যার মাধ্যমে অনেক বিপদাপদ থেকেই বেঁচে যেতে পারে আমাদের প্রিয় আত্মজ।

সাধারণ মুসলিম তো নস্যি মোটামুটি দীনদার ও ইসলামের আদর্শ চর্চাকারী ভাইয়েরাও এ সুন্নতটিকে বড় অযত্ন অনাদরে উপেক্ষা করেন। হয়তো গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে না জানার কারণে অথবা যাপিত জীবনে হাজারো সুন্নতের প্রতি উদাসীনতারই অংশ হিসেবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

এ নিবন্ধের মাধ্যমে আমি আমাদের অনাদর ও উপেক্ষায় অনালোচিত ও অচর্চিত এই সুন্নতের কথাই সবাইকে স্মরণ করে দেবার প্রয়াস পেতে চাই। নিচের বিন্যাসে

আমি এ সংক্রান্ত বেশ-কিছু বিষয় তুলে ধরতে চেয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। বিশেষভাবে যে কিতাবটির কথা না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হয়, তা হলো- ড. হিসামুদ্দীন আফফানা কর্তৃক সংকলিত 'আহকামুল আকীকা' নামক গ্রন্থ। এবার চলুন মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক :

আকীকা কাকে বলে ও প্রাক-ইসলামী যুগে আকীকা

আকীকা কাকে বলে :

আকীকা শব্দের অর্থ কাটা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যে প্রাণীকে জবাই করা হয় তাকে আকীকা বলে। চাই তা ছেলে হোক বা মেয়ে। কেননা, এ প্রাণীর হলক তথা গলা কাটা করা হয়।

প্রাক-ইসলামী যুগে আকীকা :

আকীকার প্রথা জাহেলী যুগ থেকেই চালু ছিল। মাওয়ারদী বলেন, 'আকীকা বলা হয় ওই ছাগলকে ইসলাম পূর্বযুগে আরবা যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জবাই করত।'
অলীউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন, 'জেনে রাখুন, আরবরা তাদের সন্তানের আকীকা করতো। আকীকা তাদের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছিল। এতে ছিল ধর্মীয়, নাগরিক ও আত্মিক অনেক উপকারী দিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তা অব্যাহত রাখেন এবং মানুষকে এতে উদ্বুদ্ধ করেন। এর প্রমাণ আমরা দেখতে আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে। আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার বাবা বুরাইদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً ، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ .

'জাহেলী যুগে আমাদের নিয়ম ছিল, যখন আমাদের কারো পুত্র সন্তান জন্ম নিতো, সে একটি ছাগল জবাই করতো এবং এর রক্ত তার মাথায় লাগিয়ে দিতো। কিন্তু আল্লাহ যখন ইসলাম নিয়ে আসলেন, তখন আমরা একটি ছাগল জবাই করতাম

এবং তার মাথা নেড়ে করতাম আর তার তাকে জাফরান দিয়ে মাখিয়ে দিতাম।' [আবূ দাউদ : ২৮৪৩; বাইহাকী : ১৯৭৬৬; মুস্তাদরাক : ৭৫৯৪]

মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আকীকা সংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণনা করেন, তা থেকেও এমনটি প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন,

وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِى دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِىِّ فَأَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا .

'জাহেলী যুগের লোকেরা আকীকার রক্তে তুলা ভেজাতো এবং তা শিশুর মাথায় রাখতো। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন তুলার স্থলে জাফরান তথা সুগন্ধি রাখা হয়।' [বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬৭]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. উল্লেখ করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে তাঁর আকীকা করেন। তিনি বলেন, 'ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইবন আসাকির বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুবলেন,

لما ولد النبي صلى الله عليه و سلم عق عنه عبد المطلب وسماه محمدا فقيل له ما حملك على أن سميته محمدا ولم تسمه باسم آبائه فقال أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, আব্দুল মুত্তালিব তার আকীকা করেন এবং তার নাম রাখেন মুহাম্মদ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কিসে আপনাকে তাঁর নাম বাবা-দাদার নামের সঙ্গে না মিলিয়ে রেখে মুহাম্মদ রাখতে? তিনি বললেন, আমি চেয়েছি যাতে তার প্রশংসা আল্লাহ করেন আসমানে আর মানুষে করে যমীনে।' [শাহরহুয যারকানী আলা মুয়াত্তা মালেক, পৃ. ৫৫৮; ইবন আব্দিল বার, আল-ইস্তিয়াব।]

তেমনি মূসা আলাইহিমুস সালামের শরীয়তেও আকীকার প্রচলন ছিল। হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَلاَ تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعُقُّوا عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً»

'ইহুদীরা পুত্র সন্তানের আকীকা করতো কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার আকীকা করতো না। অতএব তোমরা পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল দিয়ে আকীকা করো।' [বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬০; মুসনাদ বাযযার : ৮৮৫৭।]

ইসলামে আকীকা

আকীকার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও উক্তি- উভয়প্রকার হাদীসের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে অনেক 'আছার'ও বর্ণিত হয়েছে অনেক। নিচে এর কিছু তুলে ধরা হচ্ছে :

প্রথমত. সুন্নাহ কাওলী বা মৌখিক হাদীস :

১. সালমান বিন আমের দাব্বী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

'পুত্র সন্তানের সঙ্গে আকীকা রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে কষ্ট দূর করো।' [বুখারী : ৫০৪৯; তিরমিযী : ১৫১৫; মুসনাদ আহমদ : ১৭৯০৭।]

২. সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»

‘প্রত্যেক শিশুই তার আকীকা জরুরী। জন্মের সপ্তম দিনে তার জন্য জবাই করা হবে এবং তার মাথা নেড়ে করা হবে আর নাম রাখা হবে। [আবূ দাউদ : ২৮৪০; মুসনাদ আহমদ : ২০০৯৫ ।]

৩. উম্মে কুরয আল-কা‘বিয়া রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি,

«عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

‘ছেলে সন্তানের পক্ষে সমবয়সী দু’টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি ছাগল (দিয়ে আকীকা করা যাবে)।’ [আবূ দাউদ : ২৮৩৬; মুসনাদ আহমদ : ২৭৪০৯ ।]

৪. উম্মে কুরয আল-কা‘বিয়া রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহার অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকীকা সম্মপর্কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে তিনি বলেন,

« عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا».

‘ছেলে সন্তানের পক্ষে সমবয়সী দু’টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি ছাগল (দিয়ে আকীকা দেয়া যাবে) আর ওই ছাগলগুলো পাঠা হোক বা পাঠ তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা নাই।’ [তিরমিযী : ১৫৯৯; মুসনাদ আহমদ : ২৭৩৭৩ ।]

৫. হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা তাঁকে অবহিত করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

‘পুত্র সন্তানের জন্য দু’টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল।’ [ইবন হিব্বান : ৫৩১০; ইবন আবী শাইবা : ২৪৭২৯ ।]

৬. একই হাদীসের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

'ইউসুফ বিন মাহাক থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার কাছে গেলেন এবং তাঁকে আকীকা সম্মপর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে জানালেন যে, তিনি তাঁকে এ মর্মে অবহিত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ছেলে হলে সমবয়সী দু'টি ছাগল ও মেয়ে হলে একটি ছাগল দিয়ে আকীকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।' [তিরমিযী : ১৫১৩।]

৭. আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْعَقِيقَةُ حَقٌّ ، عَنِ الْغُلامِ : شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ : شَاةٌ».

'পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে প্রায় সমবয়সী দু'টি ছাগল হক এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি।' [আল-আদাদ ওয়াল-মাছানী : ৩৩৫৩; মুসনাদ আহমদ : ২৭৫৮২।]

৮. ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ মুযানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ ، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ».

'পুত্র সন্তানের পক্ষে আকীকা করা হবে আর তার মাথায় রক্ত স্পর্শ করা হবে না।' [ইবন মাজা : ৩১৬৬; আল-আদাদ ওয়াল-মাছানী : ১১০৮।]

৯. আমর বিন শুয়াইব তার বাবা আর বাবা তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ».

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের সপ্তম দিবসে নবজাতকের নাম রাখা, তার আবর্জনা দূর করা (তথা নেড়ে করা) ও আকীকার নির্দেশ দিয়েছেন।' [তিরমিযী : ২৮৩২।]

১০. ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه».

'যখন তার (নবজাতকের জন্মের) সপ্তম দিন আসবে, তখন তার পক্ষে রক্ত প্রবাহিত করো আর তার আবর্জনা (মাথার চুল) দূর করো এবং তার নাম রাখো।' [তাবরানী, আল-মু'জামুল আওসাত : ১৮৮৩।]

১১. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আকীকা সংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণনা করেন, তা থেকেও এমনটি প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন,

وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِى دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِىِّ فَأَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا.

'জাহেলী যুগের লোকেরা আকীকার রক্তে তুলা ভেজাতো এবং তা শিশুর মাথায় রাখতো। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন তুলার স্থলে জাফরান তথা সুগন্ধি রাখা হয়।' [বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬৭।]

১২. হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَلاَ تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعُقُّوا عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً».

'ইহুদীরা পুত্র সন্তানের আকীকা করতো কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার আকীকা করতো না। অতএব তোমরা পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি

ছাগল দিয়ে আকীকা করো।' [বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬০; মুসনাদ বাযযার : ৮৮৫৭।]

দ্বিতীয়ত. সুন্নাহ ফি'লী বা কর্মগত হাদীস :

১. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য দু'টি দু'টি করে ভেড়া দিয়ে আকীকা করেন।' [নাসায়ী : ১২১৯।]

২. আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য আকীকা করেছেন।' [মু'জামুল কাবীর : ২৫১০; নাসায়ী : ৪২১৩; মুসনাদ আহমদ : ২৩০৫১।]

৩. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الأَذَى.

'(জন্মের) সপ্তম দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনের আকীকা দিয়েছেন, তাঁদের নাম রেখেছেন এবং তাঁদের মাথা থেকে কষ্ট (চুল) দূর করেছেন।' [বাইহাকী : ১৯০৫৫; সহীহ ইবন হিব্বান : ৫৩১১।]

৪. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الأَذَى. وَقَالَ« : اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلاَنٍ.

'হাসান ও হুসাইনের (জন্মের) সপ্তম দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ছাগল দিয়ে আকীকা দেন এবং তার মাথার কষ্ট দূর করার নির্দেশ দেন। আর তিনি বলেন, 'তাঁর (আল্লাহর) নামে জবাই করো এবং বলো, বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ, আপনার কাছে অমুকের জন্য এ আকীকা।' [বাইহাকী : ১৯৭৭২; মুসনাদ আবী ইয়া'লা : ৪৫২১।]

৫. আব্দুল্লাহ ইবন উমরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشَيْنِ اثْنَيْنِ مِثْلَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন- উভয়ের প্রত্যেকের জন্যই প্রায় একইরকম সমবয়সী দুটি করে ভেড়া দিয়ে আকীকা দেন।' [হাকেম, মুস্তাদরাক : ৭৫৯০।]

৬. আলী বিন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ « يَا فَاطِمَةُ احْلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً . قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছাগল দিয়ে হাসানের আকীকা দিলেন এবং বললেন, ‘হে ফাতেমা, এর তার মাথার চুল ফেলে দাও এবং তার চুলের ওজনে রুপা সদকা করো। তিনি বলেন, অতপর ফাতেমা তা পরিমাপ করলো, এর ওজন হলো এক দিরহাম বা এক দিরহামের কিছু পরিমাণ।’ [তিরমিযী : ১৬০২; হাকেম, মুস্তাদরাক : ৭৫৮৯।]

নেড়ে (টাক) করতে হবে, কাযা করা যাবে না

উপরের হাদীসগুলোতে থেকে আমরা যেমন জানলাম, শিশু জন্মের সপ্তম দিনে তার মাথা নেড়ে (টাক) করতে বলা হয়েছে। তবে কাযা‘ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর তা হলো, ‘বাচ্চার মাথা এমনভাবে নেড়ে করা যে তার মাথার বিভিন্ন স্থান অমুণ্ডিত থাকে’। [ইবনুল আছীর, নিহায়া : কাযা‘ অধ্যায়।]

ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা‘ থেকে বারণ করেছেন। তিনি বলেন, নাফে‘কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাযা‘ কী? তিনি বললেন, বাচ্চার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো আর কিছু অমুণ্ডিত রাখা’। [মুসলিম : ৩৯৫৯; বুখারী : ৫৪৬৫; ইবন মাজা : ৩৬২৭; আহমদ : ৪৯২৮।]

উদ্দেশ্য, নেড়ে করতে হবে পুরো মাথা জুড়ে। কারণ, মাথার কিছু অংশ নেড়ে করা আর কিছু না করা ইসলামী ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী, যার মাধ্যমে একজন মুসলিম অন্য জাতি-গোষ্ঠী থেকে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে স্বাতন্ত্রের অধিকারী হয়। এই কাযা’র মাধ্যমে মূলত কাফেরদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। আর তাদের সাদৃশ্য ধারণ জায়িয নয়।

হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত, মুয়াবিয়া বিন সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে বছর হজ করেন, তিনি মিম্বরে বসলেন, আমার ভৃত্যের হাতে থাকা চুল থেকে একগুচ্ছ চুল নিলেন এবং বললেন,

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُم

হে মদীনাবাসী, কোথায় তোমাদের আলিমগণ? (তিনি কি তোমাদের বারণ করেননি?) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের নারীরা এটাকে (কাযা') ধারণ করেছিল।' [মুসলিম : ৫৭০০; বুখারী : ৩৪৬৮; আবূ দাউদ : ৪১৬৯।]

(এ থেকে বুঝা যায়, মাথার চুল কিছু মুণ্ডানো আর কিছু রেখে দেওয়া তাদের শরীয়তে হারাম ছিল।)

ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : « احْلِقُوا كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ».

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে দেখলেন তার (মাথার) কিছু চুল নেড়ে করা হয়েছে আর কিছু অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। তাকে দেখে তিনি এ থেকে বারণ করলেন এবং বললেন, তোমরা (মাথা) পুরোটাই মুণ্ডাও অথবা পুরোটাই অমুণ্ডিত রাখো।' [মুসনাদ আহমদ : ৫৬১৫; আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফ : ১৯৫৬৪১।]

কেন এই আকীকার বিধান

সন্দেহ নেই আকীকার রয়েছে নানা তাৎপর্য ও কল্যাণময় দিক। যেমন :

এক. অলীউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন, 'এতে আছে ধর্মীয়, নাগরিক ও আত্মিক অনেক উপকারী দিক। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বহাল রাখেন, এর আমল করেন এবং মানুষকে এতে উদ্বুদ্ধ করেন। এসব কল্যাণময় দিকের মধ্যে রয়েছে, যেমন :

ক. ভদ্রোচিত পন্থায় সন্তানের বংশ পরিচয় প্রকাশ করা। কারণ বংশ পরিচয় প্রকাশ না করলেই নয়। যাতে অনভিপ্রেত কথা না শুনতে হয়। আর এমনটি কখনো সুন্দর দেখায় না যে কেউ পথে পথে ঘুরে মানুষকে বলে বেড়াবেন যে এ আমার সন্তান।

খ. খ্রিস্টানদের যখন কোনো সন্তান হতো, তারা তাকে হলুদ পানি দিয়ে হরিদ্রা বানিয়ে দিত। তারা এর নাম দিয়েছিল 'মা'মুদিয়া'। তারা বলতো, এর মধ্য দিয়ে শিশুটি খ্রিস্টান হয়ে যাবে। এ নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই নাযিল হয়েছিল

﴿ صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ﴾

[البقرة :138]

'(বল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী।' {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৩৮}

অতএব তাদের ওই রীতির বিপরীতে হানীফীদেরও কোনো কাজ থাকা বাঞ্ছনীয়। যে থেকে বুঝা যাবে শিশুটি হানীফী তথা ইসমাঈল ও ইবরাহীম আলাইহিমাস সালামের অনুসারী। আর তাঁদের সন্তানদের মধ্যে বংশানুক্রমে আগত কাজগুলোর মধ্যে সবচে প্রসিদ্ধ পুত্র কুরবানীর বিষয়টি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপন পুত্র

ইসমাঈলকে কুরবানী করেন। আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে নিয়ামতে ভূষিত করেন। তাঁর সন্তানকে মহান যবেহের মাধ্যমে মুক্ত করেন এবং তাঁদের বিধান হজকে দেন কিয়ামতাবধির জন্য স্থায়িত্ব, যার মধ্যে রয়েছে মাথা নেড়ে করা এবং পশু যবেহ করা। ফলে এই আকীকা ও মাথা মুণ্ডনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ হবে। হানীফী মিল্লতের প্রতি ইঙ্গিতও হবে আবার ঘোষণাও হবে যে সন্তানটির সঙ্গে এ উম্মতের কাজই করা হয়েছে।

গ. এ কাজ তাকে শিশুটির জন্মের পর মুহূর্তেই তাকে এ কল্পনায় নিয়ে যাবে যে সে তার সন্তানকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিল, যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে।

দুই. সন্তান দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। কেননা, সন্তানই অন্যতম সেরা নেয়ামত। আর এ সন্তান হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ﴾ [الكهف :46]

'সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা...।' {সূরা আল-কাহফ, আয়াত : ৪৬}

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে সে সন্তান ভূমিষ্ট হলে আনন্দিত হয়। তাই মানুষের কাছে তার স্রষ্টা ও দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই কাম্য। এ জন্যই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সদ্য সন্তানের পিতা হওয়া ব্যক্তিকে অভিবাদন জানিয়ে এমন বলার কথা বর্ণিত হয়েছে,

بارَكَ اللّه لكَ في الموهوب لك وشكرتَ الواهبَ وبلغَ أشدَّه ورُزقت برّه.

'তোমাকে যা দান করা হয়েছে আল্লাহ তাতে বরকত দিন। তুমি দানকারীর শুকরিয়া আদায় করো, সে তার বয়স পুরো করুক এবং তোমাকে তার পুণ্য প্রদান করা

হোক।’ [মুসনাদ ইবনুল জা’দ : ১৪৪৮; ইবন আদী, আল-কামেল : ৭/১০১; ইনব আবিদ্দুনইয়া, আল-ইয়াল : ১/২০১।][১]
অতএব বুঝা গেল, আকীকা হলো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তাঁর নৈকট্য লাভের একটি উত্তম উপায়।

তিন. এতে আছে সন্তানের মুক্তি এবং তার বিনিময় প্রদান। যেমন আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈল যবীহের বিনিময়ে ভেড়া কুরবানী দিয়ে দেন। জাহেলী যুগের লোকেরাও এটা করত এবং তারা এটাকে আকীকা বলত। আর শিশুর মাথায় তারা রক্ত লাগিয়ে দিত। ইসলাম সেই নিয়মটিকে সমর্থন করে এবং নবজাতকের মাথায় রক্ত লাগানো নিষিদ্ধ করে দেয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়ে দেন যে, নবজাতকের জন্য যা-ই যবেহ করা হবে তা হতে হবে কুরবানী ও হজের হাদীর মতো ইবাদত হিসেবে। তিনি বলেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

‘যে তার সন্তানের জন্য কোনো কুরবানী দিতে চায়, তবে যেন পুত্র হলে দুটি সমবয়সী ছাগল এবং কন্যা হলে একটি ছাগল গিয়ে ইবাদত (তথা আকীকা) করে।’ [নাসায়ী : ৪২২৯; শরহু মা‘আনিল আছার : ১০১৫।]

অর্থাৎ তিনি এটাকে কুরবানী হিসেবে করতে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা যেটাকে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্য কুরবানী ও বিনিময় হিসেবে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষে অসম্ভব নয় যে তিনি সন্তানের জন্য, তার সার্বক্ষণিক

নিরাপত্তা ও দীর্ঘায়ু জন্য এ বিধান দিয়েছেন। যাতে ওই যবেহকৃত পশুর প্রতিটি অঙ্গ এ শিশুর বিনিময় হয়।

চতুর্থ. এ কথার সংবাদ ও ঘোষণা দেয়া যে এ ব্যক্তি সন্তানের পিতা হয়েছে এবং সন্তানের নাম অমুক রেখেছে। ফলে তার পরিজন, প্রতিবেশি ও বন্ধ-বান্ধব এ সংবাদ জানবে এবং তাকে মোকারকবাদ দিতে আকীকায় উপস্থিত হবে। এতে করে মুসলিম ভাইদের মাঝে সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

পঞ্চম. এতে ইসলামের সামাজিক দায়িত্বগুলোর একটি প্রকারের চর্চা হয়। কেননা, যিনি তার সন্তানের জন্য আকীকা হিসেবে পশু জবাই করেন এবং তা বন্ধ-বান্ধব, প্রতিবেশি ও গরীব-মিসকীনদের জন্য পাঠিয়ে দেন বা তাদের দাওয়াত করেন। আর এটি গরীবদের অভাব মোচন ও দারিদ্র হ্রাসে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখে।

[১]. উল্লেখ্য, এর সবগুলো সূত্রই দুর্বল। এটি হাদীস নয়; একটি আছর, যা হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা হাদীস মনে না করে কেবল একটি দু'আ হিসেবে পড়া যাবে। (নাববী, আল-আযকার : ১/৬৪৮)

পশু যবেহ করা তার মূল্য দান করার চেয়ে উত্তম যদিও তা বেশি হয়

এসব তাৎপর্য ও উপকারিতার কারণেই আকীকা হিসেবে পশু যবেহ করা এর মূল্য দান করার চেয়ে উত্তম যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। কারণ তা একটি সুন্নত এবং প্রবর্তিত ইবাদত, যা পিতামাতার ওপর আল্লাহর নতুন নিয়ামতের ওপর শুকরিয়া স্বরূপ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার মতো অনুপম তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার বদলে ভেড়া কুরবানী করে দেন। আকীকা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেবার মধ্য দিয়ে সন্তানকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর হিকমতও রয়েছে, যেমন সে গর্ভে আসার সময়

(স্বামী-স্ত্রীর মিলনকালে দু'আ পড়ার মাধ্যমে) শয়তানের দুষ্ট প্রভাব থেকে নিরাপদ হয়।

আকীকা সংক্রান্ত করণীয়

প্রথম. আকীকার মাংস ব্যবহার

আকীকার পশু যবেহ করার পর এর ব্যবহার ঠিক কুরবানীর পশুর মতোই। ফলে তা তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একভাগ পরিবার, একভাগ সাদাকা ও একভাগ হাদিয়ার জন্য।

ইমাম নাববী রহ. বলেন,

[ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية]

'মুস্তাহাব হলো আকীকার মাংস থেকে (নিজেরা) খাওয়া, (গরীবদের মাঝে) সদকা করা এবং (বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে) হাদিয়া পাঠানো। যেমন আমরা বলেছি এসেছি কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে।' [নাসায়ী : ৪২২৯; শরহু মা'আনিল আছার : ১০১৫।]

অধিকাংশ আলেম আবার আকীকার মাংস কাঁচা সদকা না করে তা রান্না করে সদকা করা এবং রান্নার তা গরীবদের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তবে যদি না পাঠিয়ে তাদেরকে বাড়িতে এনে দাওয়াত করে খাওয়ানো তাহলে সেটা আরও উত্তম। যদি আকীকার মাংস দিয়ে দাওয়াতের আয়োজন করা হয়, তাহলে তাতে ধনী-গরীব, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-প্রতিবেশী সবাইকে শরীক করতে যাবে। এক কথায় তিনি যেভাবে চান এটাকে কাজে লাগাবেন।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবন সীরীন রহ. বলেন,

[إصنع بلحمها كيف شئت]

'আকীকার মাংস যেভাবে ইচ্ছে কাজে লাগাতে পারেন।' [আল-মাজমূ' : ৮/৪৩০।]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর সঙ্গে রান্নার কথাও যোগ করেন।

[فقد قيل له : تطبخ العقيقة ؟ قال : نعم . قيل له : يشتد عليهم طبخها . قال : يتحملون ذلك].

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আকীকার মাংস কি রান্না করা হবে? তিনি বললেন, 'হ্যা'। তাকে বলা হলো, তাদের জন্য এটা রান্না করা কঠিন হবে। তিনি বললেন, 'তারা সেটা সহ্য করবে।'

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

[وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة ، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب].

'এটা এজন্য যে, তিনি যখন মাংস রান্না করে দেবেন, গরীব, মিসকিন ও প্রতিবেশিদের আর রান্নার কষ্ট ও খরচটুকু বহন করতে হবে না। একটি ভালো কাজে তা নতুন মাত্রা যোগ করবে। নিয়ামতের শুকরিয়ায় এটি অতিরিক্ত হিসেবে বরিত হবে। প্রতিবেশি, সন্তানাদি ও অভাবীরা এর মাধ্যমে আরও বেশি আনন্দিত হবে। কারণ যদি কাউকে রান্না করা এবং খাবারের জন্য একেবারে প্রস্তুত কোনো মাংস কাউকে দেওয়া হয় তবে তিনি ওই মাংস পাওয়া থেকে অবশ্যই অধিক খুশি হবেন, যাতে পাকানো ও রান্নার কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন রয়েছে।' [তুহফাতুল মাওদূদ : ৫৯-৬০।]

ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার সন্তানের আকীকা করেন। তিনি আকীকা কীভাবে করেছেন আমাদের জন্য তার বিবরণ দিয়েছেন। তদীয় 'মাবসূত' গ্রন্থে তিনি লিখেন,

عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ، وهيأت طعامهم ، ثم ذبحت شاة العقيقة فأهديت منها للجيران ، وأكل منها أهل البيت ، وكسروا ما بقي من عظامها فطبخت ، فدعونا إليها الجيران فأكلوا وأكلنا ، قال مالك : فمن وجد سعة فأحب له أن يفعل هذا ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم ليأكل وليطعم منها

'আমি আমার সন্তানের আকীকা দিয়েছি। প্রথমে যেসব ভাই ও অন্যদের দাওয়াত দিয়েছি তাদের যা খাওয়াবার ইচ্ছে করেছি তা জবাই করলাম। তারপর তাদের খাবার প্রস্তুত করলাম। এরপর আকীকার ছাগল জবাই করলাম। তা থেকে প্রতিবেশিদের হাদিয়া দিলাম। পরিবারের লোকেরা মাংস খেল। হাড়-হাড্ডি যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো টুকরো করে রান্না করলাম। তারপর প্রতিবেশিদের আবার সেগুলো খাওয়ার দাওয়াত দিলাম। তারা খেল আর আমরাও খেলাম। মালিক রহ. বলেন, অতএব যার অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে, আমি চাই তিনি এমন করবেন। আর যার নাই, তিনি আকীকা জবাই করবেন এবং সেখান থেকে খাবেন ও খাওয়াবেন।' [আল-মুনতাকা : ৩/১০৪।]

দ্বিতীয়. আকীকার চামড়া ও এর বর্জ্যসংক্রান্ত বিধান

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মতে আকীকার চামড়া, মাথা এবং ইত্যাকার অংশগুলো বিক্রি করা হবে তারপর তার মূল্য সাদাকা করা হবে। আকীকার বর্জ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به

‘চামড়া, মাথা এবং বর্জ্য বিক্রি করা হবে এবং তা সদকা করা হবে।’ [তুহফাতুল মাওদূদ : ৭০; কাশশাফুল কিনা : ৩/৩১।]

এদিকে ইমাম মালিক রহ.-এর যে কোনো অংশ বিক্রির বিপক্ষে। তিনি বলেন,

ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها

‘আকীকার মাংস বা চামড়ার কোনো অংশই বিক্রি করা হবে না।’ [আল-মুয়াত্তা বিহামিশিল মুনতাকা : ৩/১০৩।]
ইবন রুশদ বলেন,

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومن البيع

‘আকীকার মাংস, চামড়া এবং এর যাবতীয় অংশের বিধান খাওয়া, সদকা করা ও বেচার দিক থেকে কুরবানীর পশুর মতোই।’ [বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১৩৭৭।]
এককথায় আকীকার মাংস ও এর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার তেমনি যেমন কুরবানীর পশুর মাংস ও তার অন্যান্য অংশের ব্যবহার করতে হয়।

আকীকা সংক্রান্ত আরও কিছু মাসআলা :
অধিকাংশ আলিমের মতে আকীকা সুন্নত। তবে কেউ কেউ আকীকা ওয়াজিব বলেছেন।
জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা দেয়াটাই সুন্নতের পূর্ণ আনুগত্যের দাবী। তবে এরপরেও যে কোনো সময় আকীকা দেয়া যাবে। কারণ, হাদীসে সপ্তম দিনের কথা বলা হয়েছে, তবে তা হবে না- এমন কিছু বলা হয়নি
ছেলের আকীকা হিসেবে দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল জবাই করা সুন্নত। তবে কষ্টসাধ্য হলে একটি ছাগল দিয়েও ছেলের আকীকা দেয়া যাবে। কারণ, উভয় ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বকে তাঁর রাসূলের সুন্নতের রঙ্গে রাঙাবার এবং সকল অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকবার তাওফীক দিন। আমীন।

সুত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=159

অনুশীলনী -২০(অক্টোবর-৪র্থ সপ্তাহঃ)

দারস তৈরী -সূরা আহযাব (৩৫ নং আয়াত),

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ

لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

উচ্চারণ: ইননাল মুছলিমিনা ওয়াল মুছলিমা-তি ওয়াল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল কা-নিতিনা ওয়াল কা-নিতা-তি ওয়াসসা-দিকিনা ওয়াসসা-দিকা-তি ওয়াসসা-বিরিনা ওয়াসসা-বিরাতি ওয়াল-শি'ঈসা-বিরিনা ওয়াসসা-বিরাতি ওয়াল-শি'ঈনা মুনাসাইনা ওয়াল-শি'-শিনা-তি ওয়াল-শি'ঈনা মুতাসা-আদি মুতাসাদা ওয়াসসাইমা-তি ওয়ালা হা-ফিজিনা ফুরুজাহুম ওয়ালা হা-ফিজা-তি ওয়ায্যা-কিরিনাল্লা-হা কাছেরওঁ ওয়াযযা-কিরা-তি আ'আদ্দাল্লা-লাহুম মাগফিরাতাওঁ ওয়া আজরান 'আজিমা-।

অর্থ: নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, ইবাদত গোজার পুরুষ ও ইবাদতগোজার নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, সম্পূর্ণ বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, সদকাকারী পুরুষ ও সদকাকারী নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার

নারী, হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী। আল্লাহ সকলের জন্য মাগফেরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সূরা আল-আহযাব (سورة الأحزاب) পবিত্র কুরআনের ৩৩তম সূরা, যার নাম ২০ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'আল-আহযাব' (সম্মিলিত বাহিনী বা দলসমূহ) শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে [১, ২]। ৫ম হিজরিতে মদীনা অবরোধকারী কুরাইশ, অন্যান্য আরব গোত্র ও ইহুদিদের সম্মিলিত বাহিনীকে কেন্দ্র করে এ নামকরণ করা হয়েছে [৭, ৮]। এই সূরায় খন্দকের যুদ্ধ বা আহযাব যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে [১৩]।

নামকরণের কারণঃ

সম্মিলিত বাহিনীঃ 'আহযাব' হলো 'হিযব' (حزب)-এর বহুবচন, যার অর্থ দল, বাহিনী বা গোষ্ঠী। খন্দকের যুদ্ধে (Battle of the Trench) মক্কার কুরাইশ, নাজরানের ইহুদি এবং অন্যান্য গোত্র একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল, যাদেরকে 'আল-আহযাব' বা সম্মিলিত বাহিনী বলা হয় [৪, ৫]।

যুদ্ধের বিবরণঃ এই সূরায় ঐ সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা অবরোধ এবং পরবর্তীতে মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমদের বিজয়ের ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার কারণে এর নাম সূরা আহযাব রাখা হয়েছে [১০, ১৩]।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ এটি একটি মাদানী সূরা এবং এটি ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে সংগঠিত আহযাব যুদ্ধের পরিস্থিতির আলোকে অবতীর্ণ হয়েছে [১, ১০]।
এই সূরায় খন্দকের যুদ্ধ ছাড়াও সামাজিক সংস্কার, পর্দা বিধান এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও ঘটনা (যেমন- জায়নাব (রাঃ) এর সাথে বিবাহ) আলোচিত হয়েছে [১০, ১৩]।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। **এক,** আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। **দুই**, বনী কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরীর যিল্‌কাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়। **তিন,** হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিল্‌কাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল যথাযথ ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহোদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদি ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মনে আশা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে। ওহোদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে।ওহোদ যুদ্ধের পরে দু'মাসও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেল যে, নজ দের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার ওপর আক্রমন করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু সালামার সারীয়া * বাহিনী পাঠানো হলো। তারপর ৪ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয় তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীন ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন লোক চায়। নবী (সা) ছ'জন সাহাবীকে তাদের সংগে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী' (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে) নামক স্থানে পৌঁছে তারা হুযাইল গোত্রের কাফেরদেরকে এ নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে এবং দু'জনকে (হজরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো একটি প্রচার দল

পাঠান। এ দলে ছিলেন চল্লিশ জন (অথবা অন্য উক্তি মতে ৭০ জন) আনসারি যুবক। তাঁরা নজদের দিকে রওনা হন। কিন্তু তাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের 'উসাইয়া, বি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্রত্রয় বি'রে মা'ঊনাহ নামক স্থানে অকস্মাত তাদেরকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাযীর ইহুদি গোত্রটি সাহসি হয়ে ওঠে এবং একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেয়ার ষরযন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্ফানের দু'টি গোত্র বনু সা'লাবাহ ও বনু মাহারিব মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে ওহোদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাব মূর্তি ও প্রতাপে যে ধস নামে, ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে।

[সীরাতের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীক ছিলেন না। আর "গাযওয়া" বলা হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।]

কিন্তু শুধুমাত্র মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই আবস্থার গতি পাল্টে দেয়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। আশেপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। মদীনার মধ্যেই ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা মু'মিনগোষ্ঠী আল্লাহর রসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ নেয় যার ফলে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

আহ্‌যাব যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধগুলো

এর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের পরপরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু গৃহে নিকটতম আত্মীয়দের শহাদাত বরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত ছিলেন এবং তার চাচা হাম্‌যার (রা) শাহাদাত বরণে ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসর্গীত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা আমাদের ওপর আক্রমন চালাতে পারে। নবী করীমের (সা) এ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমনের জন্যে দৌড়ে আসবে। এ জন্য তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংগে সংগেই ৬৩০ জন উৎসর্গীত প্রান সাথী তাঁর সংগে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। মক্কার পথে হাম্‌রাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তিন তিন দিন অবস্থান করেন। যেখানে একজন অমুসলিম শুভানাধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তারা যথার্থই নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি সেনা দল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশরা আগে বেড়ে যে হিম্মত দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি বরং আশপাশের দুশমনরাও জানতে পারে যে,মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর ইংগিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাহফিমুল কোরআন, সূরা আলে ইমরানের ভূমিকা এবং ১২২ টীকা)।

তারপর যখনই বণী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোয়েন্দারা যথাসময়ে তাদের সংকল্পের খবর তাঁর কানে পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি হযরত আবু সালামার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলা করার জন্য পাঠান। এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। অসচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এরপর আসে বনী নাযীরের পালা। যেদিন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার ষরযন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু'হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে। নজ্‌দ থেকে বনী গাত্‌ফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, আপনার যা করার করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই তাদের ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে। এভাবে মদীনার শহরতলীর সমস্ত মহল্লা যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু মুসলমানদের

হাতে চলে আসে। অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে।

তারপর তিনি বনী গাত্‌ফানের দিকে নজর দেন। তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল। তিনি চরশো সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর রিকা' নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন। এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের বাড়িঘর মাল-সামান সবকিছু ফেলে রেখে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য বের হয়ে পড়েন। ওহোদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিল :(•••••••) (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও তোমাদের মোকাবিলা হবে ।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেনঃ (ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো)। এ সিদ্ধান্ত আনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু র্মারায্ মাহ্‌রান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত হয়নি। নবী করীম সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তরবর্তীকালে ব্যবসায় করে মুসলমানরা বেশ দু'পয়সা কামাতে থাকে। এঘটনার ফলে ওহোদে মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চাইতেও আরো কয়েক গুন বেড়ে যায়। এর ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। (এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাহফিমুল কোরআন, সূরা আলে ইমরান, ১২৪ টীকা)

আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল জান্দাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যেখান থেকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুণ্ঠন করতো। নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মোকাবিলা করার সাহস করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মোকাবিলা করা এখন আর একটি দু'টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আহ্যাবের যুদ্ধ

এ অবস্থায় আহ্যাব যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে একএ হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এক বিরাট বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমন করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতিপূর্বে আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয় উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার ইহুদিরা। এরা মদীনা থেকে বিতারিত হয়ে খয়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাত্‌ফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, র্মুরহা, আশজা', সা'আদ ও আসাদ ইত্যাদি)। দক্ষিন থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ বারো হাজারের কম হবে না।

এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হত ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। বরং সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্মপর্কে সর্বক্ষণ খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।*এ বিসাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌঁছুবার আগেই ছ'দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং সাল্'আ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমাণ ছিল এত বেশী (এবং এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোন আক্রমন চলানো সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার উপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিম দক্ষিণকোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে পারতো একমাত্র ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম (সা) এদিকেই পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল নক্শায় আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য তৈরি হতে হয়। অথচ এ জন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি।

এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদি গোত্র বনী কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল এবং এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে

নিজেদের পরিবার ছেলেমেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ করতে পারে।তাদের পক্ষ থেকে বনী নযীরের ইহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবকে বনী কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখ্‌তাব তাদেরকে বললো, "দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দার করিয়েছি। একে খতম করে দেবার এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর আর কোন সুযোগ পাবে না" তখন ইহুদি জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

* জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মোকাবিলায় একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের প্রাধান্যের এটি হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জাতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী আন্দোলন নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে সবদিকে এগিয়ে চলে এবং স্বয়ং ঐ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকেও তার সমর্থক বের করে আনে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথা সময়ে এ খবর পেয়ে যান। সংগে সংগেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা'দ ইবনে উবাদাহ, সা'দ ইবনে মু'আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত করার এবং এ সংগে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে

ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইংগিতে এ খবরটি দেবে যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মত হারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বনি কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে জানিয়ে দেয় "আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোন অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইংগিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান অর্থাৎ 'আদল ও কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী' নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী কুরাইযা এখন তাই করছে।

এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ব্যপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু'দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শহরের যে অংশে তারা কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশী বেড়ে যায়। মু'মিনদের উৎসাহ-উদ্যম নিস্তেজ করে দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, "আমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে আমরা পেসাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমন কারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের হাতে তুলে দাও। এটা এমন একটা কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল যার মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকি ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে।

এহেন নাজুক সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাত্‌ফানদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রসূল!আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা ? অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের এটা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই ? না কি নিছক আমাদেরকে বাঁচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব দিচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাচাবার জন্য এ ব্যাবস্থা অবলম্বন করছি। কারন আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।আমি তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।"একথায় উভয় সরদার এক কন্ঠে বলেন, "যদি আপনি আমাদের জন্য এ চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন।যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনারগৌরব অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে? আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি।

এ সময় গাত্‌ফান গোত্রের আশ্‌জা' শাখার না'ঈম ইবনে মাস'উদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তিনি বলেন, এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহনের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোন কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো।* একথায়

তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশী।তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান তো অবরোধে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখনো বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না যতক্ষণ বাইর থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তোমাদের কাছে যিম্মি হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা গোত্রসমূহের সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিম্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও গাতফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিম্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং তাদেরকে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতকর্তার সাথে কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের লোকেরা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযার নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। আগামীকাল তোমরা ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই সংগে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবো। বনী কোরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিম্মী স্বরূপ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা না'ঈমের কথা সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিম্মী দিতে অস্বিকার করে । ফলে বনী কুরাইযা বিশ্বাস করে না'ঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শত্রুশিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়।

*এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাহ বলেছিলেন ---**অর্থাৎ যুদ্ধে প্রতারণা করা বৈধ।**

এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। এত বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল। এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধূলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত, বজ্রপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে ওঠে ময়দানে একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দান শত্রুশূন্য দেখে সংগে সংগেই বলেনঃ

“এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না এখন তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।” এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (Offensive) শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিব্রীল (আ) এসে হুকুম শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোসণা করে দিলেন, “যে ব্যক্তিই শ্রবণ ও অনুগত্যের

ওপর অবিচল আছো সে আসরের নামাজ ততক্ষন পর্যন্ত পড়ো না যতক্ষণ না বনী কুরাইযার আবাসস্থলে পৌঁছে যাও।" এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি হযরত আলীকে (রা)একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন সেখানে পৌছলেন তখন ইহুদিরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহাঅপরাধ করেছিল তার দন্ড থেকে এ গালাগালি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো? হযরত আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে করেছিল এরা এসেছে নিছক ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছে গেল এবং তাদের জনবসতি ঘেরাও করে নেয়া হল তখন তাদের হুশ হলো। দু'তিন সপ্তাহের বেশী তারা অবরোধের কঠোরতা বরদাশ্ ত করতে পারলো না। অবশেষে তারা এ শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ আশায় হযরত সা'দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন যেমন ইতিপূর্বে বনী কাইনুকা' ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবী করছিল। কিন্তু হযরত সা'দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু'টি ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কি ষরযন্ত্রটাই না করেছিল সে ঘটনা

এখনো তার সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেনঃ বনী কুরাইযার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনীকুরাইযার পল্লীতে। সেখানে তারা দেখলো, আহযাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত তলোয়ার, ৩ শত বর্ম,২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। মুসলমানরা জদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ঠিক এমন এক সময় পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহার করা হতো যখন সামনে থেকে মুসরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই থাকেনি যে , হযরত সা'দ ইহুদিদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

সামাজিক সংস্কার

ওহোদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দু'টি বছর যদিও এমন সংকট এবং গোলযোগে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহাবীগণ এক দিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ সমগ্র সময়-কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য ছিল দত্তক গ্রহন। আরবের লোকেরা যে শিশুকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মত মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ

করতো।তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং পিতার মৃত্তুর পর তার বিধিবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও গর্ভধারিনী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারাম হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই স্ত্রীলোককে তার আপন ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল। আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোন অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পথরোধ করতে চায় এ রীতি সেগুলোর বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে সাহয্য করছিল।কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো হতে পারে না।এসব কৃত্তিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারনে ইসলামের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবী হচ্ছে এই যে, দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে।

সূরা আল-আহযাব (৩৩:৩৫) এর বিস্তারিত তাফসির:

১০টি গুণ ও সুসংবাদ: আল্লাহ তাআলা আয়াতে বর্ণনাকারী নারী ও পুরুষের ১০টি গুণ বর্ণনা করেছেন, একজন মুমিনের এই বিকল্পের জন্য [৬, ১০, ১২]

মুসলিম (মুসলিম) : অল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী নারী ও পুরুষ [৭]।

প্রকৃত মুসলিম মুখে দাবি করার বিষয় নয়। এর জন্য ঈমানের বিশুদ্ধতা জরুরি। তাই মহান আল্লাহ ঈমানদারদের প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসুলের উপর নাজিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাজিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে পতিব হবে। (সুরা নিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

'হে ঈমানদাররা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা বাকারা: ২০৮)

মুমিন (মুমিনাত): ঈমান আনয়নকারী নারী ও পুরুষ [৬]।

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ

وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। আত তাওবা **১১১**

কানীৎ (কানীযাত): আনুগত্যকারী নারী ও পুরুষ [৭]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। - সুরা মুহাম্মদ-৩৩

সাদিক (সাদিকাত): সত্যবাদী নারী ও পুরুষ [৬]।

সাবির (সাবিরিত): ধৈর্যশীল নারী ও পুরুষ [১২]।

খাশে (খাশেয়াত): ভয়ে ভয়ে বিয়য়ী নারী ও পুরুষ [৭]।

মুতাছদ্দিক (মুতাছদ্দিকা): সদকা বা দানকারী নারী ও পুরুষ [৬]।

ছায়েম (ছায়েমাত): রোজা পালনকারী নারী ও পুরুষ [৬]।

হাফেজ (হাফেজাত): ঈশ্বরের স্থান হেফাজতকারী (পবিত্রতা প্রদানকারী) নারী ও পুরুষ [৭]।

জাকের (জাকেরাত): ভয়ানক জিকির বা শিকারকারী নারী ও পুরুষ [৩।

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا

আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দন্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। - ফুরকান ৬৪

জনগণঃ যাদের এই গুণগত অধিকারী হবে, তাদের জন্য ফরমান এবং মহান নেতা (জান্নাত) প্লেন করবেন [৬, ১২]।

বইঃ ইসলামী সংগঠন দেখুন পৃষ্ঠা ২০৪, বিভিন্ন দোয়া মুখস্ত,

মাসয়ালাঃ আক্বিকা সংক্রান্ত; দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯২

অনুশীলনী -২১(**নভেম্বর -২য় সপ্তাহঃ**)

দারস তৈরী -সূরা ইখলাস দেখুন পৃষ্ঠা ১৯৩,

বই নোটঃ পলাশী থেকে বাংলাদেশ

অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ' বইটি মূলত **১৭৫৭** সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়া থেকে শুরু করে **১৯৭১** সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা। বইটিতে লেখক মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাংলাদেশের জন্মের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন।

বইয়ের মূল বিষয়বস্তু ও নোটঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা এবং শোষণের চিত্র [৪, ৫]।

বিভেদ নীতিঃ ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ও তার প্রভাব [৪]।

পাকিস্তান আন্দোলনঃ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট।

বাংলা ভাষা ও স্বাধিকার আন্দোলনঃ পাকিস্তান আমলের বৈষম্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম [১]।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, প্রবাসে সরকার গঠন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাবলী [১, ৩]।

বইটিতে মোট ১০ টি অধ্যায় রয়েছে

অধ্যায় ০১ : ইংরেজ রাজত্ব

পলাশী থেকে বাংলাদেশ

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব

অধ্যায় ০২ : স্বাধীনতা আন্দোলন

অধ্যায় ০৩ : পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলাম

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলাম

আইয়ুব খানের যুগ

মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগের রাজনৈতিক পরিণাম

নির্বাচনের পর

এরপর যা ঘটল

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন

অধ্যায় ০৪ : ভারত বিরোধীদের পেরেশানী

ভারতের ভূমিকা

ভারত বিরোধীদের পেরেশানী

অধ্যায় ০৫ : স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি

সরকারের ভ্রান্তনীতি

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে

গণতন্ত্রের প্রশ্নে

অর্থনৈতিক ময়দানে

ভুট্টো-ইয়াহইয়া ষড়যন্ত্র

অধ্যায় ০৬ : ইসলামপন্থীদের সংকট

বাংলাদেশ আন্দোলনে ইসলামপন্থীদের সংকট

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীদের ভূমিকা

অধ্যায় ০৭ : ৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা
৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা
জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে পূর্বপাকিস্তানের সমস্যা কী ছিল?
অধ্যায় ০৮ : বংগভংগ ও পূর্ব বাংলার উন্নয়ন
বংগভংগ আন্দোলন
বংগভংগ বাতিল আন্দোলন
পূর্ব বাংলার উন্নয়ন
কেন সার্বিক উন্নয়ন হলো না?
নি:স্বার্থ নেতৃত্বের অভাব
অধ্যায় ০৯ : এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা?
শেষ কথা
অধ্যায় ১০ : যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি তার কি স্বাধীনতা বিরোধী ছিল?
রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতাবিরোধী হওয়া এক কথা নয়
শেরে বাংলার উদাহরণ
শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদাহরণ

আলোচনায় ইসলামীর অতীত ও বর্তমানের ভূমিকা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে আদর্শ ও ব্যাখ্যার প্রশ্নে ইসলামী আপোসহীন। দুনিয়ার কোন স্বার্থে কখনো আদর্শ বা বোঝার বিসর্জন দেয়। এটুকু আলোচনামূলকথা যারা উপলব্ধি করে, তাদের ব্যবহার ৭১-এ বিষয়ে কোনো ভূমিকার বিষয়ে কোনো পক্ষ নয়।

এবং

মানুষের জন্য বিশ্বাস রাখার জন্য, পছন্দ করার জন্য সঠিকভাবে বিচার করা হচ্ছে। এই আশংকা দেখানো সমীকরণ জিস্যাশা আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে। শুধু দেশ নয় সহ দল, নেজামে ইসলামী অনেক দল এবং জনগণের বড়

একটি অংশকে সমর্থন করতে পারে। বলাবাহুল্য, পূর্বই সমর্থনে সামনে সে সময় সামনের একটি দল ছিল।

এবং

এখন বাংলাদেশ নামক যে জনপদে আমরা বাস করছি, এই জনপদকে শুধু ১৯৭১ থেকে চিন্তা করতে হবে, এর ইতিহাসের প্রতিবেদন। পাল বংশ, সেন বংশ, শাহী থেকে শুরু করে শায়েস্তা খান, সুবাদার খান ইসলাম, সিরাজুদ্দৌলা, অতঃপর ৪৭ এর পর বর্তমান বাংলাদেশ। এর পদক্ষেপে বহুবার এই ভূখণ্ডের মানচিত্র পরিবর্তন করা হয়েছে, নির্বাচনে পরিবর্তন করা হয়েছে, শাসকের পরিবর্তন করা হয়েছে, মানুষ কখনো স্বাধীনতা পেয়েছে, কখোনো বঞ্চিত হয়েছে।

৪৭ এর পাকিস্তান-ভারত বিভাজনের আগে এই অঞ্চলের মানুষগুলো চরমভাবে নিষ্পেষিত ছিল ব্রিটিশ শাসক আর হিন্দু শেঠ ও জমিদারদের হাতে। ৭১ এ বহু মানুষ বেঁচে ছিলেন যাদের স্মৃতিতে তখনও বৃটিশ-হিন্দুদের নিষ্পেষণ জ্বলজলে ছিল। ৭১ এ ভারতের সহায়তায় যুদ্ধ করে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দূর্বল পূর্ব পাকিস্তান আদৌ পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারবে নাকি ভারতের মত চানক্যবাদী রাষ্ট্রের করাল গ্রাসে বিলিন হতে হবে তা নিয়ে আশংকা ছিল সচেতন মানুষের মনে।

জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ সাধারণ মানুষের বড় একটি অংশ ৪৭ এর অর্জন নস্যাত হয়ে ভারতের গোলামীতে পুনরায় ফিরে যাবার আশংকা থেকেই ৭১এর স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিতে পারেনি। যে ইসলামী আন্দোলন এ ভূখন্ডে ইসলামী রাষ্ট্র দেখতে চায় তা ব্রাহ্মণবাদী ভারতের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব তা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

তৃতীয়ত

জামায়াত মনে করেছিল শেখ মুজিব যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের আস্থা অর্জন করতে পারেনি তেমনি ভূট্টোও পূর্ব পাকিস্তানের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। সুতরাং সমগ্র

পাকিস্থানের একক কোন গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি না থাকায় দুই দেশ পার্লামেন্টের মাধ্যমে এমনিতেই ভাগ হয়ে যেত। অনেক দেশই শান্তিপূর্নভাব স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। ভারত-পাকিস্থান তার প্রকৃত উদাহরণ। জামায়াত মূলত এটাই চেয়েছিল। তাদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল ভারতের সহায়তায় এদেশ স্বাধীন হলে এদেশ অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণভাবে ভারতের বাজারে পরিণত হবে যাকে কখনোই প্রকৃত স্বাধীন বলা যাবে না। এ কারনেই কিছুদিন আগে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন "জামায়াত যে আশঙ্কায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি, দেশ এখন সেদিকেই যাচ্ছে।"

চতুর্থত

আদর্শগত কারণেই জামায়াতের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের সহযোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করে, তারা এ দুটো মতবাদকে তাদের ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করতে বাধ্য। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস দলের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকেই এ মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশে যারা ভাঙ্গনের পক্ষে কাজ করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক। আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মহীনতা।

পঞ্চমত

পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের অতীত আচরণ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে এদেশের এবং মুসলিম জনগণের বন্ধু মনে করাও কঠিন ছিল। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সঙ্গত কারণেই তাদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হবে এর পরিণাম মংগলজনক হতে পারে না বলেই জামায়াতের প্রবল আশংকা ছিল।

ষষ্ঠত

জামায়াত একথা বিশ্বাস করত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে গোটা পাকিস্তানে এ অঞ্চলের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। তাই জনগণের হাতে ক্ষমতা বহাল করার আন্দোলনের মাধ্যমেই জামায়াত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল।

সপ্তমত

জামায়াত বিশ্বাস করত যে, প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী দেশটির বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকাই সুবিধাজনক। আলাদা হয়ে গেলে ভারত সরকারের আধিপত্য রোধ করা পূর্বাঞ্চলের একার পক্ষে বেশি কঠিন হবে। মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় এ অঞ্চলের নিরপত্তা প্রশ্নটি জামায়াতের নিকট উদ্বেগের বিষয় ছিল।

অষ্টমত

জামায়াত একথা মনে করত যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতের সাথে সমমর্যাদায় লেনদেন সম্ভব হবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব জিনিস এখানে আমদানি করা হতো, আলাদা হবার পর সে সব ভারত থেকে নিতে হবে। কিন্তু এর বদলে ভারত আমাদের জিনিস সমপরিমাণে নিতে পারবে না। কারণ রফতানির ক্ষেত্রে ভারতের আমাদের প্রয়োজন নেই। ফলে আমরা অসম বাণিজ্যের সমস্যায় পড়ব এবং এদেশ কার্যত ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

নবমত

জামায়াত পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হলে

বে-ইনসাফী, যুলুম ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসবে।

এসব কারণে জামায়াতে ইসলামী তখন আলাদা হবার পক্ষে ছিল না। কিন্তু **১৯৭১** সালের **১৬**ই ডিসেম্বর থেকে এদেশে যারাই জামায়াতের সাথে জড়িত ছিল, তারা বাস্তত সত্য হিসাবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে। যে জামায়াত বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য, বাংলাদেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য, ইসলামের আদর্শকে উচ্চকিত রাখার জন্য পাকিস্তান ভাঙ্গনের বিরোধীতা করেছে সে জামায়াত কখনোই বাংলাদেশবিরোধী হতে পারে না। এই ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে জামায়াত। এই ভূখণ্ডকে সব ধরণের অকল্যাণ থেকে রক্ষার জন্য জামায়াতের কর্মীরা জীবনবাজী রাখতে প্রস্তুত।

স্বাধীনতার বিরোধিতা আর যুদ্ধাপরাধ এক জিনিস নয়

মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার বিরোধিতা করা আর যুদ্ধের সময় অপরাধ করা এক জিনিস নয়। যে কোন একটি কাজের বিরোধিতা করার অধিকার সকলেরই আছে। এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ৪৭ এ ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন অনেকেই, কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাবার পর তা মেনে নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায়ও এসেছেন, তারা মনে করেছিলেন পাকিস্তান ভাগ না হওয়াটাই ভাল হবে। এ ধরণের বিরোধিতা চিন্তা ও মত প্রকাশ স্বাধীনতারই অংশ। শেরে বাংলা লাহোর প্রস্তাব করলেও ৪৬ এর নির্বাচনে পাকিস্তানপন্থিদের বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছেন, পরবর্তীতে সেই পাকিস্তানেরই মন্ত্রী হয়েছেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে যখন বঙ্গদেশ ও আসামকে মিলিয়ে "গ্রেটার বেংগল" গঠন করার উদ্দেশ্যে তিনি শরৎ বসুর সাথে মিলে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হলে পূর্ববঙ্গ

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো না। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক। পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক মুসলমানের স্বার্থরক্ষা এবং কোলকাতা মহানগরীকে এককভাবে হিন্দুদের হাতে তুলে না দিয়ে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের প্রাধান্য রক্ষাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি পূর্ববঙ্গে আসেন, তখন তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে পাকিস্তানের দুশমন বলে ঘোষণা করা হয় এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য তিনিই পরে পাকিস্তানের উজিরে আযম (প্রধানমন্ত্রী) হবারও সুযোগ লাভ করেন। বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রয়োজনে দুর্বল নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক গালির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের গালি দ্বারা কোন দেশপ্রেমিক জননেতার জনপ্রিয়তা খতম করা সম্ভব হয়নি।

তাই '৭১-এর ভূমিকাকে ভিত্তি করে যে সব নেতা ও দলকে "স্বাধীনতার দুশমন" ও "বাংলাদেশের শত্রু" বলে গালি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যতই বিষেদাগার করা হোক, তাদের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও জনপ্রিয়তা ম্লান করা সম্ভব হবে না।

সুত্রঃ https://web.facebook.com/BJI.Official/posts

পরামর্শ সংক্রান্ত ১টি আয়াতঃ

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) 'আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর' (সূরা আলে ইমরান: ১৯৫)।

(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) . 'তাদের কার্যাবলী তাদের মাধ্যমে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে' (সূরা আশ-শুরা: ৩৮)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন। সূরা আলে ইমরান: ১৫৯

সুরা- মুজাদালা- ৯-১০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন সে গোপন পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না কর।(১) আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

১০. গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। অতএব আল্লাহর উপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে।

পরামর্শ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্তঃ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ

৬২৯০. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোথাও তোমরা তিনজনে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই। *[মুসলিম ৩৯/১৫, হাঃ ২১৮৪, আহমাদ ৪৪২৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৪৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪০)*

মাসয়ালা: সাদাকা সংক্রান্ত

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

অর্থাৎ, তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত ক'রে দেবে। (সূরা তওবা ১০৩ আয়াত)

ইসলামে সাদাকা (দান) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। এটি শুধুমাত্র সম্পদ হ্রাস করে না, বরং বৃদ্ধি করে এবং নানা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। সাদাকা সংক্রান্ত জরুরি মাসয়ালা ও বিধিবিধান নিচে দেওয়া হলো:

সাদাকার ফযীলত ও গুরুত্ব

গুনাহ মাফ: সাদাকা মানুষের গুনাহের কাফফারা বা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি: হালাল উপায়ে অর্জিত মাল সাদকা করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন এবং তার সওয়াব বৃদ্ধি করে পর্বতসম করে দেন।

বিপদ থেকে রক্ষা: সাদাকা-খয়রাত রুগ্ন ব্যক্তির জন্য মহৌষধ এবং এটি কিয়ামতের দিন ছায়া প্রদান করবে।

সম্পদ বৃদ্ধি: দান করলে সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে।

সাদাকার প্রকারভেদ

১. সাদাকাতুল ফিতরঃ রমজানের শেষে ঈদুল ফিতরের আগে যে সাদাকা আদায় করা ওয়াজিব।

২. সাদাকায়ে জারিয়া (চলমান সওয়াব): এমন দান যার কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী (যেমন- মসজিদ, মাদ্রাসা, নলকূপ স্থাপন, গাছ লাগানো, জ্ঞান বিতরণ) এবং মৃত্যুর পরেও এর সওয়াব পাওয়া যায়।

৩. সাধারণ সাদাকাঃ যেকোনো সময় অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা বা ভালো কাজ করা।

সাদাকার মাসায়েল ও বিধিবিধান

হালাল উপার্জনঃ অবশ্যই হালাল উপার্জিত সম্মপদ থেকে সাদাকা করতে হবে।

গোপনীয়তাঃ সাদাকা গোপনে দেওয়া উত্তম, তবে জনসমক্ষে প্রকাশ করলেও তা গ্রহণযোগ্য।

পারিবারিক অগ্রাধিকারঃ আত্মীয়-স্বজন, যারা অভাবী, তাদের আগে সাদাকা দেওয়া উত্তম।

অমুসলিমকে দানঃ অমুসলিমদেরও সাধারণ সাদাকা দেওয়া যায়।

সাদাকার খাতঃ অভাবী, এতিম, বিধবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে সাদাকা দেওয়া যায়।

হাসিমুখঃ কারো সাথে হাসিমুখে কথা বলা বা ক্ষতিকর বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলাও সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়।

মৃত্যুর পরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকা করা যায় এবং এর সওয়াব মৃত ব্যক্তি পান।

সাদাকা ও যাকাতের পার্থক্য

যাকাত: সম্পদশালীদের ওপর বছর শেষে বাধ্যতামূলক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মপদ আদায় করা ফরজ।
সাদাকা: এটি ঐচ্ছিক বা নফল ইবাদত, যা যেকোনো সময় দেওয়া যায়। মূলত, সাদাকা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ও পরকালের পাথেয় অর্জনের একটি সহজ ও কার্যকরী মাধ্যম।

গোপন-প্রকাশ্যে যেকোনোভাবে দান করা যায়। সব দানেই সওয়াব রয়েছে। দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের মাঝে রিজিকের ভারসাম্যতা রক্ষা করেন। বিনিময়ে প্রতিদানও দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-সদকা করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকির-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে আরো বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন' (সূরা বাকারা, আয়াত-২৭১)। ইসলামী পরিভাষায় দান করাকেই সদকা বলা হয়। সদকা শব্দটি এসেছে আরবি 'সিদকুন' থেকে। অর্থ সত্যতা, যথার্থতা। পরিভাষায় সদকা বলা হয়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করা। কারণ, মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু এবং জীবন যাপনের প্রধান উপকরণ কষ্টার্জিত মাল ব্যয় করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা এবং তার নির্দেশাবলির প্রতি আনুগত্যের বাস্তব প্রমাণ দিয়ে থাকেন বলে এই ব্যয়কে সদকা নামে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন-হাদিসে অত্যাবশ্যক এবং ঐচ্ছিক এ উভয় প্রকার দানকেই সদকা বলা হয়েছে। তবে প্রচলিত অর্থে শুধু ঐচ্ছিক নফল দানকেই সদকা বলা হয়ে থাকে।

সদকা দুই প্রকার, ১. সাধারণ সদকা; ২. সদকায়ে জারিয়া। গরিব দুঃখীকে টাকা পয়সা দান করা, ভালো ব্যবহার করা সাধারণ সদকার অন্তর্ভুক্ত। আর সদকায়ে জারিয়া বলা হয় ওই সব সৎকর্ম যেগুলোর কল্যাণকারিতা স্থায়ী হয়। এর মধ্যে সর্বাগ্রে হচ্ছে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দান, দ্বীনি বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মধ্যে এলেম পৌঁছানো। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে

মানবসন্তানের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর বিষয় হচ্ছে আল্লাহর সাথে, তাঁর বিধি-বিধানের সাথে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পরিচিতি লাভ। তার পরের স্থান মাসজিদ, এতিমখানা, মাদরাসা, রাস্তাঘাট, সেতু-পুকুর প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক খাতে দান করা। এসবের দ্বারা অনেক বেশি লোক উপকৃত হন এবং উপকারটুকু দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

হজরত আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি ব্যতীত সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান অথবা সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে' (সহিহ মুসলিম, হাদিস-১৬৩১)। ইমাম আন-নববী রহঃ এই হাদিসটির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'সদকায়ে জারিয়া হলো ওয়াকফ' (শরহে মুসলিম -১১/৮৫)।

দান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দানের অনেক ফজিলত আছে। হাদিসে পাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ফজিলতের কথা তুলে ধরেছেন। যারা গোপনে দান করেন, কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের আরশের নিচে ছায়া ও শান্তি দান করবেন। দান-সাদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। দান জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। আরও অনেক ফজিলত আছে দানের। হাদিসের বর্ণনায় ওঠে এসেছে সেসব ফজিলত- সদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয়। এটি গুনাহের কাফফারা। হাদিসে পাকে এসেছে- হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফেতনা সম্পর্কিত হাদিস মনে রেখেছো? হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি (আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে) বড় দুঃসাহসী

ছিলে, (বল তো) তিনি কিভাবে বলেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, (হাদিসটি হলো)- মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশি নিয়ে ফেতনায় পতিত হবে আর নামাজ, সাদকা ও নেক কাজ সেই ফেতনা মুছে দেবে।...

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ

পরিচ্ছেদঃ ২৪/২৩. সদাকাহ গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

১৪৩৫. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ফিতনা সম্পর্কিত হাদীস মনে রেখেছ? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। ‘উমার (রাঃ) বললেন, তুমি [আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে] বড় দুঃসাহসী ছিলে, তিনি কিভাবে বলেছেন (বলতো)? তিনি বলেন, আমি বললাম, (হাদীসটি হলোঃ) মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশি নিয়ে ফিতনায় পতিত হবে আর সালাত, সাদাকা ও নেক কাজ সেই ফিতনা মুছে দিবে। সুলাইমান [অর্থাৎ ‘আমাশ (রহ.)]

বলেন, আবূ ওয়াইল কোন কোন সময় সালাত, সাদাকা ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে বলতেন। ‘উমার (রাঃ) বলেন, আমি এ ধরনের ফিতনার কথা অবগত হতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সাগরের ঢেউয়ের মত প্রবল বেগে ছুটে আসবে। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমীরুল মু‘মিনীন! আপনার জীবনকালে ঐ ফিতনার কোন ভয় নেই। সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে বদ্ধ দরজা রয়েছে। ‘উমার (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, দরজা কি ভেঙ্গে দেয়া হবে না কি খুলে দেয়া হবে? হুযাইফাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, না বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। ‘উমার (রাঃ) বললেন, দরজা ভেঙ্গে দেয়া হলে কোন দিন তা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, সত্যই বলেছেন। আবূ ওয়াইল (রাঃ) বলেন, দরজা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে- এ কথা হুযাইফাহ (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করে জানতে আমরা কেউ সাহসী হলাম না। তাই প্রশ্ন করতে মাসরূককে অনুরোধ করলাম। মাসরূক (রহ.) হুযাইফাহ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিলেনঃ দরজা হলেন ‘উমার (রাঃ)। আমরা বললাম, আপনি দরজা বলে যাকে উদ্দেশ্য করেছেন, ‘উমর (রাঃ) কি তা অনুধাবন করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আগামীকালের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত (তেমনি নিঃসন্দেহে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন)। এর কারণ হলো, আমি তাঁকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছি, যাতে কোন ভুল ছিল না। *(বুখারি ১৪৩৫) (৫২৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩৪৯)*

সূত্রঃ https://www.teachers.gov.bd/blog/details/731146

অনুশীলনী -২২(**নভেম্বর -৪র্থ সপ্তাহঃ**)

দারস তৈরী -সূরা কাউসার

সূরা কাউসারের আরবি, উচ্চারণ ও অর্থঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

উচ্চারণ:ইন্না আ'তাইনা কালকাউছার।

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (প্রচুর কল্যাণ/জান্নাতের নহর) দান করেছি ।

2. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

উচ্চারণ: ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার।

অর্থ: আপনার পালনের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানি করুন ।

3. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

উচ্চারণ: ইনা শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থ: নিশ্চয়ই আপনার জিনিস (বংশহীন/মূলহীন) সে-ই নির্বংশ ।

নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الكوثر। কাউসার শব্দ থেকেই কাউসার নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ সূরাকে সূরা নাহারও বলা হয়। কাউসার দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাউজে কাউসার, যা কিয়ামতের মাঠে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রদান করা হবে।

শানে নুযূল: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্রসন্তানগণ (হযরত কাশিম, আব্দুল্লাহ, বিশেষ করে ইব্রাহীম) একে একে শৈশবেই ইন্তেকাল করলে মক্কার কাফের বিশেষ করে আস ইবনে ওয়ায়েল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'আবতার' বা নির্বংশ বলে উপহাস করতো। তারা মনে করতো, নবীজির পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি ইন্তেকালের পর তার নাম নেয়ার মতো কেউ থাকবে না। এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে অনেক কষ্ট পেতেন।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তার প্রিয় হাবীব কে প্রশান্তি দিতে এই সুসংবাদযুক্ত সুরাটি নাযিল করেন।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসিমুখে বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: এইমাত্র আমার ওপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাউসার পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: কাউসার কী তোমরা জান? জবাবে সাহাবাগণ বললেন: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: কাউসার হলো : জান্নাতে একটি নহর আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন, তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (আহমাদ ৩/১০২, সনদ সহীহ)

আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাউসার দান করেছেন। এ কাউসার দ্বারা উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে আলেম সমাজে মতামত রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম দু'টি হলো:

১. কাউসার দ্বারা জান্নাতের নহর উদ্দেশ্য। আয়িশাহ (রাঃ) কে (إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি জবাবে বলেন :

خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) قَالَتْ نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ.

কাউসার হলো জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি নহর যা তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রদান করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা. ৪৯৬৫) এ ছাড়াও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে।

২.কাউসার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কল্যাণকে বুঝানো হয়েছে। আর এ কল্যাণের মাঝে জান্নাতের কাউসার নামক নহরও শামিল। অধিকাংশ আলেম এ কথা বলেছেন। (ইবনু কাসীর, তাফসীর সা'দী, তাফসীর মুয়াসসার।) আর এটাই সঠিক, কেননা এতে ব্যাপকতা রয়েছে।

জান্নাতের হাউজে কাউসারের বিবরণ: জান্নাতের হাউজে কাউসার এখনও বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : وإني والله لأنظر إلي حوض الان আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি এখন আমার হাউজ প্রত্যক্ষ করছি। (সহীহ বুখারী হা. ২৪৬১, ৬১৩৭, সহীহ মুসলিম হা. ১৭২৭) অন্যত্র তিনি বলেন : ومنبري علي حوضي আমার মিম্বার আমার হাউজে কাউসারের ওপর। (সহীহ বুখারী হা. ১১৮৮, ১১৯৬, সহীহ মুসলিম হা. ১৩৯১)

আল্লামা ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর আক্বীদাহ ওয়াসিতিয়া গ্রন্থে হাউজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: হাউজের পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, তার পেয়ালা আকাশের তারকার সংখ্যাতুল্য, যে ব্যক্তি একবার পান করবে পরবর্তীতে কখনও পিপাসার্ত হবে না, এর দৈর্ঘ্য এক মাসের দূরত্বের সমান এবং প্রস্থ এক মাসের দূরত্বের সমান। (আক্বীদাহ ওয়াসিতিয়াহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : কাউসার হলো একটি নহর যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত এ হাউজের নিকটে সমবেত হবে, যার পেয়ালা হবে তারকা সমতুল্য। কিছু লোককে হাউজ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে, তখন আমি বলব : হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার উম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তুমি জান না, তোমার পর তারা কত রকম বিদআত তৈরি করেছে। (সহীহ মুসলিম হা. ২২৯৯, আবূ দাউদ হা. ৪৭৪৭)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : মি'রাজের রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ দেখি যে, আমি একটি নহরের পাশে দণ্ডায়মান যার দুপার্শ্বে মুক্তার তৈরি তাঁবু রয়েছে। তাতে পানি প্রবাহিত হয় তাতে হাত দিয়ে দেখলাম : তা মিশকের মত সুঘ্রাণযুক্ত। জিবরীল (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : এটা কী? জবাবে তিনি বললেন : এটা কাউসার যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন। (আহমাদ ৩/২৪৭, সনদ সহীহ।)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অর্থাৎ যেমন আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক কল্যাণ দান করেছি—তার মধ্যে কাউসার অন্যতম একটি তেমন তোমার খালেসভাবে রবের জন্য সালাত ও কুরবানী সম্পন্ন কর, আর তাতে কাউকে অংশী স্থাপন কর না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলছেন: (قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ) "বল : 'আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ শুধুমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' 'তাঁর কোন শরীক নেই

এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।" (সূরা আনআম ৬ : ১৬৩-১৬৪)

وَانْحَرْ-- نحر শব্দের প্রকৃত অর্থ উটের কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করে জবেহ (নহর) করা ও অন্যান্য পশুকে মাটির ওপর শুইয়ে তার গলায় ছুরি চালানোকে জবেহ বলা হয়। এখানে نحر দ্বারা উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বান বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন : কেউ বলেছেন সালাতে নহরের নীচে ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখা। আর কেউ বলেছেন–তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তোলন করা। আবার কেউ বলেছেন–কেবলামুখী করে কুরবানী বা নহর করা। (ইবনু জারীর) সঠিক কথা হলো : نحر দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানীর পশু যদি উট হয় নহর করা আর অন্য পশু হলে জবেহ করা। (ইবনু কাসীর) এজন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের সালাত আদায় করে কুরবানীর পশু নহর বা জবেহ করতেন। আর এটাই হলো সুন্নাত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যারা আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং কুরবানী করল তারা সঠিকভাবেই কুরবানী করল। আর যারা সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে তাদের কুরবানী হয়নি (সাধারণ যবেহ করা হলো)। (সহীহ বুখারী হা. ৯৮৩)

আয়াতে যদিও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মোধন করে বলা হয়েছে, তবে শুধু তার জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং সকলের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। অনেকে এ আয়াত দ্বারা বুঝাতে চান যে, কুরবানী করা ওয়াজিব। আসলে বিষয়টি এমন নয়, বরং কুরবানী অবস্থাভেদে তার হুকুম ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে সাধারণ বিধান হল সুন্নাত। এ আয়াত কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে না। (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : একদা কা'ব বিন আশরাফ

মক্কায় আগমন করে, তখন কুরাইশরা বলে : আপনি তো তাদের সর্দার, আপনি কি ঐ ছোকরাকে (মুহাম্মাদ) দেখতে পান না? সে তার জাতি থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে, আবার নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবী করছে? অথচ আমরা হাজীদের বংশধর, কাবা ঘরের তত্ত্বাবধান এবং যমযম কূপের দেখাশোনা করি। কাব বিন আশরাফ বলেন: তোমরাই শ্রেষ্ঠ। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইমাম ইবনু কাসীর বলেন : সনদ সহীহ।)

অন্যান্য বর্ণনায় তা আবূ জাহলের এমনকি আবূ লাহাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনু কাসীর) যে বর্ণনায় বলা হয়েছে, যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুত্রগণ পরপর মারা যেতে লাগল এবং সর্বশেষ পুত্র ইবরাহীম মারা গেল তখন আস বিন ওয়ায়িল বলল : বাদ দাও মুহাম্মাদের কথা, সে এমন লোক যার কোন বংশধর বাকী নেই, সে লেজকাটা নির্বংশ। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। (ইবনু হিশাম ১/৩২২, সূরা কাউসারের আলোচনা।) الْأَبْتَرُ। এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে নির্বংশ, যার পুত্র সন্তান জীবিত থাকে না।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ ১. বিদ‘আতীরা কাউসারের পানি পান করার সৌভাগ্য লাভ করবে না। ৩. সালাতের মত কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই তা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

সুত্রঃ https://khurshid420.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html

বই নোট: ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ

লেখকঃ এ. কে. এম. নাজির আহমদ

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা।

পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৬৮।

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী পুনর্জাগরণ, তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি দূরীকরণ এবং নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলায় অসামান্য অবদান রাখা তিন কালজয়ী পথিকৃৎ হলেন হাসানুল বান্না (রহ.), বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী (রহ.) এবং সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) । তাঁরা যথাক্রমে মিসর, তুরস্ক ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, দাওয়াহ এবং চিন্তাধারার প্রসারে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন ।

১. শায়খ হাসানুল বান্না (রহ.) (১৯০৬-১৯৪৯):

পরিচয়: মিসরে 'আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা

অবদান: তিনি আধুনিক যুগে ইসলামী দাওয়াহর একটি সুসংগঠিত রূপরেখা তৈরি করেন। যুব সমাজকে ইসলামের দিকে ডাকতে এবং ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে তিনি অসামান্য ভূমিকা রাখেন ।

২. বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী (রহ.) (১৮৭৮-১৯৬০):

পরিচয়: তুরস্কে নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের মহানায়ক ।

অবদান: তাঁর রচিত 'রিসালা-ই-নূর' (জরংধষব-র ঘঁৎ) সমগ্র কুরআনভিত্তিক জ্ঞান যা কুফরি মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ভেঙে দেয়। তিনি ঈমান পুনর্গঠন এবং কুরআন শিক্ষার প্রসারে নিরলস কাজ করেছেন।

৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) (১৯০৩-১৯৭৯):

পরিচয়: ভারতীয় উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ

অবদান: তিনি ইসলামের রাজনৈতিক ও সামষ্টিক রূপ, আধুনিক যুক্তিতে তুলে ধরেন। তাঁর তাফহীমুল কুরআন এবং অন্যান্য সাহিত্য ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে । - AI Review

নোটের মূলকথা:

এই তিন ব্যক্তিত্বই নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচলিত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে "**ইসলামই একমাত্র সমাধান**" - এই বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন এবং মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী জাগরণে যে তিন জন ব্যাক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য, তারা হচ্ছেন তুরস্কের বাদীউয-যামান সাঈদ নুরসী, মিশরের হাসানুল বান্না এবং এই উপমহাদেশের সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। নাস্তিক্যবাদ, অংশীবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং পশ্চিমা সভ্যতার নোংরা জীবন দর্শন যখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে সমাজকে বিষাক্ত করে তোলে; সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী মতাদর্শের সাথে সাজ্ঘর্ষিক কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়, তখন অতি সাধারণ থেকে উঠে আসা কিছু ব্যাক্তি এর মোকাবিলা করেছেন, সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন ইসলামী জীবনবিধান দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করতে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তাদের বীরত্ব, তাদের সংগ্রামের কথা আজ বইয়ের পাতায় উঠে এসেছে। এমনি তিনজন অকুতোভয় মুসলিম উম্মাহ'র সৈনিককে নিয়ে এ. কে. এম. নাজির আহমদ রচনা করেছেন “ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ”।

প্রথমে বলবো বাদীউযযামান সাঈদ নুরসীর কথা। উসমানীয় খিলাফাহ'র আমলে তুর্কির বিতলিস অঞ্চলে ছোট এক গ্রাম নুরসে জন্ম গ্রহণ করেন সাঈদ, আর এজন্যই তার নাম হয়ে যায় সাঈদ নুরসী। পরবর্তীতে নিজের জ্ঞান গরিমা ও প্রতিভার কারণে তিনি “বাদীউযযামান” উপাধি লাভ করেন।

সাঈদ নুরসী যখন উদীয়মান যুবক তখন সিদ্ধান্ত নেন, ইসলামের খেদমতে, কুরআনের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। সেই থেকে শুরু। প্রথমে তিনি জিযর অঞ্চলে গমন করেন, সেখানে মিরান গোত্রের দুর্ধর্ষ সর্দার মুস্তাফা পাশার সামনে গিয়ে সাহসিকতার সাথে তাকে যুলুম অত্যাচার থেকে বিরত থাকার নাসীহাহ দেন। এরপর অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টার পর মুস্তাফা পাশাকে ছালাত আদায়ে আগ্রহি করে তোলেন। এভাবেই তিনি আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের কাজ করতে থাকেন।

এরপর মারদিন সফর করেন এবং রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন, এর ফলে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে বিতলিস পাঠিয়ে দেয়া হয়। বিতলিসের গভর্নরের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। নুরসী এ সময় ব্যাক্তিগত পড়াশোনায় মনোযোগ দেন। একসময় তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর হাসান পাশার আমন্ত্রণে তিনি ওয়ান (van)-এ যান। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় প্রয়োজন। এ সময় শিক্ষা ব্যাবস্থার ত্রুটি তার কাছে ধরা পড়ে, তিনি মডেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় "মাদ্রাসাতুয যাহ্‌রা" তৈরির পরিকল্পনা করেন।
এ সময় তিনি আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংকল্প করেন। তিনি একদিন পত্রিকায় দেখতে পান, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে **মিঃ গ্লাডস্টোন** বলেছিলেন, **"যতদিন মুসলিমদের হাতে আল-কুরআন থাকবে আমরা তাদের বশ করতে পারবো না। হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে ওইটি নিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যেন এর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে সেই ব্যাবস্থা করতে হবে।"**

এর প্রতিক্রিয়ায় সাঈদ নুরসী বলেছিলেন, I shall prove and demonstrate to the world that the Quran is an undzing, inextinguishable Sun. অর্থাৎ "আমি প্রমাণ করবো ও দুনিয়াকে দেখাবো যে আল-কুরআন মৃত্যুহীন, এবং নিভিয়ে ফেলা যায় না এমন এক সূর্য।"

সাঈদ নুরসীর জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। এক সময় উত্তাল রাজনৈতিক ময়দানে ছিল তার সরব উপস্থিতি, বহুবার গ্রেফতার হয়েছেন, কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হয়েছেন, ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে ফিরে এসেছেন, আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় খিলাফাতের পক্ষে জিহাদের ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে বন্দী হয়েছিলেন, দুই বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর পালিয়ে এসেছিলেন এবং ওয়ার মেডাল লাভ করেছিলেন।

সাঈদ নুরসী একটি নাম, একটি ইতিহাস।

এক সময় রাজনৈতিক ময়দান থেকে ছিটকে পড়েন, কিন্তু রাজনীতির বাহিরে থেকে তিনি যে নীরব বিপ্লব করেছিলেন, কম্যুনিস্ট তুরস্কে আজকে আবার ইসলামী ভাবধারার সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পেছনে তার প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নাই। এই বিপ্লব হাতিয়ারে হাতিয়ারে হয় নি, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক জনের মনোজগৎ থেকে আরেক জনের মনোজগতে হয়েছিল এ বিপ্লব।

উসমানীয় খিলাফাতের পতনের পর তিনি অনেক ভেঙ্গে পড়েন। ইসলামকে পুরোপুরি মুছে দেয়ার চেষ্টা চালায় জালিম কামাল আতাতুর্ক সরকার। তিনি নির্বাসিত ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নির্বাসিত হয়েছেন, এক জেল থেকে আরেক সেলে, হয়েছিলেন অত্যাচারিত, এভাবেই কেটে যায় তার বন্দী জীবন। আর নির্বাসনের সময় লিখেছিলেন তার জগৎবিখ্যাত গ্রন্থ "রিসালা-ই-নূর"। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক খাতা থেকে আরেক খাতায় কপি হতো এই বই, এভাবে ছড়িয়ে যায় এই রিসালা-ই-নূরের আন্দোলন, কুরআনী জীবনদর্শনের আন্দোলন। কম্যুনিজমের অন্ধকার তুরস্কে তখনো রিসালা-ই-নূর বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল কুরআনের আলো যা টিম টিম করে জ্বলছিল অন্ধকার তুরস্কে, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল এ নীরব বিপ্লব।

হ্যাঁ, আজকের তুরস্কের এ পরিবর্তনে সাঈদ নুরসীর নীরব বিপ্লবের সাক্ষী হয়ে আছে ইতিহাস। সে যাই হোক, ফিরে আসি বইয়ের আলোচনায়, ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ বইতে অন্য দুইজন হচ্ছেন হাসানুল বান্না এবং আবুল আলা মওদূদী।

হাসানুল বান্না এবং সাইয়েদ মওদূদী উভয়েই নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী আন্দোলন করেছিলেন; হাসানুল বান্না মিশরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমীন আর সাইয়েদ মওদূদী আমাদের উপমহাদেশে তৈরি করেন ইখওয়ানের অনুসরণে "জামা'আতে ইসলামী"। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের দুইজনের ব্যাপক অবদান রয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী ইসলামী জীবনদর্শনের উপর লিখেছিলেন বহু গ্রন্থ প্রবন্ধ। লিখেছিলেন বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন। হাসানুল বান্না এবং সাইয়েদ মওদূদী, দু'জনই ইসলামী আন্দোলনের কারণে বহুবার জেল খেটেছিলেন।

হাসানুল বান্না'র আন্দোলন সেকুলার গোষ্ঠীকে আতঙ্কিত রাখতো, একদিন এক বক্তৃতা শেষে ফেরার সময় হাসানুল বান্না আততায়ীর গুলিতে নিহত হন (আল্লাহ যেন তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন)। সাইয়েদ মওদূদীও কম হত্যাচেষ্টার শিকার হন নি, একই ভাবে সাঈদ নুরসীকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল কারাগারের ভেতরেও।
ইসলামী জীবন বিধানের জন্য যারা কাজ করবেন তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন আর জেল যুলুমের শিকার হতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর পথে সংগ্রামীদেরকে এই অত্যাচার সয়ে নিয়ে কুরআনের জন্য ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে এই শিক্ষা পুঞ্জীভূত হয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

আমার পড়া প্রিয় বইগুলোর মধ্যে এটি একটি, বিশেষ করে সাঈদ নুরসীর জীবনী; তার নির্বাসিত জীবন, বিপ্লবী জীবন আমায় অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও প্রকাশক এ. কে. এম. নাজির আহমদ এমনিতেই সু-লেখক,

তার হাতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই মহান ব্যাক্তিত্রয়ের জীবন ও কর্ম। কুরআনের পথে সংগ্রামী যারা তাদের জন্য এই গ্রন্থটি হতে পারে অনেক অনুপ্রেরণার।

ত্যাগকুরবানী সংক্রান্ত ১টি আয়াত

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এই ধরনের বান্দার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। {আল বাকারাহঃ ২০৭ }

ত্যাগকুরবানী সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ، إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغْطِيَ رَأْسَهُ بِهَا، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدِبُهَا.

২১৫৪. নবী কারীম (ﷺ) এবং সাহাবীদের মদীনা হিজরত।

৩৬৩২। মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর ও মুসাদ্দাদ (রাহঃ) .... খাব্বাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর সাথে হিজরত করেছি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকটই নির্ধারিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফল কিছুই ইহজগতে ভোগ না করে আখিরাতে চলে গিয়েছেন; তন্মধ্যে মুসহাব ইবনে উমায়ের (রাযিঃ) অন্যতম। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য তার একটি চাঁদর ব্যতীত আর অন্য কিছুই আমরা পাচ্ছিলাম না। আমরা চাঁদরটি দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করলাম তাঁর পা বের হয়ে গেল আর যখন আমরা তাঁর পা ঢাকতে গেলাম তখন তাঁর মাথা বের হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের আদেশ করলেন, চাঁদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর ইযখির ঘাস রেখে দাও। আর আমাদের মধ্যে রয়েছেন যাদের ফল পেকে গেছে এবং এখন তাঁরা তা আহরণ করছেন। (সহীহ মুসলিম)

মাসয়ালাঃ নামাজ সংক্রান্ত- দেখুন পৃষ্ঠা ২০

অনুশীলনী -২৩(**ডিসেম্বর -২য় সপ্তাহঃ**)

দারস তৈরী -সূরা হজ্ব (১ ও ২ নং আয়াত),

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيد

(১) হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। সেদিন তুমি দেখবে প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী ভুলে যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, আর প্রত্যেক গর্ভবতী

গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে)।

এআই ওভারভিউ

সূরা আল-হাজ্জ (সূরা আল-হাজ) সত্যের ২২তম সূরা, যার নামকরণ করা হয়েছেএর ২৭ নম্বর আয়াতের "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ" (মানুষের মধ্যে হজ্জের পরবর্তী দিন) অংশ থেকে, এই সূরাটি ও মাদানী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত এবং গঠন হজ্জের গুরুত্ব, ইতিহাস ও কার্যকর হুকুমের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

সূরা হজ্জের নামকরণের কারণসমূহ:

প্রধান কারণ: এই সূরা মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-কে মানবজাতির উদ্দেশ্যে হজ্জের আদেশ দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ রয়েছে ।

বিষয়বস্তু: সূরার একটি অংশে হজ্জের বড় শান্তি, কাবা ঘরের ফজিলত এবং উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য করা হয়েছে ।

:এটি প্রকাশের প্রবেশসূরা, যেখানে হজ্জের নির্দেশনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর একটি আয়াত (২৭ নং) থেকে এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে ।

নাম: আল-হাজ্জ (অর্থ: তীর্থযাত্রা/হজ্জ) ।

অবস্থান: ২২তম সূরা ।

আয়াত সংখ্যা: ৭৮টি ।

অবতীর্ণের সময়: মক্কী ও মাদানী সূরার সংমিশ্রণ, তবে অধিকাংশের নিজের একটি অংশ মক্কী ও অন্য অংশ মাদানী।

এছাড়াও, এই সুরা **দু'টি সিজদা** রয়েছে (১৮ ও ৭৭ নং আয়াতে)

নাযিলের সময় কাল

এর সূরায় মক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট মিলেমিশে আছে। এ কারণে মুফাসসিরগণের মাঝে এর মক্কী বা মাদানী হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর

একটি অংশ মক্কী যুগের শেষের দিকে এবং অন্য অংশটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হবার কারণে এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীতে এ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্য উভয় যুগের বৈশিষ্ট এর মধ্যে একক হয়ে গেছে।

গোড়ার দিকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশী নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ অংশটি মক্কী জীবনের শেষ যুগে হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ অংশটি ২৪ আয়াত (وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ) এ এসে শেষ হয়ে গেছে।

এরপর থেকে হঠাৎ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পাল্টে গেছে এবং পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্তকার অংশটি মদীনা তাইয়েবায় নাযিল হয়েছে। এ অংশটি যে, হিজরতের পর প্রথম বছরেই যিলহজ্জ মাসে নাযিল হয়েছে তা মনে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ২৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে তা এ কথাই নির্দেশ করে এবং ৩৯-৪০ আয়াতে শানেনুযুল তথা নাযিলের কার্যকারণও এর প্রতি সমর্থন দেয়। সে সময় মুহাজিররা সবেমাত্র নিজেদের জন্মভূমি ও বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জের সময় তাদের নিজেদের শহর ও হজ্জের সমাবেশের কথা মনে পড়ে থাকতে পারে। কুরাইশ মুশরিকরা যে, তাদের মসজিদে হারামে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে একথা তদের মনকে মারাত্মকভাবে তোলপাড় করে থাকবে। যে অত্যাচারী কুরাইশ গোষ্ঠী ইতিপূর্বে তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, মসজিদে হারামের যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করার জন্য তাদের জীবন পর্যন্ত দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হয়তো যুদ্ধ করারও অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ ছিল এ আয়াতগুলোর নাযিলের যথার্থ মনস্তাত্বিক পটভূমি।

এখানে প্রথমে হজ্জের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য মসজিদে হারাম নির্মাণ এবং হজ্জের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে শিরক করা হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য তার পথ

বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর দুরাচারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং এদেরকে বেদখল করে দেশে এমন একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যেখানে অসৎবৃত্তি প্রদমিত ও সৎবৃত্তি বিকশিত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। অন্যদিকে হাদীস ও সীরাতের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রমাণ হয়, এর অনুমতির পরপরই কুরাইশদের বিরুদ্ধে বাস্তব কর্মতৎপরতা শুরু করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি দাওয়ান যুদ্ধ বা আবওয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় তিনটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছেঃ মক্কার মুশরিক সমাজ, দ্বিধাগ্রস্ত ও দোটানায় পড়ে থাকা মুসলিমগণ এবং আপোষহীন সত্যনিষ্ঠ মু'মিন সমাজ।

মুশরিকদেরকে সম্বোধন করার পর্বটি মক্কায় শুরু হয়েছে এবং মদীনায় এর সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ সম্বোধনের মাধ্যমে তাদেরকে বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ভিত্তিহীন জাহিলী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদদের ওপর ভরসা করেছো যাদের কাছে কোন শক্তি নেই এবং আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমাদের পূর্বে এ নীতি অবলম্বনকারীরা যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তোমাদেরও অনিবার্যভাবে সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজের জাতির সবচেয়ে সৎলোকদেরকে জুলুম নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছো। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে তা থেকে তোমাদের বানোয়াট উপাস্যরা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে বুঝাবার ও

উপলব্ধি করাবার কাজও চলেছে। সমগ্র সূরার বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়া ও উপদেশ প্রদানের কাজও চলেছে। এ সংগে শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখেরাতের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

দ্বিধান্বিত মুসলমানরা, যারা আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর পথে কোন প্রকার বিপদের মোকাবিলা করতে রাজি ছিল না, তাদেরকে সম্বোধন করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা ও ধমক দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা কেমন ঈমান! আরাম, আয়েশ, আনন্দ ও সুখ লাভ হলে তখন আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ থাকে এবং তোমরা তাঁর বান্দা থাকো, কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে এবং কঠিন সংকটের মোকাবিলা করতে হয় তখনই আল্লাহ আর তোমাদের আল্লাহ থাকে না এবং তোমরাও তাঁর বান্দা থাকো না। অথচ নিজেদের এ নীতি ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তোমরা এমন কোন বিপদ, ক্ষতি ও কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়েছে দু'টি পদ্ধতিতে। একটি ভাষণে সম্বোধন এমনভাবে করা হয়েছে যার লক্ষ্য তারা নিজেরাও এবং এ সংগে আরবের সাধারণ জনসমাজও। আর দ্বিতীয় ভাষণটির লক্ষ্য কেবলমাত্র মু'মিনগণ।

প্রথম ভাষনে মক্কার মুশরিকদের মনোভাব ও কর্মনীতির সমালোচনা করা হয়েছ। বলা হয়েছে তারা মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হরাম তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাজেই কাউকে হজ্জ করার পথে বাধা দেবার অধিকার তাদের নেই। এ আপত্তি শুধু যে, যথার্থই ছিল তাই নয় বরং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তম অস্ত্রও ছিল। এর মাধ্যমে আরবের অন্যান্য সকল গোত্রের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশরা হারাম শরীফের খাদেম, না মালিক? আজ যদি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একটি দলকে হজ্জ করতে বাধা দেয় এবং তাদের এ

পদক্ষেপকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে কালকেই যে তারা যার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তাকে হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দেবে না এবং এবং তার উমরাহ ও হজ্জ বন্ধ করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এ প্রসংগে মসজিদুল হারামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর হুকুমে এ ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন তখন সবাইকে এ ঘরে হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রথম দিন থেকেই সেখানে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বলা হয়েছে, এ ঘরটি শিরক করার জন্য নয় বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। অথচ কী ভয়ংকর কথা! আজ সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ কিন্তু মূর্তি ও দেবদেবীর পূজার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের জুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সংগে মুসলমানরা যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করবে তখন তাদের নীতি কি হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের কি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে এ কথাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি সূরার মাঝখানে আছে এবং শেষেও আছে। শেষে ঈমানদারদের দলের জন্য “মুসলিম” নামটির যথারীতি ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরাই হচ্ছো ইবরাহীমের আসল স্থলাভিষিক্ত। তোমরা দুনিয়ায় মানব জাতির সামনে সাক্ষদানকারীর স্থানে দাঁড়িয়ে আছো, এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের নামায কায়েম যাকাত দান ও সৎকাজ করে নিজেদের জীবনকে সর্বোত্তম আদর্শ জীবনে পরিণত করা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর কলেমাকে বুলন্দ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো উচিত।

ব্যখ্যা:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

(১) হে মানবমন্ডলী ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্মপন এক ভয়ানক ব্যাপার।

এ প্রকম্পন হবে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার প্রকাশ আর সম্ভবত এটা এমন সময় শুরু হবে যখন যমীন অকস্মাৎ উল্টে পড়তে শুরু করবে এবং সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। একথাই বর্ণনা করেছেন প্রাচীন তাফসীরকারদের মধ্য থেকে আলকামাহ ও শা'বী। তারা বলেছেনঃ يكون ذلك عند طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরাইরা(রা.) থেকে যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা থেকে একথাটিই জানা যায়। সেখানে নবী ﷺ বলেছেনঃ তিনবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এক ফুঁক হবে "ফাযা" তথা ভীতি উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় ফূঁক "সা'আক" তথা সংজ্ঞা লোপকারী বিকট গর্জন এবং তৃতীয় ফুঁক হবে "কিয়াম লি-রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ রব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হবার ফূঁক।

প্রথম ফুঁকটি সাধারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করবে এবং মানুষ হতভম্ভ হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মরে পড়ে যাবে।
তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।
তারপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, সে সময় পৃথিবীর অবস্থা হবে এমন একটি নৌকার মতো যা ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছে অথবা এমন ঝুলন্ত প্রদীপের মতো যা বাতাসের ঝটকায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমনঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ - وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً - فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

“যখন সিংগায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।” (আল হা-ক্কাহ ১৩-১৫)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا - وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا - وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

“যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো? ” (আয যিলযাল ১-৩)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ - قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ - أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

“ যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝটকা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝটকা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হবে।” (আন নাযিআত ৫-৯)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا - وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا - فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا

“যেদিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।” (আল ওয়াকিআহ, আয়াত-৪-৬)

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا - السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ

“যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়া করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে? ” (আল মুযযাম্মিল, আয়াত-১৭-১৮)

যদিও কোন কোন মোফাসসিরের মতে এ কম্পনটি হবে এমন সময়ে যখন মৃতরা জীবিত হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাজির হবে এবং এর সমর্থনে তাঁরা একাধিক হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন তবুও কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা এব হাদীস গ্রহণ করার পথে বাধা। কুরআন এর যে সময় বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এমন এক সময় যখন মায়েরা

শিশু সন্তানদের দুধ পান করাতে করাতে তাদেরকে ফেলে রেখে পালাতে থাকবে এবং গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, আখেরাতের জীবনে কোন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাবে না এবং কোন গর্ভবতীর গর্ভপাত হবার কোন সুযোগও সেখানে থাকবে না। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে সবরকমের সম্পর্ক খতম হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর সামনে হিসেব দিতে দাঁড়াবে। কাজেই আমি পূর্বেই যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি সেটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। যদিও তার বর্ণনা পরম্পরা দুর্বল কিন্তু কুরআনের সমর্থন তার দুর্বলতা দূর করে দেয়। অন্যদিকে অন্যান্য হাদীসগুলো বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে বেশী শক্তিশালী হলেও কুরআনের বর্ণনার সাথে গরমিল থাকায় এগুলোকে দুর্বল করে দেয়। (তাফহীমুল কুরআন)

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيد

(২) সেদিন তুমি দেখবে প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী ভুলে যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে)।

পূর্বোক্ত আয়াতে যে প্রকম্পনের কথা বলা হয়েছে যার পরিণতি এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যার অর্থঃ

মানুষের মধ্যে কঠিন ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। আর এটি ঘটবে ঠিক কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে, আর তার পরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। **অথবা** এ ঘটনা কিয়ামতের (জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার করার) পর ঐ সময় ঘটবে, যখন মানুষ কবর হতে উঠে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারিগণ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। আর তার সমর্থনে কিছু হাদীস পেশ করেন, যেমন মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে আদেশ করবেন যে, যেন তিনি নিজ সন্তানদের মধ্য হতে হাজারে ৯৯৯ জনকে জাহান্নামের জন্য বের করে দেন। এই কথা শুনে গর্ভবতীরা তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে, বালকরা বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, আর মানুষকে দেখে মাতাল মনে হবে, অথচ তারা আসলে মাতাল হবে না; বরং আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতার জন্য এ রকম (কিংকর্তব্যবিমূঢ়) হবে।

সাহাবাদের কাছে এ কথা অত্যন্ত ভারী মনে হল, তাদের চেহারার রং পাল্টে গেল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দেখে বললেন ভয়ের কিছু নেই। ৯৯৯ জনের সংখ্যা য়্যা'জূজ-মা'জূজের মধ্য হতে হবে আর তোমাদের মাত্র একজন। তোমাদের সংখ্যা অন্য মানুষদের তুলনায় এমন হবে, যেমন সাদা গরুর গায়ে একটি কালো লোম অথবা কালো গরুর গায়ে একটি সাদা লোম। আর আমি আশা করি যে, তোমরাই হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। তা শুনে সাহাবারা আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত করলেন। (সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা হাজ্জ)

প্রথম বক্তব্যও অমূলক নয়। কিছু দুর্বল হাদীস দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রকম্পন হেতু ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কথাই এখানে স্পষ্ট। অবশ্য একই শ্রেণীর ভয় ও আতঙ্ক উভয় সময়েই হবে। সেই জন্য দু'টি মতই সঠিক হতে পারে। কারণ, দুই সময়েই মানুষের অবস্থা হবে সে রকমই হবে, যে রকম উক্ত আয়াত ও সহীহ বুখারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

শিক্ষা:

১. ক্বিয়ামাত অতি নিকটে, তাই সে ব্যপারে আমলিয়াতের প্রস্তুতি নিতে হবে।
২. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখা ।
৩. যে যাই বলুক, ক্বিয়ামাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

৪. আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুজনী, ওয়া আউজুবিকা মিনাল বুখলী ওয়াল যুবনী, ওয়া আউজুবিকা মিনাল ইয্যী ওয়াল কাসলি, ওয়া আউজুবিকা মিন গলাবাতিত দাইনি ওয়া কাহরি রিজাল ওয়া আউজুবিকা মিনাল ফিতনাতি মাসিহী দাজ্জাল।

বইঃ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)

জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদঃ

দুনিয়ায় যতগুলো জীবন বিধান আছে তার প্রত্যেকটি এই চারটি অতি-প্রাকৃত মতবাদের যে কোন একটিকে অবশ্যই গ্রহন করেছে।

*****নির্ভেজাল জাহেলিয়াতঃ**

বৈশিষ্ট্যঃ

= মাধ্যম বা পন্থাঃ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে উত্তর খোজার প্রচেষ্টা।

= বিশ্বজাহান সৃষ্টিঃ আকষ্মিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ও অপরিকল্পিত ভাবে পরিচালিত এবং আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে।

= বিশ্বপ্রকৃতির কোন সত্ত্বাধিকারী নেই, থাকলেও মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কহীন।

= দুনিয়া ব্যবহার নীতিঃ সমগ্র দুনিয়া বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর ভান্ডার। নিজের ইচ্ছেমতো মানুষ হস্তগত করবে ও ব্যবহার করবে। কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

আইনবিধান ও জবাবদিহিতাঃ

ক) জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য আইনের কোন উৎস না থাকায় নিজের আইন নিজেরাই তৈরি করে।

খ) কারও নিকট জবাবদিহিতা নেই। যদি করতেই হয় তবে নিজ সমাজনেতা বা রাষ্ট্রশক্তির নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

গ) দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে ভুল ও নিভর্ল ক্ষতিকর ও লাভজনক এবং গ্রহনযোগ্য ও অগ্রহনযোগ্য মিমাংসা করা হবে।

ফলাফল:

= মানুষের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী জীবন:

ক) মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী এবং তার কর্মনীতি সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন।

খ) নিজেকে দেহ এবং দৈহিক শক্তির একচ্ছত্র মালিক মনে করে এবং ইচ্ছেমতো এর ব্যবহার করে।

গ) যে বস্তু তার করায়ত্ত্ব ঘটে তার উপর কতর্ত্ব স্থাপন।

নৈতিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি:

ক) তার হৃদয়মনে নৈতিক অনুভূতি, দায়িত্বাজ্ঞান ও জবাবদিহিতার কোন ভয় থাকে না।

খ) সাধারন অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক ও দুনিয়াপরায়ন হয়।

গ)প্রত্যেক মানুষ একজন জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা পালন করে।

ঘ) আত্নত্যাগ ও আত্নদানের ভাবধারা এবং একধরনের দায়িত্বপূর্ণ নৈতিক অনুভূতির পরিচয় দেয়া গেলেও মূলত: তা স্বার্থপরতা ও আত্নম্ভরিতার সম্প্রসারিত রুপ।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের মূলকথা:

১. বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাবলী একটি আকর্ষিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ।

২. মানুষ এক ধরনের পাশবিক বা জৈবিক সত্তা ঘটনাক্রমে তার উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবী সম্পর্কে ধারনা:

১. এর কোন স্রষ্টা নেই। আর থাকলেও তার সাথে মানব জীবনের সংগে কোন সম্পর্ক নেই।
২. এমনকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন হঠাৎ কোন কার্যকারিতা ছাড়াই ধ্বংস হবে।

*****শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত :**

বিশ্ব জাহানের এ ব্যবস্থা কোন ঘটনাক্রমিকপ্রকাশ নয় এবং খোদাহীন অস্তিত্বের অধিকারী ও নয়। এর একটি খোদা নয় বরং বহু খোদা বর্তমান। তারা একেকজন সৃষ্টির একেকটি বিষয় দেখাশুনা করে।

বৈশিষ্ট্য:

= বৈজ্ঞানিক প্রমানভিত্তিক নয়। নিছক কল্পনা নির্ভর।
= উৎস:- ভয় ও ক্ষমতা থেকে এর সৃষ্টি। অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কোন কিছু দেখলেই তাতে কল্পিত ক্ষমতা রোপ ও পূজা আরম্ভ করে।
= ফেরেশতা, জ্বীন, পাহাড়, নক্ষত্র, আগুন, নদী ইত্যাদিকে দেবতায় পরিনত করেছে।
= আল্লাহর ধারনা এমন ভাবে প্রতিষ্টিত করেছে যেন আল্লাহ একজন বাদশাহ এবং অন্যান্য খোদারা তার উজির ও নজির। দরবারী, মোসাহেব ও কর্মচারী পর্যায়ের মানুষ সরাসরি সেই নামদার বাদশাহ পর্যন্ত পৌছাতে অক্ষম। তাই অধীনস্ত খোদাদের সাথে পুঁজোর মাধ্যমে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফলাফল:

= অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসের কারনে অবাস্তব আশ্রয় ও অবাস্তব ভয়ে পুঁজের মাধ্যমে বিপুল পরিমান শক্তি অর্থহীনভাবে অপচয় করে।

= অঙ্গ লোকেরা মুশরিকদের খোদাকে পরিত্যাগ করে যাদের গোটা জীবন কেটেছে শিরক এর বিরুদ্ধে যেমনঃ ওলি, শহীদ, দরবেশ, গওস, কুতুব, ওলামা, পীর আল্লাহর এ সব নেক বান্দাদের খোদার আসনে প্রতিষ্টিত করেছে।

= মুশরিদের ন্যায় পুজা অর্চনার পরিবর্তে ফাতেহা খানি জেয়ারত, নজর-নিয়াজ, উরস, চাদর-চড়ানো, তাজিয়া করা ইত্যাদি নিয়ে নতুন শরীয়ত তৈরি করা হয়েছে।

= কোন তত্বগত দলিলপ্রমান ছাড়া ঐ সব নেক লোকদের জন্ম-মৃত্যু, আভির্বাব-তিরোভাব, কাশফ-কেরামত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর দরবারে তাদের নৈকট্যের ধরন সম্পর্কে পৌত্তালিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল একটি পৌরানিকবাদ তৈরি করা হয়েছে।

= ওসিলা রুহানী মদদ ফয়েজ ইত্যাদি শব্দগুলোর সুদৃশ্য আচরনের আড়ালে আল্লাহ ও বান্দাহদের মধ্যকার সম্পর্ককে ঐ সব নেক লোকদের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

= মুশরিকদের সাথে ঐসব মুসলমানদের পার্থক্য এই যে, তারা আল্লাহর এসব নিচের স্তরের কর্মকর্তাদেও প্রকাশ্যে আর এসব মুসলমানেরা গওস, কুতুব, আবদাল ওলী আল্লাহ প্রভৃতি শব্দের আবরনে এদেরকে ঢেকে রাখে।

নির্ভেজাল ও শিরক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের পার্থক্য:

১. শিরকে পূজা, মানত, অর্ঘ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আধিক্য কিন্তু নির্ভেজাল জাহেলিয়াতে এসব নেই।

২. নৈতিক চরিত্র ও কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩. শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, নির্ভেজাল ইত্যাদির জন্য কোন মূলনীতি শিরকে নেই। তাই নির্ভেজাল জাহেলিয়াত থেকে তা গ্রহন করে।

৪. মুশরিকরা কল্পনাবিলাসী। নির্ভেজাল বাস্তবধর্মী।

৫. শিরকের রাজ্যে রাজা ও ধর্মীয় নেতাগন খোদার আসনেপ্রতিষ্ঠিত। বংশ এবং শ্রেনীরপ্রাধান্যের উপর এ মতবাদপ্রতিষ্ঠিত। নির্ভেজাল রাজত্বে পরিবার পূজা, বংশ পূজা, একনায়কতন্ত্র, সামাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, শ্রেণী সংগ্রামের রুপ ধারন করে।

***** বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াতঃ**

বাস্তব পর্যবেক্ষনের সাথে আন্দাজ অনুমানের সংমিশ্রনে মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের উত্তর ঠিক করাকে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করা হয়।

বৈশিষ্ট্যঃ

= পৃথিবী ও মানুষের শারীরিক সত্ত্বা সয়ং মানুষের জন্য একটি শাস্তিকেন্দ্র। মানুষের আত্নাকে দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হয়।

= ইন্দ্রিয়ের সকলপ্রয়োজন ও বাসনা বন্দীখানার শৃঙ্খলের ন্যায়।

= নাযাত লাভের উপায় হচ্ছেপ্রকৃতিগত বিভিন্নপ্রয়োজনকে কঠোরভাবে অবদমিত করা।

= সকলপ্রকার আনন্দ-উচ্ছাস, স্বাধ-আস্বাধন পরিহার এবং দেহ মনের কঠোর বৃদ্ধি সাধণ।

= স্রষ্টার অস্তিত্ব ও মৌলিক ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই।

ফলাফলঃ

= সৎ ও ধর্মভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত করে নির্ভেজাল করে তোলে, মানে দুষ্ট ও অসৎপ্রকৃতির লোকেরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দখল করে ফিৎনা, ফাসাদ সৃষ্টি করে।

= জনগনের মধ্যে অবাঞ্জিত ধৈর্য্য, সহিঞ্চতা ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টি ভঙ্গির সৃষ্টি হয়। এতে করে রাজা, বাদশাহ, আমীর, ওমরাহ ও ধর্মীয় কর্তত্বশালী শ্রেনী জনগনের উপরপ্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

= দুনিয়াকে পরিক্ষাস্থল, কর্মস্থল, পরকালের কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তে “দারুল আযাব” ও “মায়াজাল” হিসেবে উপস্থাপন করে। ফলে মানুষ পৃতিবীতে নিজেরপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে যায় এবং দুনিয়া থেকে নিজের গাঁ বাঁচিয়ে চলতে চায়।

= উম্মতের একটি অংশকে মোকাবেলা, মোশাহাদা, কাশফ-বিরাজাত, চিল্লাদান, ওজিফাপাঠ, আমালিয়াত ব্যাখ্যার নফল আদায়ের ব্যাপারে ফরযের চেয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে।

= দ্বীনের নির্দেশের ব্যাপারে অযথা বাড়াবাড়ি ছোটখাট জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমাপ করা। খুঁটিনাটি বিষয়ে অস্বাভাবিক মনোযোগ ও যত্ন নেয়ার রোগ জন্ম নিয়েছে।

*****ইসলাম**

মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্মপর্কে মৌলিক প্রশ্নসমূহের যে জওয়াব আল্লাহ প্রেরিত নবীগন দিয়েছেন, তা আন্তরিকতা সহকারে পূর্ণরূপে গ্রহন করার নামই ইসলাম।

মানুষ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নবীদের মতেঃ

১. এ মহাবিশ্ব এর প্রতিটি সৃষ্টি সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই এর একমাত্র শাসক ও পরিচালক। সবকিছুই তারই ক্ষমতার অধীন।

২. মানুষ সম্পর্কিতঃ মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির একটি অংশ এবং জন্মগতপ্রজা। এটি মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। মানুষ ইচ্ছে করলেও এর বাহিরে যেতে পারে না।

৩. মানুষের দায়িত্বঃ সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করা, এর পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা।

৪. মানুষকে পরিক্ষা করার জন্য জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

৫. আল্লাহর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে তার জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং না করলে রয়েছে শাস্তি।

৬. তাৎক্ষনিকভাবে যদি শাস্তি নাও হয় তবে আখেরাতে চূড়ান্ত শাস্তি হবে।

***** মুজাদ্দিদ কাকে বলে?**

= যারা ইসলামকে জাহেলিয়াতের দূষিত পানি থেকে ছেঁকে পৃথক করে নিয়ে কোন না পর্যায়ে এবং তাকে তার সত্যিকার নির্ভেজাল আকৃতিতে পুনর্বার অগ্রসর করারপ্রচেষ্টা চালায় তাকে মুজাদ্দিদ বলে।
= যে ব্যক্তি দ্বীনকে নতুন করে সঞ্জীবিত সতেজ করেন তাকে মুজাদ্দিদ বলে।

মুজাদ্দিদের বৈশিষ্ট্যঃ ১০ টি

১. স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী।
২. সত্য উপলব্ধির মত গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন।
৩. সব রকমের বক্রতাহীনতা, দোষমুক্ত, সরল বুদ্ধিবৃত্তিতে তার মনোজগৎ পরিপূর্ণ।
৪. নিজের ভারসাম্য রক্ষা করার বিশেষ যোগ্যতা সম্মপূন্ন।
৫. নিজের বিকৃত গতিধারার সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস।
৬. নেতৃত্বের জন্মগত যোগ্যতা।
৭. ইজতিহাদের স্বাভাবিক যোগ্যতা।
৮. ইসলাম সম্পর্কে দ্বীধামুক্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী।
৯. দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিজ্ঞানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ মুসলমান।
১০. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা।

মুজাদ্দিদের কাজঃ ৯ টি

১. নিজের পরিবেশের নির্ভুল চিত্রাংকন।
২. সংস্কারের পরিকল্পনাপ্রনয়ণ।
৩. নিজের সীমা পরিসীমা নির্ধারন।
৪. চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টিরপ্রচেষ্টা।
৫. সক্রিয় সংস্কারপ্রচেষ্টা।
৬. দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করারপ্রচেষ্টা।
৭. প্রতিরক্ষামূলকপ্রচেষ্টা।

৮. ইসলামী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন।

৯. বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টি।

একজন মুজাদ্দিদের জন্য প্রথম তিনটি কাজ অপরিহার্য্য।
অবশিষ্ট ৬ টির মধ্যে যে কোন কার্য সম্পাদন করলে তাকে মুজাদ্দিদ বলা যাবে।

*****মুজাদ্দিদ ও নবীর মধ্যে পার্থক্য:**

নবী

১. খোদার নির্দেশে তার পথে নিযুক্ত হন এবং নিজের নিয়োগ সম্পর্কে অবগত।

২. ওহী নাযিল হয়।

৩. নবুয়্যাতের দাবীর মাধ্যমে তিনি কাজের সূচনা করে সকলকে নিজের দিকে আহবান করে।

৪. মুমীন হওয়ার জন্য নবীর দাওয়াত গ্রহন করা অপরিহার্য্য।

মুজদ্দিদ

১.প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে নিযুক্ত হন এবং নিজের নিয়োগ সম্পর্কে অবগত নন।

২. ওহী নাযিল হয় না।

৩. কোন দাবীর মাধ্যমে কাজ করেন না। কিন্তু তার সৎ ও উন্নত চরিত্রের কারনে মানুষ একত্রিত হয়।

৪. মুজাদ্দিদের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য্য নয়।

কামেল ও আদর্শ মুজাদ্দিদ:

১. এখনো কোন কামেল মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটেনি।

২. হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র:) এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সফলকাম হননি।

৩. একমাত্র একজনই কামেল মুজাদ্দিদ হতে পারেন যার নাম হবে ঈমামুল মেহেদী।

কিয়ামতের আগে ৫ টি পর্যায় অতিক্রম হবে

১. নবুয়্যাতের যুগ।

২. খেলাফতের যুগ।

৩. রাজতন্ত্রের যুগ।

৪. জুলুম তন্ত্রের যুগ(বর্তমান)।

৫. নবুয়্যাত পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা।

নবীর কাজঃ

১. সাধারন মানুষের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করা।

২. এই শিক্ষায় প্রভাবিত লোকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করে জাহেলিয়াতের হাত থেকে কতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা।

মুজাদ্দিদের প্রয়োজনীয়তাঃ

১. এই তিন ধরনের জাহেলিয়াতের ভিড় থেকে ইসলামকে উদ্ধার করে পুনরায় সবল ও সতেজ করার জন্য।

২. বিপথে পরিচালিত জীবন ধারা পরিবর্তন করে পুনর্বার ইসলামের পথে অগ্রসর করা।

কতিপয় মুজাদ্দিদঃ

১. উমর ইবনে আবদুল আযীয (হিজরীঃ ৬১-১০১)।

২. ইমাম আবু হানিফা (রঃ) (হিজরীঃ ৮০-১৫০)

৩. ইমাম মালিক (রঃ) (হিজরীঃ ৯৫-১৭৯)।

৪. ইমাম শাফেয়ী (রঃ) (হিজরীঃ ১৫০-২৯০)।

৫. ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) (হিজরীঃ ১৬৪-২৪১)।

৬. ইমাম গাজ্জালী (রঃ) (হিজরীঃ ৪৫০-৫০৫)।

৭. ইমাম তাইমিয়া (রঃ) (হিজরীঃ ৬৬১-৭২৮)।

৮. শায়খ আহম্মদ সরহিন্দী (হিজরীঃ ৯৭৫-১০৩৪)।

৯. সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী (হিজরীঃ ১২০১-১২৪৬)।

১০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (হিজরীঃ ১১১৪-১১৭৬)।

১১. শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) (হিজরীঃ ১১৯৩-১২৪৬)।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত আল-বাকারাঃ ২৬১, আল-ইমরানঃ ৯২, আল-হাদীদঃ ১১ ও ১টি হাদীস মুখস্ত, দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫৯

মাসয়ালাঃ দাফন-কাফন সংক্রান্ত

প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত দ্বিতীয় অধ্যায় - সালাত (নামায) অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

কাফনের হুকুম কী? এর বিধি-বিধান ও মাসআলাগুলো জানতে চাই

ক. মাইয়্যেতকে কাফন পরানো ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা এ (মাইয়্যেতকে) কাফন পরিয়ে দাও..." (বুখারীঃ ১২৬৫-১২৬৮)

খ. কাফন পরানেোর ফযীলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি একজন মাইয়্যেতকে কাফন পরাবে, (কাল) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সুন্দর ও ইরাকের (রেশমী) পোশাক পরিয়ে দেবেন। (হাকেম ১/৩৫৪, ৩৬২)

গ. কাফন সংক্রান্ত মাসাইল

১. কাফনের কাপড় ক্রয় করবে মৃত ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ থেকে। (বুখারী: ৪০৪৭) তবে তার সে অর্থ না থাকলে অভিভাবকেরা তাদের টাকা দিয়ে ক্রয় করে দিতে পারবে।

২. উত্তমভাবে কাফন পরানো। (মুসলিম: ৯৪৩) আর উত্তম কাফনের অর্থ হলো কাপড়টি পরিষ্কার হওয়া, পুরু বা মোটা হওয়া, সারা শরীর ঢাকে এমন হওয়া এবং মধ্যম মানের বা মাঝারি মূল্যের হওয়া।

৩. কোন কারণে কাফনের ঘাটতি থাকলে মাথা ও শরীর ঢেকে পায়ের অংশে যতটুকু বাকি থাকবে সেটুকু শুকনা কোন ঘাস দিয়ে ঢেকে দেবে। (বুখারী: ৪০৪৭, ৪০৮২)

৪. নতুন কাপড় না থাকলে পুরাতন কাপড় বা ব্যবহৃত জামাকাপড় দিয়েও কাফন পরানো জায়েয। তাছাড়া পুরুষের কাপড় দিয়ে নারীদের কাফন চলে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লুঙ্গি দিয়ে তার কন্যা জয়নাব (রা.)-কে কাফন পরানো হয়েছিল।(বুখারী)

৫. জীবদ্দশায় নিজেই নিজের কাফনের কাপড় প্রস্তুত করে রাখতে পারে। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে একটি জামা চেয়ে নিয়েছিলেন তার কাফনের জন্য এবং এটা। দিয়েই তার কাফন পরানো হয়েছিল।(বুখারী: ১২৭৭)।

৬. কাফনের কাপড়টি পূর্ণ লম্বা হওয়া দরকার। যাতে মাইয়্যেতের সমস্ত শরীর ঢাকা যায়। (আলবানীর আহকামল জানায়িয, মাসআলা নং ৩৫)

৭. কাফনের কাপড়ে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা মুস্তাহাব

(ক) কাপড়টি সাদা হওয়া। (আবু দাউদ: ৩৫২৯, বায়হাকী- ৩/২৪৫)

(খ) হিবারাহ (অর্থাৎ সূতী) কাপড় হওয়া।(আবু দাউদ: ৩১৫০)।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাপড় তিন টুকরা হওয়া (বুখারী ও মুসলিম)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ৩ কাপড়েই কাফন পরানো হয়েছিল। এ জন্য এর চেয়ে বেশি কাপড় ব্যবহার করাকে অনেক ফকীহ নাজায়েয বলেছেন। (আল বানীর আহকামুল জানয়িয, মাসআলা নং ৪২)। তবে কাপড়ের অভাব থাকলে

এক বা দুই টুকরা কাপড় দিয়েও কাফন জায়েয আছে। সাহাবী মুসআব ইবনু উমায়ের এবং হামযা (রা.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়েছিল।
(ঘ) কাপড়ে তিনবার সুগন্ধি লাগানো (ইবনু আবি শাইবা- ৪/৯২) আগরবাতি দিয়ে বা। সুগন্ধযুক্ত কাঠ পুড়িয়ে বা গোলাপ পানি দিয়েও সুগন্ধময় করা যায়।

৮. হজ্জ বা উমরা পালনরত: ইহরাম অবস্থায় নিহত ব্যক্তিকে তার পরনের ২ টুকরা ইহরামের কাপড় দিয়েই কাফন পরাবে। (আবু দাউদ: ৩১৩৮) মুহরিম ব্যক্তির দেহে বা কাপড়ে কোন সুগন্ধি লাগাবে না। কেননা ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যায় না।

৯. আর জিহাদের ময়দানে নিহত শহীদের কাফন হলো তার পরিধেয় বস্ত্র। শহীদের পরনের কাপড় খোলা জায়েয নেই। নিজের রক্তমাখা পোশাকই তার কাফন, এ পোশাকেই তাকে কাফন করাতে হবে। এভাবেই উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দাফন করা হয়েছিল। (আহমাদ: ২৩১৪৪)

১০. কাপড়ের মাপ: মাইয়্যেতের দেহের প্রস্থ ৩০ সে মিঃ হলে কাফনের প্রস্থ ৯০ সে মিঃ হতে হবে। এইভাবে ৪০ সে মিঃ'র ক্ষেত্রে ১২০ সে মিঃ ৫০ সে মিঃ'র ক্ষেত্রে ১৫০ সে মিঃ, ৬০ সে মিঃ'র ক্ষেত্রে ১৮০ সে মিঃ অর্থাৎ ৩ গুণ হবে। মাইয়্যেতের দেহের দৈর্ঘ্য ১৮০ সে মিঃ হলে লেফাফার দৈর্ঘ্য এর চেয়ে ৬০ সে মিঃ অতিরিক্ত হতে হবে। তদনুরূপ ১৫০ সে মিঃ'র ক্ষেত্রে ৫০ সে মিঃ, ১২০ সে মিঃ'র ক্ষেত্রে ৪০ সে মিঃ এবং ৯০ সে মিঃ'র ক্ষেত্রে ৩০ সে মিঃ কাপড় বেশি লম্বা লাগবে। (জানাযা দর্পন, পৃ. ফাইযী, পৃ. ৫৭)।
সূত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13337

অনুশীলনী -২৪(**ডিসেম্বর -৪র্থ সপ্তাহঃ**)

দারস তৈরী -সূরা হাশর শেষ রুকু (১৮-২৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لۡتَنۡظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍ ۚوَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্মপর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।

وَ لَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنۡسٰهُمۡ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

(১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে করেছেন আত্মভোলা (আল্লাহ কে স্মরন করার কথা মনেই আসে না) । আর তারাই হল ফাসিক।

لَا يَسۡتَوِيۡۤ اَصۡحٰبُ النَّارِ وَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ ؕ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ

(২০) জাহান্নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না, জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল।

لَوۡ اَنۡزَلۡنَا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيۡتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلۡكَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُوۡنَ

(২১) আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহর ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ (গলে গেছে) দেখতে। এ সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা (নিজেদের ব্যাপারে) চিন্তা-ভাবনা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ

(২২) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَکَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ

(২৩) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান।

هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

(২৪) তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান।

নামকরণ:

সূরা আল-হাশর (سورة الحشر) পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সূরা, যা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর ২য় আয়াতে উল্লিখিত "আল-হাশর" (الحشر) শব্দটি থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে, যার অর্থ 'সমাবেশ', 'নির্বাসন'

নাযিলের সময়কাল ও শানে নযুল:

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য এরূপ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْر অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটি বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্য ভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘঠিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা ওহোদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল- আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

দেখুন তাফহিমুল কুরআন- সুরা আল হাশর

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নাযীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে । একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না । অর্থ-সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত, মাত্র কয়েকদিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোন একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না । তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি । বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো । এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল । আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয় ।

(২) ৫নং আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে । নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথীবীতে বিপর্যয় সমার্থক নয় ।

(৩) যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬থেকে ১০নং আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে । যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মত একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিলো, সে জন্য এখানে তার আইন -বিধান বলে দেয়া হয়েছে ।

(৪) বনী নাযীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল **১১** থেকে **১৭** আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এই আচরণ ও নীতিভঙ্গীর মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে ।

(৫) শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশবাণী । ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এই উপদেশবাণী । এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি , তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য, কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

ব্যখ্যা:

সূরা আল-হাশরের ১৮-২৪ আয়াত (বিশেষ করে ১৮-২১) মুমিনদের তাকওয়া, পরকালের প্রস্তুতি, কুরআনের প্রভাব এবং ২২-২৪ আয়াতে আল্লাহর গুণাবলী ও তাওহীদ বর্ণিত হয়েছে। এটি পরকালীন সাফল্যের জন্য আত্ম-সমালোচনা, আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর সুন্দর নামসমূহ বোঝার নির্দেশ দেয়।

সূরা আল-হাশর ১৮-২৪ আয়াতের মূল বিষয়বস্তু ও ব্যাখ্যা:

আয়াত ১৮ (পরকালের প্রস্তুতি):

আল্লাহ মুমিনদের তাকওয়া (ভয়) অবলম্বন করতে এবং পরকালের (আগামীকাল) জন্য তারা কী আমল (পূণ্য) পাঠিয়েছে, তা হিসাব করতে নির্দেশ দিয়েছেন
সূরা আয **যুমারের ১০** নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুলআ'লামিন বলেন,

قُلۡ یٰعِبَادِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوۡا رَبَّکُمۡ ؕ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا فِیۡ هٰذِهِ الدُّنۡیَا حَسَنَةٌ ؕ وَ اَرۡضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَهُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ

১০. বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে।

আল-বাকারাহঃ১৭৭

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

১৭৭ - তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচ্ঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। (তাইসিরুল)

আল-বাকারাহঃ২৫৫

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী) আল-বায়ান

আলে ইমরান: ১০২

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। আল-বায়ান

وَ کُلَّ اِنۡسَانٍ اَلۡزَمۡنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیۡ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخۡرِجُ لَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ کِتٰبًا یَّلۡقٰىهُ ، مَنۡشُوۡرًا ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(১৩) আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত

(১৪) (তাকে বলা হবে,) ‘তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।’- (বনি ইসরাইল)

আয়াত ১৯ (আল্লাহ-বিস্মৃতি): যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহ তাদের নিজেদের কথা ভুলে যাওয়ার (আত্মভোলা) শাস্তি দেন। এরা ফাসেক বা অবাধ্য

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ , وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ,

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ, وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ, وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ,

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ, وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। ৫। সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, ৬। এবং সৎ বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে। ৭। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ। ৮। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্মপূর্ণ মনে করে। ৯। আর সৎ বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে,১০। অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। , ১১। যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না (সুরা আল লাইল)

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟

لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟

عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلاً

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবীগণ এবং রববানী ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না। **আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির**। (আল মায়িদা-৪৪)

আয়াত ২০ (জাহান্নামী ও জান্নাতী): জাহান্নামী (অবাধ্য) এবং জান্নাতী (ওলী) সমান নয়। জান্নাতীরাই সফলকাম।

আয়াত ২১ (কুরআনের প্রভাব): এই কুরআন যদি কোনো পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হতো, তবে তা আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মানুষের জন্য এটি ভাবনার উদ্রেককারী উদাহরণ [৫, ৭]।

আয়াত ২২-২৪ (আল্লাহর গুণাবলী ও নামসমূহ): এই আয়াতগুলোতে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর অসীম জ্ঞান (দৃশ্য-অদৃশ্য), করুণা এবং সুন্দরতম নামসমূহ (আল্লাহ, রহমান, রহিম, মালিক, কুদ্দুস, সালাম, মুমিন, মুহাইমিন, আজিজ, জাব্বার, মুতাকাব্বির, খালিক, বারি, মুসাব্বির) বর্ণনা করা হয়েছে ।

কুরআনে বর্ণিত প্রধান কিছু গুণবাচক নাম ও তাদের অর্থ নিচে দেওয়া হলো:

আল্লাহ (اللّٰه): একমাত্র উপাস্য সত্তা।

আর-রাহমান (الرَّحْمٰنُ): পরম দয়ালু।

আর-রহীম (الرَّحِيمُ): অতিশয় মেহেরবান।

আল-মালিক (الْمَلِكُ): প্রকৃত মালিক বা অধিপতি।

আল-কুদদুস (الْقُدُّوسُ): অতি পবিত্র ও দোষত্রুটিহীন।

আস-সালাম (السَّلَامُ): শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী।
আল-মু'মিন (الْمُؤْمِنُ): নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী।
আল-মুহাইমিন (الْمُهَيْمِنُ): রক্ষণাবেক্ষণকারী।
আল-আজীজ (الْعَزِيزُ): পরাক্রমশালী।
আল-জাব্বার (الْجَبَّارُ): ক্ষমতার অধিকারী, যার ইচ্ছাই চূড়ান্ত।
আল-মুতাকাব্বির (ٱلْمُتَكَبِّرُ) : পরম মহান, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, অহংকারের প্রকৃত মালিক, অহংকারী
আল-খালিক (ٱلْخَالِقُ): সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, পরিকল্পনাকারী
আল-বারি (ٱلْبَارِئُ): সৃজনকারী, উদ্ভাবক, বিকশিতকারী, নির্দোষ স্রষ্টা
আল-মুসাব্বির (ٱلْمُصَوِّرُ): রূপদাতা, আকৃতি দাতা, অনন্য রূপের রূপকার

মূল শিক্ষা:
১. আমলের হিসাব: দুনিয়ার জীবনে পরকালের প্রস্তুতি নিতে হবে [২]।
২. আল্লাহর ভয়: সবসময় আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করা (তাকওয়া) [৪]।
৩. আল্লাহর পরিচয়: আল্লাহর গুণাবলী জেনে তাঁর প্রতি ঈমান মজবুত করা [৮]।
এই আয়াতগুলো মুসলিম বাংলা ও তাফহীমুল কুরআন এর মত প্রামাণ্য তাফসীর থেকে বিস্তারিত জানা যায় [২, ৪]।

বই: সত্যের সাক্ষ্য দেখুন পৃষ্ঠা- ৩২৮,

তাওহিদ সংক্রান্ত আয়াত মুখস্ত সূরা বাকারা: ২৮৫

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِي

২৮৫. রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগনের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব। আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাওহিদ সংক্রান্ত ১টি হাদীস মুখস্ত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

২৫. ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর

অর্পিত। (মুসলিম ১/৮ হাঃ ২২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৪)

মাসয়ালাঃ দাফন-কাফন সংক্রান্ত- দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭৫।

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

পূর্ণাঙ্গ কমিটি (২০২৬-২০২৮ কার্যকাল)

আমীর

১। জনাব ডা. শফিকুর রহমান এমপি

নায়েবে আমীরগণ

১। জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম এমপি

২। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এমপি

৩। ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের এমপি

৪। মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম (সাবেক এমপি)

সেক্রেটারি জেনারেল

মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলগণ

১। মাওলানা এটিএম মা'ছুম

২। মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এমপি

৩। ড. হামিদুর রহমান আযাদ (সাবেক এমপি)

৪। মাওলানা আবদুল হালিম

৫। এডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল

৬। মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহান

৭। এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ (২১ সদস্য বিশিষ্ট)

ক্র. নং নাম ও পদবী

১ জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম এমপি
২ অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এমপি
৩ ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের এমপি
৪ মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)
৫ মাওলানা এ. টি.এম. মা'ছুম
৬ মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এমপি
৭ ড. হামিদুর রহমান আযাদ (সাবেক এমপি)
৮ মাওলানা আবদুল হালিম
৯ এডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল
১০ মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান
১১ এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের
১২ জনাব আবদুর রব
১৩ জনাব সাইফুল আলম খান মিলন এমপি
১৪ অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দীন
১৫ অধ্যক্ষ মো. ইজ্জত উল্লাহ এমপি
১৬ এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ
১৭ জনাব মো. মোবারক হোসাইন
১৮ জনাব মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল এমপি
১৯ জনাব মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন
২০ ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এমপি
২১ ড. মোহাম্মাদ রেজাউল করিম

পরিষদ ও মজলিসে শূরা পরিসংখ্যান

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ মোট: ৮৮ জন (নারী: ২১ জন)

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা মোট: ৫৯ জন (নারী: ১৭ জন)

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন

১। মাওলানা এটিএম মা'ছুম (প্রধান নির্বাচন কমিশনার)

২। এডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল (নির্বাচন কমিশনার)

৩। জনাব আবদুর রব (নির্বাচন কমিশনার)

৪। জনাব মোবারক হোসাইন (নির্বাচন কমিশনার)

৫। মাওলানা আ. ফ. ম. আবদুস সাত্তার (নির্বাচন কমিশনার)

অঞ্চল ভিত্তিক দায়িত্বশীল (অঞ্চল পরিচালক)

রংপুর-দিনাজপুর	মাওলানা আবদুল হালিম
বগুড়া	জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম এমপি
রাজশাহী	মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এমপি
কুষ্টিয়া-যশোর	জনাব মোবারক হোসাইন
খুলনা	অধ্যক্ষ মো. ইজ্জত উল্লাহ এমপি
বরিশাল	এডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল
ময়মনসিংহ	অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দীন
ঢাকা মহানগরী	মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)
ঢাকা উত্তর	**জনাব সাইফুল আলম খান মিলন এমপি**
ঢাকা দক্ষিণ	জনাব আবদুর রব
ফরিদপুর	ড. হামিদুর রহমান আযাদ (সাবেক এমপি)
সিলেট	এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের
কুমিল্লা-নোয়াখালী	মাওলানা এটিএম মাছুম
চট্টগ্রাম	মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহান

ইউনিয়ন তরবিয়ত পাঠ্যক্রম (স্বল্প শিক্ষিত)

দারস তৈরী -

১. সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত)
২. সূরা আল আসর,
৩. সূরা আত তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত),
৪. সূরা আল লাহাব,
৫. সূরা আল মু'মেনুন (১-১১ নং আয়াত),
৬. সূরা আল হুজুরাত (১ম রুক),

আল-কুরআন

ক) সহিহ করে আল কুরআন তিলাওয়াত শিখা।

খ) তাফহীমুল কুরআন ৩০তম পারা এবং তাফহীমুল কুরআন থেকে

সূরা আস্-সফ (সম্মপূর্ণ), সূরা আত্-তাওবাহ ৪র্থ রুকু ও **১১১- ১১২** নং আয়াত।

ঘ) বিষয়ভিত্তিক নিম্নবর্ণিত আয়াত ও অন্যান্য আয়াত মুখস্থকরণ:

তাওহীদ : আয়াতুল কুরসি।

দাওয়াত ইলাল্লাহ : সূরা আন-নাহল : **১২৫**, হামীম আস-সাজদাহ : **৩৩** নং আয়াত।

আন্দোলন : সূরা আত্ তাওবা : **৪১**, আস-সাফ : **১০** ও **১৩**, নং আয়াত ।

সংগঠন : সূরা আলে-ইমরান : **১০৩** নং আয়াত।

বাই'আত : সূরা আত্-তাওবা : **১১১**,

আল-আনআম : **১৬২** নং আয়াত।

ঈমানী পরীক্ষা : সূরা আল বাকারা : **২১৪** নং আয়াত।

আনুগত্য : সূরা আন নিসা : **৫৯** নং আয়াত।

সূরা মুখস্থকরণ :

সূরা আল হুমাযাহ থেকে সূরা আদ-দোহা পর্যন্ত অর্থসহ সহিহভাবে মুখস্থ করা।

আল-হাদিস

রিয়াদুস সালেহীন, ২য় ও ২য় খন্ড (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত) অথবা হাদিসের আলোকে মানব জীবন ২য় খন্ড- মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ অথবা রাহে আমল ২য় খন্ড ।

হাদিস মুখস্থকরণ : ৫টি

দাওয়াত, সংগঠন, আন্দোলন, আনুগত্য ও বাই'আত সংক্রান্ত ।

সালাত ও দৈনন্দিন জীবনে পঠিত প্রয়োজনীয় দুআ-দরূদ, তাসবিহ অর্থসহ সহিহভাবে মুখস্থ করা।

<u>আল ফিক্হ;</u> আসান ফিকাহ ২য় খন্ড অথবা ফিকহ্ মুহাম্মাদী অথবা ফিক্হুস সুন্নাহ : (কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুস সালাত অধ্যায়)।

<u>যে সকল বই পড়তে হবেঃ</u>

১। ঈমানের হাকীকত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪৫ পৃ)

২। আল কুরআনের পরিচয় (তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা)।

৩। সত্যের সাক্ষ্য - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪২ পৃ)

৪। ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪২ পৃ)

৫। আল্লাহর দিকে আহ্বান - অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ (রাহি.)। (৪৮ পৃ)

৬। ইসলামের হাকীকত- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪৮ পৃ)

৮। নামাজ রোযার হাকীকত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৬৩ পৃ)

৯। ইসলাম ও জাহেলিয়াত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৩৩ পৃ)

১২। চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান - নঈম সিদ্দিকী (রাহি.)। (৩৩ পৃ)

১৫। হেদায়াত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪০ পৃ)

১৬। গঠনতন্ত্র- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। (৭৪ পৃ)

১৭। সংগঠন পদ্ধতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। (৮২ পৃ)

১৯। ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (ই: বিপ্লবের পথ) - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)।(৪৯ পৃ)

২০। ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৬৫ পৃ)

২৪। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (৩২ পৃ)

২৭। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব - শামসুন্নাহার নিজামী। (৬২ পৃ)

২৮। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)।(৪১ পৃ)

২৯। ভাঙ্গা ও গড়া - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৩৩ পৃ)

৩০। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক - খুররম জাহ্ মুরাদ (রাহি.)। (৯৮ পৃ)
৩২। পর্দার বিধান - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)।
৩৪। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিপ্লবী জীবন - আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই (রাহি.)। (১৭৭ পৃ)

ইউনিয়ন তরবিয়ত পাঠ্যক্রম (শিক্ষিত)

আল -কুরআন
ক) সহিহ করে আল কুরআন তিলাওয়াত শিখা।
খ) আল কুরআনের মর্মকথা (তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা)_ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি)।
গ) তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আল ফাতিহা থেকে সূরা আন'আম (২য়, ২য়, ৪র্থ খন্ড), সূরা হাশর থেকে সূরা নাস (১৭, ১৮, ১৯ খন্ড), সূরা আল-আনফাল (চতুর্থ খন্ড), আত্-তাওবা (৫ম খন্ড),

বই নোটঃ
১. গঠনতন্ত্র ,
২. সংগঠন পদ্ধতি,
৩. ইসলামী আন্দোলন- সাফল্যের শর্তাবলী,
৪. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান,
৫. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্পর্ক,
৬. রুকনিয়াতের আসল চেতনা,

মুখস্থকরণ :
ক) আমপারা থেকে ২৫টি সূরা অর্থসহ সহিহভাবে মুখস্থ করার চেষ্টা করা।
খ) বিষয় ভিত্তিক আয়াত মুখস্থকরণ নির্দেশিকা- নিম্নলিখিত আয়াত ও অন্যান্য আয়াত মুখস্থের চেষ্টা করা :
তাওহিদ : আয়াতুল কুরসি, সূরা হাশরের শেষ রুকু, সূরা আল বাকারা : ২৮৫।
দাওয়াত ইলাল্লাহ : সূরা আলে ইমরান : ১০৪, ইউসুফ : ১০৮, আন-নাহল :১২৫, হামীম আস সাজদাহ : ৩৩ ও মায়েদা : ৬৭ নং আয়াত।
সংগঠন : সূরা আলে-ইমরান : ১০৩ ও ১০৪, আস্ সফ : ৪ নং আয়াত।

তাকওয়া সংক্রান্ত : সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৭ ও ২৫৫, সূরা আলে ইমরান : ১০২।
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ : সূরা আল-বাকারা : ২৬১, আলে-ইমরান : ৯২, আল-হাদীদ : ১১ নং আয়াত।
ঈমানি পরীক্ষা : সূরা আল বাকারা : ২১৪, আনকাবুত ১,২ ও ৩ আয়াত।
আনুগত্য : সূরা আন নিসা : ৫৯ নং আয়াত।

আল- হাদীস

ক) রিয়াদুস সালেহীন ২য়, ২য়, ৪র্থ ও ৪র্থ খন্ড (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত) অথবা হাদিস শরীফ ২য় ও ২য় খন্ড- মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।
খ) বিষয়ভিত্তিক হাদিস মুখস্থ করার চেষ্টা করা : ঈমানের ভিত্তি, ইসলামের ভিত্তি, দাওয়াত, আন্দোলন, সংগঠন, (কমপক্ষে ১০ খানা হাদিস)।
গ) সালাত ও দৈনন্দিন জীবনে পঠিত প্রয়োজনীয় দুআ-দরূদ, তাসবিহ- তাহলিল অর্থসহ সহিহভাবে মুখস্থ করা।
ঘ) সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি)।

আল-ফিকহ

আসান ফিকাহ ২য় ও ২য় খন্ড অথবা/ ফিকহ মুহাম্মদী ২য় ও ২য় খন্ড অথবা/ ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খন্ড- সাইয়্যেদ সাবিক।

যে সকল বই পড়তে হবেঃ

১। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪০ পৃ)
২। আল কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১০৯ পৃ)
৪। সত্যের সাক্ষ্য - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪২ পৃ)
৫। দাওয়াত ইলাল্লাহ দায়ী ইলাল্লাহ -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৫০ পৃ)
৬। ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪২ পৃ)
৭। ইসলামের হাকীকত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪৮ পৃ)

৮। নামাজ রোযার হাকীকত -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৬৩ পৃ)
৯। যাকাতের হাকীক- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪৯ পৃ)
১০। হজ্জের হাকীকত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪২ পৃ)
১১। জিহাদের হাকীকত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১৩ পৃ)
১২। ইসলাম পরিচিতি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১১২ পৃ)
১৩। শান্তিপথ - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১০ পৃ)
১৪। ইসলামের জীবন পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪৬ পৃ)
১৫। ইসলাম ও জাহেলিয়াত- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৩৩ পৃ)
১৬। ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১১৯ পৃ)
১৯। আর রিবা - ড. মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম। (১৩০ পৃ)
২০। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব- আব্বাস আলী খান (রাহি.)। (১৪২ পৃ)
২১। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (১০১ পৃ)
২২। চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান- নঈম সিদ্দিকী (রাহি.)। (৩৩ পৃ)
২৩। ইসলামী আদাবে জিন্দেগী -মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (৮২ পৃ)
২৪। জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ২য় খন্ড (১২৯ পৃ)
২৫। গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। (৭৪ পৃ)
২৬। সংগঠন পদ্ধতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। (৮২ পৃ)
২৭। ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৬৫ পৃ)
২৮। হেদায়াত- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪০ পৃ)
৩১ । ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (ই: বিপ্লবের পথ) -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.) ।(৪৯ পৃ)
৩২। একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১৬ পৃ)

৩৩। ভাঙ্গা ও গড়া- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৩৩ পৃ)
৩৪। ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৫০ পৃ)
৩৫। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)।(৪১ পৃ)
৩৯। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (৩২ পৃ)
৪০। ইসলামী আন্দোলনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা্ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (১৭ পৃ)
৪১। ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা - হাফেজা আসমা খাতুন। (২৪ পৃ)
৪২। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব - শামসুন্নাহার নিজামী। (৬২ পৃ)
৪৩। অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী- অধ্যাপক গোলাম আযম (রাহি.)। (৩৪ পৃ)
৪৭। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১৫৭ পৃ)
৪৮। ইসলামের দৃষ্টিতে মজুরের অধিকার - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (পৃ)
৫০। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক - খুররম জাহ্ মুরাদ (রাহি.)। (৯৮ পৃ)
৫১। মুমিনের পারিবারিক জীবন - অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রাহি.)। (৩০১ পৃ)
৫৩। ষ্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম - ড. ইউসুফ আল কারযাভী (রাহি.)। (১২৯ পৃ)
৫৪। সফল জীবনের পরিচয় - অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ (রাহি)। (৬৫ পৃ)
৫৭। সিরাতে সরওয়ারে আলম (৪র্থ- ৪র্থ খণ্ড) - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৪৪৭ পৃ)
৫৮। সিরাতে ইবনে হিশাম (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত)- ইবনে হিশাম (রাহি.)। (৩৬৫ পৃ)

৫৯। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিপ্লবী জীবন - আবু সলীম মুহাম্মদ আবুল হাই (রাহি.)। (১৭৭ পৃ)
৬১। আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ২য় খন্ড - ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ।(২২১ পৃ)
৬৩। ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ- অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ (রাহি.)। (১৪৪ পৃ)
৬৪। পলাশী থেকে বাংলাদেশ - অধ্যাপক গোলাম আযম (রাহি.)। (৪২ পৃ)
৬৫। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ২য় (২৫৮ পৃ) ও ২য় (২৮১ পৃ) খন্ড - জামায়াত প্রকাশনী।

দারস তৈরী -

১. সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত)
২. সূরা বাকারা (১৫৩-১৫৬ নং আয়াত)
৩. সূরা আয-যিলযাল,
৪. সূরা আত-তাকাসুর,
৫. সূরা আল আসর,
৬. সূরা আল আলাক (১-৫ নং আয়াত),
৭. সূরা আত তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত),
৮. সূরা- আল ইখলাস,
৯. সূরা আল লাহাব,
১০. সূরা আল মু'মেনুন (১-১১ নং আয়াত),
১১. সূরা আল ইনফিতার, -
১২. সূরা আন-নাস,
১৩. সূরা আল মুদ্দাসির(১-৭নংআয়াত),
১৪. সূরা আল ফীল,
১৫. সূরা আল হাশর শেষ রুকু

বই আলোচনা:

১. গঠনতন্ত্র ,
২. সংগঠন পদ্ধতি,
৩. ইসলামী আন্দোলন- সাফল্যের শর্তাবলী,
৪. তাফহিমুল কুরআনের ভূমিকা,
৫. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান,
৬. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্মপর্ক,
৭. ইসলামী সংগঠন,
৮. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি,
৯. সত্যের সাক্ষ্য,
১০. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস,
১১. হাদীস সংকলনের ইতিহাস,
১২. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি,
১৩. ইসলাম পরিচিতি,
১৪. ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়,

উপজেলা তরবিয়ত পাঠ্যক্রম (স্বল্প শিক্ষিত)

আল-কুরআন

সূরা আস্-সফ (সম্পূর্ণ),

ঘ) বিষয়ভিত্তিক নিম্নবর্ণিত আয়াত ও অন্যান্য আয়াত মুখস্থকরণ: ***তাওহীদ :*** সূরা হাশরের শেষ রুকু। ***দাওয়াত ইলাল্লাহ :*** মায়েদা : ৬৭ নং আয়াত। ***আন্দোলন :*** সূরা আশশুরা : ১৩ নং আয়াত । ***সংগঠন :*** আস-সফ : ৪ নং আয়াত। ***বাই'আত :*** মুমতাহিনা : ১২ নং আয়াত।

বইঃ

২। মৃত্যু যবনিকার ওপারে- আব্বাস আলী খান (রাহি.)। (১৪৫ পৃ)
৭। ইসলাম পরিচিতি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১১২ পৃ)
১০। কবীরা গুনাহ (বিআইসি) - ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী (রাহি.)। (১৮১ পৃ)
১১। ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.) (১৭০ পৃ)
১৩। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)।
১৪। ইসলামী আদাবে জিন্দেগী- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (৮২ পৃ)
১৮। জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী - ২য় খন্ড। (১২৯ পৃ)
২১। ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ - মকবুল আহমাদ (রাহি.)। (৪৯ পৃ)
২২। ইকামাতে দ্বীন - অধ্যাপক গোলাম আযম (রাহি.)। (৮৭ পৃ)
২৩। রুকনিয়াতের আসল চেতনা - অধ্যাপক গোলাম আযম (রাহি.)। (১৮ পৃ)
২৫। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (১১৪ পৃ)
২৬। ইসলামী সংগঠন - অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ (রাহি.)। (৮৯ পৃ)
৩১। ইসলামী আন্দোলনমুখী পরিবার গঠন - অধ্যাপক মো: ইউসুফ আলী (রাহি.)। (২৭ পৃ)

৩৩। সমাজকল্যাণ ম্যানুয়েল - জামায়াত প্রকাশনী ।

৩৫। আসহাবে রাসূলের জীবন কথা - ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ ২য় ও (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত)। (২২১ পৃ)

৩৬। ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃত - অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ (রাহি.)। (১৪৪ পৃ)

দারস তৈরী -

১. সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত)
২. সূরা আল আসর,
৩. সূরা আত তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত),
৪. সূরা আল লাহাব,
৫. সূরা আল মু'মেনুন (১-১১ নং আয়াত),
৬. সূরা আল হুজুরাত (২য় রুক),

বই নোট:

১. গঠনতন্ত্র ,
২. সংগঠন পদ্ধতি,
৩. ইসলামী আন্দোলন- সাফল্যের শর্তাবলী,
৪. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান,
৫. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্মপর্ক,
৬. রুকনিয়াতের আসল চেতনা,

উপজেলা তরবিয়ত পাঠ্যক্রম (শিক্ষিত)

আল -কুরআন

ক) সহিহ করে আল কুরআন তিলাওয়াত শিখা।

খ) আল কুরআনের মর্মকথা (তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা)_ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি)।

গ) তাফহীমুল কুরআন ঃ আল-হাজ্জ (৮ম খন্ড), আন-নূর (৯ম খন্ড), আল-আনকাবুত, লুকমান (১১শ খন্ড), আল-আহযাব (১২শ খন্ড), হামীম আস সাজদা (১৪শ খন্ড), মুহাম্মাদ, আল-ফাতহ, আল-হুজুরাত (১৫শ খন্ড) এবং আল হাদিদ (১৬শ খন্ড)।

মুখস্থকরণ :

ক) আমপারা থেকে ২৫টি সূরা অর্থসহ সহিহভাবে মুখস্থ করার চেষ্টা করা।

খ) বিষয় ভিত্তিক আয়াত মুখস্থকরণ নির্দেশিকা- নিম্নলিখিত আয়াত ও অন্যান্য আয়াত মুখস্থের চেষ্টা করা :

আন্দোলন : সূরা আন-নিসা : ৭৪ ও ৭৬, আত তাওবা : ২৪ ও ৩৮-৪১, আস-সফ : ১০ থেকে ১২, সূরা আশ শুরা : ১৩, সূরা হজ্জ : ৭৮ নং আয়াত।

বাইআত : সূরা আত-তাওবা : ১১১, আল-আন'আম : ১৬২, আল-ফাতহ : ১০ ও ১৮, মুমতাহিনা : ১২ নং আয়াত ।

আল- হাদীস

খ) বিষয়ভিত্তিক হাদিস মুখস্থ করার চেষ্টা করা : বাই'আত, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, মুয়ামালাত (কমপক্ষে ৬ খানা হাদিস)।

বইঃ

৩। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (২৪৬ পৃ)

ইসলাম ও ইবাদাত

১৭। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত- ড. জাবেদ মুহাম্মাদ । (২৪১ পৃ)

১৮। কবীরা গুনাহ (বিআইসি) -ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী (রাহি.)। (১৮১ পৃ)

২৪। জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ২য় খন্ড। (১১১ পৃ)

২৯। ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১১৮পৃ)

৩০। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১৪৩ পৃ)

৩৬। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১৮৫ পৃ)

৩৭। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)(১১৪ পৃ)

৩৮। একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ও তার থেকে বাঁচার উপায় - আব্বাস আলী খান (রাহি.)। (৪২ পৃ)

৪৪। শ্রমিক সংকলন - কল্যাণ প্রকাশনী।

৪৫। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা - অধ্যাপক গোলাম আযম (রাহি.)। (৯৭ পৃ)

৪৬। ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ - মকবুল আহমাদ (রাহি.)। (৪৯ পৃ)

৪৯। মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী (রাহি.)। (২২০ পৃ)

৫২। পর্দা ও ইসলাম - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (২৭৮ পৃ)

৫৫। ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (১৩১ পৃ)

৫৬। সমাজকল্যাণ ম্যানুয়েল - জামায়াত প্রকাশনী।

৫৭। সিরাতে সরওয়ারে আলম (৫ম খণ্ড) - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (২৫০ পৃ)

৬০। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কার জীবন - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহি.)। (১৯৪ পৃ)

৬১। আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ২য় খন্ড - ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। (২২৯ পৃ)

৬১। আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ৫ম খন্ড - ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। (২৮৪ পৃ)

৬২। খেলাফত ও রাজতন্ত্র - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহি.)। (৩০৪ পৃ)

৬৫। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ৪র্থ খন্ড -জামায়াত প্রকাশনী। (৩৫৯ পৃ)

দারস তৈরী -

১. সূরা বাকারা (১-৫ নং আয়াত)
২. সূরা বাকারা (১৫৩-১৫৬ নং আয়াত)
৩. সূরা আল বাকারা (২৫৫),
৪. সূরা আয-যিলযাল,
৫. সূরা আত-তাকাসুর,
৬. সূরা আল আসর,
৭. সূরা আল আলাক (১-৫ নং আয়াত),

বই আলোচনা:

১. গঠনতন্ত্র ,
২. সংগঠন পদ্ধতি,
৩. ইসলামী আন্দোলন- সাফল্যের শর্তাবলী,
৪. তাফহিমুল কুরআনের ভূমিকা,
৫. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান,
৬. ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়,
৭. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পারিক সম্মপর্ক,

৮. সূরা আত তওবা (১১১ ও ১১২ নং আয়াত),
৯. সূরা- আল ইখলাস,
১০. সূরা আল লাহাব,
১১. সূরা আল মু'মেনুন (১-১১ নং আয়াত),
১২. সূরা আলে ইমরান (১৯-২২ নং আয়াত),
১৩. সূরা আল ইনফিতার, -
১৪. সূরা আন-নাস,
১৫. সূরা আল মুদ্দাসির(১-৭নংআয়াত),
১৬. সূরা আল ফীল,
১৭. সূরা আল হুজুরাত (২য় রুক),
১৮. সূরা আল আহযাব (৩৫ নং আয়াত), -
১৯. সূরা হজ্ব (১ ও ২ নং আয়াত),
২০. সূরা আল হাশর শেষ রুকু

৮. ইসলামী সংগঠন,
৯. রুকনিয়াতের আসল চেতনা,
১০. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি,
১১. ইসলাম ও জাহেলিয়াত,
১২. সত্যের সাক্ষ্য,
১৩. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস,
১৪. হাদীস সংকলনের ইতিহাস,
১৫. ইকামাতে দ্বীন ,
১৬. রাসূলুল্লাহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপ্লবী জীবন,
১৭. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি,
১৮. ইসলাম পরিচিতি,
১৯. পলাশী থেকে বাংলাদেশ,
২০. ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ,
২১. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

রিপোর্টের হিসাব

বিবরণ		মাসের নাম						মোট
১.	কুরআন অধ্যয়ন (কতদিন)							
২.	হাদীস অধ্যয়ন (কয়টি)							
৩.	ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন (কত পৃষ্ঠা)							
৪.	জামায়াতে নামাজ (কত ওয়াক্ত)							
৫.	দাওয়াতী টার্গেট সাক্ষাৎ (কতবার)							
৬.	কর্মী টার্গেট সাক্ষাৎ (কতবার)							
৭.	কর্মী যোগাযোগ (কতজন)							
৮.	বই বিলি (কতটি)							
৯.	পারিবারিক বৈঠক							
১০.	সামাজিক কাজ							
১১.	সময় দান (কত ঘন্টা)							
১২.	সফর (কতটি)							
১৩.	রিপোর্ট রাখা (কতদিন)							
১৪.	আত্ম-সমালোচনা (কতদিন)							
১৫.	কর্মী বৃদ্ধি (কতজন)							
১৬.	সহযোগী বৃদ্ধি (কতজন)							
১৭.	দাওয়াতি গ্রুপে বের হয়েছেন (কতবার)							

রিপোর্টের কোন কাজ দুর্বল হলে তার কারণঃ